বাংলার সাধক

(৪র্থ খণ্ড)

গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৬৫

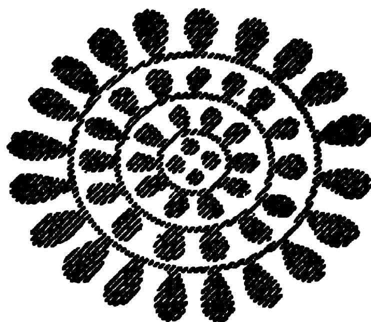
প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
মনোজ বিশ্বাস

বাংলার সাধক

(৪র্থ খণ্ড)



ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে অবক্ষয়ের চিহ্ন ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—প্রবীণদের মধ্যে এ ধরনের অভিযোগ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অভিযোগটি অমূলক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে প্রত্যেক জাতির জীবনেই যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা প্রায় বিপর্যয়ের সামিল। এই অবক্ষয় শুধু একটি মাত্র জাতির মধ্যেই আত্মপ্রকাশের স্থান খুঁজিয়া পাইয়াছে—এ কথা মনে করার কোন কারণ নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন কোন সময় বিশেষ অবস্থায় শাশ্বত মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়; চিন্তার ক্ষেত্রেও দেখা যায় লক্ষণীয় পরিবর্তন। মানসিক ক্ষেত্রে যখন মূল্যবোধ এবং চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে তখনই দেখা দেয় নূতন যুগের সূচনা। কিন্তু নূতন যুগ বলিয়া যে যুগকে আমরা চিহ্নিত করি সে যুগ আসলে কতোখানি নূতন? পুরাতনকে, অতীতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া কোন যুগকেই সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়া সম্ভব নয়। আধুনিক কালে পৃথিবীর যে সব দেশে রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়িয়া তোলা হইয়াছে—সেই সব দেশের জনমানস হইতে কি পুরাতন সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হইয়াছে? ঐতিহাসিক বলিবেন—তাহা হয় নাই। সমাজবিজ্ঞানী বলিবেন—পুরাতনকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা সম্ভব নয়, তাই নূতনের মধ্যে পুরাতনের সঙ্গে নূতন জড়াইয়া থাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে।

নূতনের মধ্যে পুরাতন কতোখানি পরিমাণে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে জাতির বিশেষ মানসিক গঠন এবং চিন্তাধারার স্বকীয়তার উপর। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথাটি আমরা শুনিতে অভ্যস্ত সেটি সনাতন ধর্ম ও জীবনদর্শন সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে সযত্নে পালিত সশ্রদ্ধ মমত্ববোধ। জীবন-যাপন প্রণালীতে, অর্থনৈতিক জীবনে, রাজনীতির ক্ষেত্রে অনিবার্যরূপেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু এসব পরিবর্তন এহ বাহ্য পর্যায়ের। চিন্তা ও মনন ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মূল্যবোধ যুগযুগান্তর ধরিয়া অপরিবর্তিত রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ভাষায়—

"ধর্মেই ভারতের জীবনীশক্তি। যতদিন হিন্দুরা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান বিস্মৃত না হইতেছে, ততদিন জগতে কোন তাহাদের ধ্বংস করিতে পারিবে না।

যে ব্যক্তি সর্বদাই স্বজাতির অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকায়, আজকাল সকলেই তাহার নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, এইরূপ ক্রমাগত অতীতের আলোচনাই হিন্দুজাতির নানারূপ দুঃখের কারণ। কিন্তু আমার বোধহয় ইহার বিপরীতটিই সত্য। যতদিন হিন্দুরা তাহাদের অতীত ভুলিয়া ছিল ততদিন তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া অসাড় অবস্থায় পড়িয়া ছিল। যতই তাহারা অতীতের আলোচনা করিতেছে, ততই চারিদিকে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অতীতের ছাঁচেই ভবিষ্যৎকে গড়িতে হইবে, এই অতীতই ভবিষ্যৎ হইবে।

অতএব হিন্দুগণ যতই তাঁহাদের অতীত আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ততই গৌরবময় হইবে। আর যে-কেহ এই অতীতকে প্রত্যেকের কাছে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি স্বজাতির পরম হিতকারী।”

যে মহাপুরুষদের জীবনী আশ্রয় করিয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি লোক-সাধারণের কাছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাঁহাদের আচরণ, ত্যাগ, তিতিক্ষা, জীবনদর্শন, জনশিক্ষাকল্পে তাঁহাদের নিরলস প্রয়াসের চিত্র আমাদের কাছে উপস্থাপিত করিয়া ‘বাংলার সাধকে’র গ্রন্থকার স্বজাতির প্রতি এক পরম পবিত্র দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। অপ ্চারজনিত সংশয় ও বিভ্রান্তি যখন চিন্তার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে নৈরাজ্যের আবহাওয়া তখন মহাপুরুষদের জীবন, আদর্শ, শিক্ষা ও আচরণই ঘটাইতে পারে সংশয় হইতে নির্ভয় অসংশয়ে উত্তরণ।

“তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ, শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নৈকো মুনির্যস্য প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥”

—শ্রীনিশীথরঞ্জন রায়

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা
করকমলেষু

শ্রদ্ধাবনত
গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

এতে আছে :

বাংলার এক পল্লীগ্রামে, অবিভক্ত নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার কুমারখালিতে আবির্ভূত হলেন শিবচন্দ্র। বাংলা ১২৬৭ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী তিথিতে। ইংরাজী ১৮৬০ সালের মে মাসে। পিতা চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ও মাতা চন্দ্রময়ী দেবী।

ভট্টাচার্য পরিবার মূলতঃ এসেছিল ফরিদপুরের মহীশালা গ্রাম থেকে। তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে সমগ্র পরিবারটিই ছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত। শিবচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পূর্বে এই বংশে তন্ত্রচর্চার সূত্রপাত। পুরুষানুক্রমে সেই চর্চা ক্রমশঃই বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এবং শিবচন্দ্রের মধ্যে সেই ধারা এক পরমতম সার্থকতার মহাসঙ্গমে বিলীন হয়েছে।

এই বংশেরই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন নিমানন্দ ভট্টাচার্য। তাঁরই সাধনা প্রভাবে খোকসার কালীবাড়ী মায়ের জাগ্রত অধিষ্ঠানরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী শুনতে পাওয়া যায়। হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করে তিনি আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তাঁরই পৌত্র কৃষ্ণসুন্দর তর্কালঙ্কার ছিলেন শিবচন্দ্রের পিতামহ। তিনি শুধু পণ্ডিতই ছিলেন না, তন্ত্রসাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনিই শিবচন্দ্রকে মাতৃসাধনায় অনুপ্রাণিত করোছলেন। কৃষ্ণসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শিবচন্দ্রের পিতা চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ সুপণ্ডিত ও পূজা-অর্চনা বিষয়ে সুদক্ষ ছিলেন। স্পষ্টবাদী ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ রূপে খ্যাত ছিলেন। কুমারখালির হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করেছিলেন। মাতা চন্দ্রময়ী দেবীও ভক্তিমতী ও ধৈর্যশীলা রমণী ছিলেন।

পঞ্চাননের অনুগ্রহে পুত্র-সন্তান লাভ হলো বলে নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় পঞ্চানন। কিন্তু পিতা-মাতা আদর করে ডাকতেন শিবচন্দ্র বলে। পরবর্তীকালে এই শিবচন্দ্র নামেই তিনি খ্যাত হন।

দিনে দিনে শিশু বড় হয়ে ওঠে। যে অজানা শক্তি তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে রয়েছে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ যেন তা সুবিপুল হয়ে ওঠে। দিন সপ্তাহ মাস বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়। একদা. ধীরে প্রভাত-সূর্যের স্বর্ণকিরণ এসে পড়ে বালক শিবচন্দ্রের মনোরাজ্যের উপর। সুরু হয় বাল্যশিক্ষা। কুমার-খালি গ্রামেই। বাংলা স্কুলে শিবচন্দ্রের হাতেখড়ি হলো সাধক-সাহিত্তি

কাঙাল হরিনাথের কাছে।* হরিনাথই ছিলেন এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক। তিনি শুধুমাত্র শিক্ষকই ছিলেন না, ছিলেন খাঁটি সমাজ-সেবক, সাংবাদিক, ভক্ত ও বৈরাগী। এমন মহাপুরুষ শিক্ষকের সান্নিধ্য শৈশব ও বাল্যে লাভ করবার জন্যই শিবচন্দ্রের চরিত্র এমন সুদৃঢ়রূপে গঠিত হয়েছিল। তাইতো দেখা যায় উত্তর কালেও শিবচন্দ্রের সাধনা ও সাহিত্য চর্চার উপর কাঙালের প্রভাব ছিল অপরিসীম। পরবর্তী জীবনে কবিতার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন শিবচন্দ্র।

ব্যাকরণ সাহিত্য অভিধান বেদ বেদান্ত তন্ত্র পুরাণ,
পড়েছি শুনেছি যত দেখেছি যত বিচার করি
কোথাও পাই নাই তত উপদেশ, তোমার কাছে শিখেছি যত,
তোমার গানে তোমার প্রাণে তোমার দানে পেয়েছি যত
তোমার সাধনার সাধিত নিধি শাস্ত্র পড়ি পাব কি করি?
ধর্মসভা সমিতি তরে ঘুরেছি দেশ দেশান্তরে
যত কথা বলেছি তথা তোমারই কথা লক্ষ্য করি।

---

*কাঙাল হরিনাথের নাম হরিনাথ মজুমদার। ইং ১৮৩৩ সালে জন্ম হয় কুমারখালির সম্ভ্রান্ত এক তিলি পরিবারে। মৃত্যু হয় ১৮৯৬ সালের ১৬ই এপ্রিল। ১৮৬৩ খৃঃ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে এক মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই নির্ভীক সাংবাদিক কাব্যগ্রন্থ, পাঁচালী, নাটক, উপন্যাস ও বাউল সঙ্গীত রচনা করে মাতৃভাষার সেবা করেন। ১৮৮০ খৃঃ কুমারখালিতে একটি বাউলের দল গঠন করেন। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা বলেই সাধারণের নিকট তিনি 'কাঙাল হরিনাথ' নামে পরিচিত হন। তাঁর সাহিত্য-শিষ্যদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্র, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, জলধর সেন, মীর মশাররফ হোসেন ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি আবাল্য ধর্মানুপ্রাণিত হৃদয়ে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করতেন। যৌবনে স্বদেশ সেবায় নিযুক্ত থাকবার সময় যে আদর্শ সম্মুখে রেখেছিলেন তারই সার মর্ম একটি ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন,

'পাপেতে পৃথিবী থার, ধর্ম তথা নাহি আর।
কপটতা ধর্ম সাজে, পৃথিবী ঢাকিয়া আছে॥
ধর্ম যদি চাও ভাই, ধর্ম কাজে কাজ নাই।
কপটতা পরিহর, ভাল হও ভাল কর॥'

'হরিনাথ মজুমদার'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে কথায় মেতেছে কত লক্ষ লক্ষ নর-নারী
অলক্ষ্যে হেরেছি তাদের লক্ষ লক্ষ নয়নে বারি
তখন তারা 'হরি হরি' বলিলে আমি হরি সনে স্মরেছি হরি ॥
('শ্মশানে কাঙাল' কাব্যগ্রন্থ)

* * *

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জলধর সেন ছিলেন শিবচন্দ্রের সহপাঠী ও বন্ধু। তিনি বাল্যকালের কথা স্মৃতিচারণ করে লিখছেন, 'সেকালের পদ্ধতি অনুসারে নানা অনুষ্ঠান করে পুরোহিত মহাশয় আমাদের হাতেখড়ি দেননি, আমারও নয় শিবচন্দ্রেরও নয়। শুনেছি অনুষ্ঠান সবই হয়েছিল। পুরোহিত মহাশয় পূজা-অর্চনাও করেছিলেন, কিন্তু আমাদের হাতেখড়ি দিয়েছিলেন আমাদের পরম আরাধ্য, 'কাঙ্গাল হরিনাথ'। তিনিই দুইমাস আগে পিছে আমাদের দুই জনের বিদ্যারম্ভ করিয়েছিলেন। আমাদের যখন চার বৎসর বয়স তখন শিবচন্দ্র ও আমি 'বাংলা স্কুলে' প্রবেশ করি। আমাদের দুজনের কেউই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রথম শিক্ষা লাভ করিনি। একেবারে সোজা বর্ণপরিচয় হাতে ক'রে বাংলা স্কুলের ছাত্র হয়েছিলাম।'*

শিবচন্দ্রের পরিবারটি ছিলেন ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ধারক বাহক। ওঁদের রক্তধারায় চিন্তা ভাবনায় মিলে মিশে একাকার হয়ে ছিল প্রাচীনের সেই ধর্মীয় সংস্কার। দেব-ভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। ধর্মীয় কর্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য-অর্জন ভক্তি-তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও মাতৃসাধনাই ছিল তাঁদের জীবনের আদর্শ ও মূল লক্ষ্য। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষা, ব্রাহ্মধর্ম ও নব্যবঙ্গের আচার অনুষ্ঠানকে ওঁরা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাছাড়া ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা ওঁদের সন্তান-সন্ততিদের জীবনাদর্শ ব্যাহত হবে বলেই মনে করতেন। তাইতো দেখা যায় শিবচন্দ্রের জীবনে আর ইংরাজী শিক্ষা লাভের কোনও সুযোগ হলো না। ওঁর পিতৃদেব চন্দ্রকান্ত তর্কবাগীশ অকস্মাৎ একদিন পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন নবদ্বীপে বিদ্যালাভের জন্য। কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্নের চতুষ্পাঠীতে। আর সেখানেই গড়ে ওঠে শিবচন্দ্রের শাস্ত্র সাধনার ভিত্তি।

দশ এগার বছর বয়স থেকেই যে অভূতপূর্ব প্রতিভা ও মেধার পরিচয় দেন শিবচন্দ্র তা বিস্মিত করে নবদ্বীপবাসিগণকে। অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য দর্শন ব্যাকরণ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর ক্ষুরধার প্রতিভার দ্যুতি দিক্‌বিদিকে বিকিরিত হতে থাকে। তাঁর কাব্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন নবদ্বীপধামের দিক্‌পাল পণ্ডিতমণ্ডলী। কাব্য প্রতিভা যাচাই করবার জন্য এক সাহিত্য সভাও আহূত হয়। অবশেষে নবদ্বীপের তৎকালীন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ শিবচন্দ্রকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শিবচন্দ্রের মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নবদ্বীপের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, অধ্যাপকবৃন্দ ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীতারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় শিবচন্দ্রকে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃত একসঙ্গে পড়াবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু পিতা ও পিতামহের আপত্তি থাকায় শিবচন্দ্রের জীবনে আর ইংরাজী শিক্ষালাভ হলো না। এই প্রসঙ্গে পিতামহ কৃষ্ণকান্ত তর্কালঙ্কার লিখলেন নবদ্বীপে পুত্রের বন্ধু শ্রীনাথ শিরোমণিকে, যাঁর বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করতেন শিবচন্দ্র। 'বাবাজি! তুমি ৺রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পুত্র, দেবী তর্কলঙ্কারের প্রপৌত্র, নবদ্বীপে নব স্মার্তের প্রধান হইয়া কেমন করিয়া যে আমার পৌত্রের জন্য ইংরাজী শিখাইবার প্রস্তাব করিলে তাহা আর বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঐ একমাত্র পৌত্রই আমার বংশের, পূর্বপুরুষগণের জলপিণ্ডের স্থল, বংশের যাহাকিছু দৈব কার্য, দেব সেবা প্রভৃতি সমস্তই ঐ ছেলের ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে, সেই ছেলেকে ইংরাজী পড়াইয়া স্বধর্ম ভ্রষ্ট করিয়া পূর্বপুরুষগণের ও নিজের জল-পিণ্ডের এবং বংশের ধর্ম-কর্মের আশা ভরসার বিলোপ সাধন করিতে আমি পারিব না। শ্রীমানের কলিকাতা থাকা বা ইংরাজী পড়া কিছুতেই হইবে না।'*

ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে শিবচন্দ্র বলছেন,....'তারিণীবাবু আনন্দবাবু আমাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য অনেক যত্ন চেষ্টা করিলেন কিছুতেই কোন ফল হইল না, কারণ পিতামহদেবের আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোনও

*তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—লেখক শ্রীবসন্তকুমার পাল।

কার্য্যানুষ্ঠানের প্রবৃত্তির উপাদান উপকরণ বিধাতা আমার দেহ মনে দেন নাই, সুতরাং আমার সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী পড়ার যেমন এই প্রস্তাব অমনই তাহার প্রস্থান।'

সুতরাং শিবচন্দ্র প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাবধারা নিয়েই বর্ধিত হতে লাগলেন। বেদানুকূল স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের অনুমোদিত আচার অনুষ্ঠান পরায়ণ হয়ে উঠতে লাগলেন। অবশেষে একদিন সংস্কৃত টোলের অধ্যয়নও সমাপ্ত হলো। সম্মানের সঙ্গে সরকারি কর্তৃক 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত হলেন।

এবার এলেন কলকাতায়। ইংরাজী শিখতে নয়। 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পরীক্ষার জন্য। সাক্ষাৎ করলেন সে যুগের পণ্ডিতপ্রবর স্বনামধন্য জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে। প্রবীণ শিক্ষক মুখে মুখেই কয়েকটি প্রশ্ন করলেন তরুণ ছাত্র শিবচন্দ্রকে। শিবচন্দ্রও নির্ভুল উত্তর দিলেন। সন্তুষ্ট হলেন শিক্ষক। অনুমতি দিলেন পরীক্ষা দেবার। শিবচন্দ্র দিলেন পরীক্ষা। সফলও হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'বিদ্যাসাগর' উপাধি গ্রহণে সম্মত হলেন না। কারণ গুরু যে উপাধি ধারণ করে আছেন, শিষ্য হয়ে সে উপাধি তিনি গ্রহণ করবেন কেমন করে? আপন সিদ্ধান্তে শিবচন্দ্র যখন অটল, তখন বিদ্যাসাগরের পরিবর্তে কলকাতার বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁকে 'বিদ্যার্ণব' উপাধিতে ভূষিত করলেন। তৎকালীন শিক্ষাজগতের চরম শিখরে উন্নীত হয়েও এতটুকুও গর্ববোধ করেন নি শিবচন্দ্র। বরং ঔদাসীন্যের সঙ্গে মানপত্র ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন। কারণ সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির অন্তর্জগতে প্রবেশ করে, অনন্ত সূক্ষ্মশক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তরুণ চিন্তাশীল শিবচন্দ্র পরমাপ্রকৃতির নৃত্যশীল চরণযুগলের বিশ্ববিমোহন ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁর অন্তরে যে ঝঙ্কার তুলেছিল তারা মায়ের নৃত্যচঞ্চল পদযুগলের ধ্বনি। তাইতো বিষয়-বিমুগ্ধ মানুষের প্রদত্ত উপহারকে তিনি অঙ্গের ভূষণ করতে পারেন নি। তাঁর অন্তর হতে স্বতঃস্ফুরিত ভাবে উৎসারিত হয় সঙ্গীত। মাতৃ-সঙ্গীত।

ভাইরে! আর কি কর বিদ্যার সাধন
মহাবিদ্যা মাকে ভুলে?

যাত্রা কর সেই পরীক্ষায় তারা নামের নিশান তুলে ॥
তারা বিদ্যা, তারা শিক্ষা, তারা বিশ্ববিদ্যালয়,
শাস্ত্র তারা ছাত্র তারা স্বয়ং গুরু তারাময় ॥
যত দেখ দর্শন শাস্ত্র (ওর) তারার দর্শন কিছুতেই নয়।
ওর সব অদর্শন, যদি আমার তারামায়ের দর্শন না হয় ॥
তারা পদাম্বুজ-প্রান্তে যারা করে তারা লয়।
এই তারাতেই তারা দেখে যায়রে
তারা তার আলয় ॥

* * *

অবশেষে পিতা চন্দ্রকুমার বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য কাশীধামে পাঠালেন পুত্রকে। রামরাম স্বামী শিবচন্দ্রকে পড়াতে লাগলেন বেদান্ত। এই সময়ে তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন শিবচন্দ্র। তন্ত্রচর্চা ও তন্ত্রসাধনা করবার ইচ্ছা ওঁকে ব্যাকুল করে তোলে। দেশে ফিরে পিতামহ কৃষ্ণসুন্দরকে জানান মনোগত ইচ্ছার কথা। তন্ত্রসিদ্ধ কৃষ্ণসুন্দর পৌত্রের তন্ত্রসাধনায় অনুপ্রেরণার এক মূর্তিমন্ত উৎস হয়ে উঠলেন। তাঁরই উৎসাহে তন্ত্রচর্চা ও তন্ত্রসাধনাই হয়ে উঠলো শিবচন্দ্রের জীবনের ধ্যান জ্ঞান মন্ত্র। সবকিছু। নেপাল ও তিব্বত হতে আনীত তালপত্র ও ভূর্জপত্রে হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ কৃষ্ণসুন্দর অর্পণ করলেন শিবচন্দ্রের হস্তে। এছাড়াও ওঁদের গৃহে সুরক্ষিত ছিল তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। সে সমস্ত গ্রন্থই অর্পণ করলেন পিতামহ উপযুক্ত পৌত্রকে তন্ত্রতত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির মর্ম উপলব্ধির জন্য। এইভাবে কৃষ্ণসুন্দরই শিবচন্দ্রের অন্তরের ভাবের সুষ্ঠু বিকাশের সহায়তা করেছিলেন। তখন হতে স্বগৃহই হলো শিবচন্দ্রের সাধন ক্ষেত্র। শাক্তী দীক্ষা গ্রহণ করলেন পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক কৃষ্ণসুন্দরের নিকট থেকে।

ইতিমধ্যে শিবচন্দ্রের বিবাহ সংস্কারও সম্পন্ন হলো। চণ্ডীপুর ভেড়ামারা গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ-কন্যা চিন্তামণি দেবীর সঙ্গে। কিন্তু চিন্তামণি দেবী বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। একটি কন্যাসন্তান রেখে ইহলীলা সম্বরণ করেন। পরবর্তীকালে পিতা চন্দ্রকুমারের আগ্রহে ও নির্দেশে শিবচন্দ্রকে

আবার গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করতে হয়। স্ত্রী হলেন কুমারখালি গ্রামেরই শ্রীযুত শুকলাল মৈত্র মহাশয়ের কন্যা মানমোহিনী দেবী।

শুরু হোল শিবচন্দ্রের সাধনার জীবন। স্বগ্রাম কুমারখালিতেই। তাঁর সমস্ত কিছু অস্তিত্ব, সমস্ত কিছু কর্মোদ্যমের অন্তরালে সদা বিরাজিত ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবী 'সর্বমঙ্গলা মা'। এই ইষ্টমূর্তির সাধনায়ই তাঁর জীবন হয়ে উঠলো দিব্য আনন্দ ও চৈতন্যে ভরপুর। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে, সমগ্র ভারতভূমিতে প্রচারে ব্রতী হলেন। 'সর্বমঙ্গলা সভা' স্থাপন করলেন কুমারখালিতে, কলকাতায় ও বারাণসী ধামে। কখনও অবস্থান করেন কাশীতে কখনও বা স্বগ্রামে। আর সর্বসময়ের সঙ্গী সাথী ভক্ত শিষ্য হলেন দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়।

কাঙ্গাল হরিনাথ প্রতিষ্ঠিত ফিকিরচাঁদ সংসদে যাতায়াত করতেন শিবচন্দ্র। এইখানেই পরিচিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত মরমিয়া সাধক লালন ফকিরের সঙ্গে। ভক্ত সাধক কাঙ্গাল হরিনাথ ও লালন ফকিরের প্রভাব শিবচন্দ্রের মনোজগতে সৃষ্টি করেছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও উদার বোধ। লালন ফকির তাঁর প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে দূর গ্রাম থেকে ছুটে আসতেন শিবচন্দ্রের গৃহে। শিবচন্দ্রকে গান শোনাবার জন্য। শুনিয়ে যেতেন বাউল সঙ্গীত।

সে সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা স্থাপন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। শিবচন্দ্রের মনঃপূত হলো না সে ব্যাখ্যা। লিখে ফেললেন সমালোচনা। প্রবীণ হরিনাথ মজুমদারকে পড়তে দিয়ে জানতে চাইলেন অভিমত। প্রত্যুত্তরে কাঙাল বললেন, 'তুমি শক্তিমান সাধক। তত্ত্ব জানো। এ ধরণের সমালোচনায় শুধু দোষ ত্রুটি উদঘাটিত হয়। এসব না লিখে বরং প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত রস উদ্‌ঘাটন কর। কৃষ্ণলীলা মাধুর্যের রস পরিবেশন কর সর্বজনের কল্যাণে। তাতে কাজ বেশী হবে।' শিবচন্দ্র শিক্ষক ভক্ত সাধক কাঙাল হরিনাথের উপদেশকে শিরোধার্য করে রচনা করলেন 'রাসলীলা'। তন্ত্রসাধকের এই গ্রন্থ প্রমাণ করলো যে, পরমবস্তুতে কোন ভেদ নেই। তাঁর রসের ধারায় পরিতৃপ্ত হলো বাংলার মানুষ। বীরাচারী মাতৃসাধকের

পরিধানে গৈরিক বসন, সর্বঅঙ্গ ভস্মলিপ্ত, কপালে বৃহৎ রক্ত চন্দনের ফোঁটা আর ত্রিপুণ্ড্রক, কণ্ঠে তারা তারা ভীমভৈরব ধ্বনি। কিন্তু অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ভক্তিরসের প্রস্রবণ।

অমাবস্যা তিথিতে মহানিশায় তন্ত্রোক্ত সাধন-উপচার নিয়ে গ্রামের শ্মশানে বসে মাতৃসাধক সমাপন করেন তন্ত্রের নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। আর প্রতিটি দিন ও রাতের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় মাতৃপূজা ও ধ্যানে। দিন মাস বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয় একই ভাবে। জগদম্বার দর্শনের জন্য অধীর হয়ে ওঠে তাঁর মন। মত্ত হন প্রচণ্ড সাধন সমরে। দেখি ছেলে হারে কি মা হারে—এই ভাব! কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য স্বতঃউৎসারিত সঙ্গীতের মাধ্যমে জানান প্রাণের আকুতি। মহামায়াকে।

স্বয়ম্ভু শয়নে নিদ্রা পরিহরি
ষড়দলে সুষুম্না পথ ভেদ করি,
জাগো জাগো, মহা-যোগ যোগেশ্বরী,
সে যোগ সংযোগে জা-গো।
ঢুলু ঢুলু আঁখি উন্মীলন করি,
চাহগো চিন্ময়ী! নিদ্রা পরিহরি,
ব'স দিগম্বর-হৃদে দিগম্বরী,
ঘুচাও মা বিরাগ॥
নব-অনুরাগে মাত মাতঙ্গিনি!
মহাকাল-হৃদে কাল কাদম্বিনী
দোল দোল দিগম্বর নিতম্বিনি
পুরাও যে সোহাগ।
সোহাগের ভরে সাদরে অধরে,
ধর কাদম্বিনী করাম্বুজ পরে,
মাতি শিবানন্দে, মাতাও শিবচন্দ্রে
(দাও) স্বধাম-সমাধি যোগ।
কুল মন্ত্রময়ি! কুল তন্ত্র মাঝে
কুল কুণ্ডলিনী! কুলমন্ত্র বাজে

সে কুল-কুণ্ডলে, এলোকেশী সাজে
একবার সাজগো !
লয়ে কুল-নাথে কুল সমীকুলে
কুল যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও মা ! কুলে
সে আহুতি তরে ও যন্ত্র কুহরে।
জানত মা ! আজ জা-গো।

* * *

সাধক শিবচন্দ্রের ইষ্টদেবী যেমন ভয়ঙ্করা তেমনি মধুরা ও স্নেহময়ী। সেই স্নেহময়ী মাতৃমূর্তির পূর্ণপ্রকাশ যে ঘটাতে হবে তাঁরই হৃদয়-মন্দিরে ! সাধক গেয়ে ওঠেন,

কে রে, শ্যামা ত্রিভঙ্গিনী
অলস আবেশে খল খল হাসে,
একাকিনী তবু সমর রঙ্গিণী।
প্রেমে টলমল অরুণ কমল
মদে ঢল ঢল ত্রিনয়নী।
গলিত বসনে, দলিত রসনে
মধুর হাসনে মন্মোহিনী।
মুক্ত মহাকালে, নৃত্য তালে তালে
নিত্য লীলাময়ী উন্মাদিনী।
শিবচন্দ্র হৃদি-আনন্দ জলধি
তরল তরঙ্গে চন্দ্রাননী।

আবার হৃদ্‌কমলে মায়ের বিশ্ব-বিমোহিনী রূপ দর্শন করে আত্মহারা হয়ে বলছেন,

মা ! তোর এ কি অপরূপ।
এ বিশ্বরূপ নিঃস্ব হয় এর নিকটে।
নাই স্বরূপ জগৎ মাঝে !
অনুরূপ সব ঘটে বটে (এই রূপেরই)॥

সংসার সাগরের রঙ্গ,
দেখি কেবল রূপ তরঙ্গ,
ও সেই রূপতরঙ্গে গুপ্তরঙ্গ,
কূপ তরঙ্গ জেগে ওঠে ॥

* * *

সৌন্দর্য প্রসব ভূমি
ত্রিপুর সুন্দরী তুমি
তাই ত্রিগুণ এই পঞ্চার
এই ত্রিপুর মহাপীঠে (মা গো তোমার বিরাজ) ॥
বাজনে তোমার মহাযন্ত্র।
ত্রিতন্ত্রী তার কেবল তন্ত্র,
তোমার শিবচন্দ্রের মনো-যন্ত্র
তাই মা, মা-ময় মন্ত্র রটে ॥

* * *

জীবকে অভয়দান করবার জন্যই অভয়া মায়ের এই মুক্তকেশ লীলা। তাইতো সাধক মাঝে মাঝে ভাবের ঘোরে গেয়ে ওঠেন 'নাচ মা মোর এলোকেশী'—

এই দেখছি শ্যামাঙ্গিনী
হচ্ছে আবার হেমাঙ্গিনী
এই দেখছি মা রক্তবস্ত্রা,
অমনি দেখি উলঙ্গিনী।
এই যে মা তোর বেণীবন্ধ
আবার দেখি মুক্তকেশে,

* * *

এই দেখি মা ত্রিনয়নে
চন্দ্র সূর্য অগ্নিজ্বলে।
আবার দেখি সেই নয়নে
করুণা কটাক্ষ গলে ॥

* * *

মাতৃ অন্তপ্রাণ শিশু যেমন জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলেই শান্ত হয়, সাধক শিবচন্দ্রও তেমনি জননীর স্নেহ-সুশীতল অঙ্কে বিরাম লাভ করবার জন্যই সতত ব্যাকুল। তাই ত ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গাইছেন,

দে মা! আমার গুরুর স্বরূপ
আমি নয়ন মুদিয়া মা! তোর দেখি গুরুর রূপ॥
জাগো মাগো মূলাধারে
দেখা দে মা সহস্রারে
বস এসে হৃদয় মন্দিরে
আমি গুরুর কোলে দেখি তোমায়
তোমার কোলে দেখি আমায়,
হও, শ্বেতাঙ্গ রক্তাঙ্গ মাঝে, ত্রিভঙ্গ শ্যামাঙ্গ স্বরূপ॥
বাজাও বাঁশী নাচাও অসি,
নাচ মা মোর এলোকেশী,
অট্ট অট্ট হাস মা উল্লাসে
আমি, তোমার হাসি দেখে হাসি,
ভুলে যাই সে গয়াকাশী—
শিবচন্দ্র বলে হাসি
সেই ত কাশীনাথের স্বরূপ॥

যে রূপের প্রভাবে নিখিল জগতের আঁধার কালিমা নিরন্তর বিদূরিত হচ্ছে এ সেই রূপ। জৈব চোখে প্রত্যক্ষ হয় না। তাই সাধক দিব্য দৃষ্টিময় অন্তশ্চক্ষু প্রার্থনা করছেন, যাতে তিনি প্রাণভরে শ্রীগুরুকে দর্শন করতে পারেন। গুরুদেবের যে রূপরাশি হৃদয়পটে হাস্যময়ী ছটায় বিভাসিত হয়। শক্তিরূপা জননীকে মূলাধার বিবর হতে কুলকুণ্ডলিনী রূপে জাগরিতা হয়ে সহস্রারে এসে দর্শন দিতে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

এ যে অন্তরের আহ্বান! প্রাণে না জাগলে নয়নে যে তাঁকে দেখা যায় না। মুক্ত জীব নাহলে কি কেউ কখনও মুক্তকেশীর স্বরূপ রূপ দর্শনের অধিকারী হয়? এইজন্যই তো এলোকেশীরূপে নৃত্য-নিরতা মায়ের স্বরূপ দর্শন লালসায় লালায়িত আজ সাধক। তার চিত্ত করুণাময়ীর চরণ-মধু

পানের জন্য ব্যাকুল। যখন যে অবস্থায়ই থাকেন এলোকেশী মায়ের রূপই অন্তর খুলে ধ্যান করেন। নয়ন গোচর করেন মায়ের চরণ যুগলের জগৎ ভোলান নৃত্য। আর নিরন্তর উন্মুখ হয়ে শোনেন মায়ের মুখের কলকল, খলখল হাস্যের তরঙ্গ-ধ্বনি। মায়ের চরণ-কমলের রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে সাধক বলছেন, শিবচন্দ্রের ভাষায় 'ও চরণে কি আছে তাহা কে কেমনে বুঝিবে বল? তাই ভাবি মা! সবাই যদি তাহা বুঝিতে পারিত, সবাই যদি চরণ ধরিত, তবে কি চরণ চলিতে পারিত? সদাশিব আর কেশপাশ যে চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছেন, ইহাতেই ত রক্ষা নাই। যেখানে চরণ সেইখানেই শিব। যেখানে শিব সেখানেই চরণ। সেইখানেই কেশপাশ। যেখানে কেশপাশ সেখানেই চরণ। ইহার পর জগদ্বাসী যদি চরণ মাধুরী বুঝিয়া চরণ চাতুরির অধিকার পাইত তবে তো চরণে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগন্ময় চরণ দেখিত! বিপদুদ্ধারের কারণ ও চরণ লইয়া তুমি মা কি বিপদেই পড়িয়াছ যে, কিছুতেই আর অব্যাহতি নাই। যেখানে পদক্ষেপ করিবে, ঐ আপদের মূল কেশপাশ তোমার সেইখানেই পদে পদে বাধা দেয়—ও বিষম মায়াজাল ছিঁড়িবার জন্য যে এ সংসারে ও-পদ হৃদয়ে ধারণ করিতে চায়। পদধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সোহাগে নাচিয়া নাচিয়া মায়ারূপী কেশপাশ আগে গিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে। কেশপাশ কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, কিছুতেই চরণ ছাড়িবে না? মায়ার অতীত মা, তুমি! যাঁহার চরণ স্মরণে মায়ার আঁধার দূরে পালায়, সেই মায়ের চরণে মায়ার সঙ্গ এ যে বড় বিষম রঙ্গ।' মায়ালীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন সাধক শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের ভাষায়, 'মাতৃভুক্তানুসারেণ বর্দ্ধতে জঠরে স্থিতঃ।' মাতা যেরূপ পদার্থের ভোগ বা ভোজন করেন, সেই ভুক্ত পদার্থের গুণানুসারে গর্ভস্থ সন্তান আমরাও তদ্রূপ গঠিত ও বর্দ্ধিত হইব। তাই প্রকৃতির ভোগ্য পদার্থ রাজস ও তামস অংশ অতিক্রম করিয়া যাহাতে সাত্ত্বিকরূপে পরিণত হয় তাহাই জীবের একান্ত কর্তব্য। রীতি নীতি আচার বিচার, বিধি ব্যবস্থা সাধন ভজন মন্ত্র তন্ত্র যতকিছু সমস্তই ইহার জন্য। আত্মপ্রকৃতিকে সাত্ত্বিক ভোগে পরিতুষ্ট করিয়া তাহার সেই ভুক্ত গুণে স্বয়ং পরিতুষ্ট হইয়া যিনি যথাকালে নির্বিঘ্নে মায়ার

গর্ভকোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবেন, তিনিই প্রসবের পর সেই মহামায়া মায়ের প্রসূতিরূপ দর্শন করিয়া সাদরে তাঁহার ক্রোড়ে স্থান লাভ করেন। গর্ভস্থ সন্তান যেমন দুরন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রসবের পর জননীর স্নেহময় মুখ দেখিয়া সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়, সাধনসিদ্ধ যোগীন্দ্র পুরুষও তেমনি মায়াকোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মময়ী জননীর বিশ্ববাৎসল্যপূর্ণ বদনমণ্ডলের কৈবল্য কান্তিচ্ছটায় দ্বৈত সংসারের নিখিল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া যান। যে মায়ার গর্ভকোষে থাকিয়া একদিন সাধককে মোহ মায়া অন্ধকারের বিভীষিকা দেখিতে হইয়াছে, আজ তিনি সেই মায়ের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আবার সেই বিশ্বপ্রসূতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু অন্ধকারের পরিবর্তে সেই শতকোটি শরদিন্দুসমুজ্জল আনন্দসুন্দর জ্যোতির্ময় সত্তাসাগরে ডুবিয়া তখন ভাবের তরঙ্গে স্নেহের হিল্লোলে মায়ের কোলে দুলিয়া দুলিয়া খেলিতেছেন আর দেখিতেছেন—'মায়া আর মায়া নাই। মায়াময়ী হইয়াছে।'

সাধক প্রবর আবার বলছেন, 'যাকে তুমি সংসারে অনিত্যতা বল, ঘুরে ফিরে তাই সংসারের নিত্যতার নিত্যস্রোত। ইহলোকে পরলোকে নিরন্তর যাতায়াতে সংসার যে নিত্য সত্য। এই সমাচারই নিত্য আসে। তাই অনিত্য হয়েও সংসার নিত্য-নিত্য। তাই আমার সে নিত্য সংসারের নিত্য বন্ধন শৃঙ্খল কেবল চিন্ময়ীর চরণ চিন্তা। পাছে অদ্বৈতবাদে গিয়ে মায়ে-পোয়ে এক হয়ে যাই, এই ভয়েই নিত্য সংসারকে নিত্য নিত্য প্রাণভরে ভালবাসি। মুক্তির কুহকে পড়ে পাছে মা মুক্তকেশীর চরণ ছাড়া হই, এই ভয়ঙ্কর আশঙ্কাতেই এ সংসার ছাড়তে পারি না।'

'মায়ের মুখে মধুর হাসি না দেখিয়া দণ্ডে দশবার মাগো মা! ওগো মা! মা আমার, উমা শ্যামা মা ওমা! না বলিয়া কেমন করিয়া মুক্তির পরে মাকে না পাইয়া থাকিব? এজন্য মায়ের প্রেম নিগড়ে এ বন্ধন অপেক্ষা মুক্তিও আমার সুখের নহে।' এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই সাধক শিবচন্দ্র সংসারে থেকেই পূজা-অর্চনা সাধন-ভজন সবকিছুই করতেন। বন্ধু পরিজনদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করেও আনন্দময়ীর নিত্য নিকেতনে আনন্দেই দিন যাপন করতেন। এই সংসার আশ্রমও ত জগন্মাতারই রচিত। তিনি ছাড়া ত নয়। এ সংসারও ত সেই মায়েরই সৃষ্ট পুণ্যনিকেতন। তাই দিবারাত্র সেই

বিশ্বজননীকে নয়নের সম্মুখে রেখে প্রেমানন্দে মেতে থাকতেন। অবশেষে একদিন বীরাচারী তন্ত্রসাধক সংসারে থেকেই কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধিলাভ করলেন। মা-ময় হয়ে গেল তাঁর দেহ মন আত্মা। আত্মারাম হলেন সাধক শিবচন্দ্র। তন্ত্র সাধনার মধ্য দিয়ে যে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তা সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করলেন গ্রন্থের মাধ্যমে। বিশাল গ্রন্থ 'তন্ত্রতত্ত্ব' রচনা করলেন। আরও রচনা করলেন 'চণ্ডীতত্ত্ব', 'মা', স্বভাব ও অভাব, রাসলীলা, গীতাঞ্জলি ও 'গঙ্গেশ' নাটক। গঙ্গেশ নাটক প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'আমাদের দেশে বহু সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু তাঁদের অলৌকিক চরিত-কথা সম্পর্কে সাধারণ বাঙ্গালী অজ্ঞ, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তাই গঙ্গেশের তপঃসিদ্ধির প্রভাব সাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্যেই আমি তাঁর জীবনকাহিনী নাট্যাকারে গ্রথিত করিয়াছি।'

তান্ত্রিক সাধনার মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে, সাধক লেখক শিবচন্দ্র, মধ্য যুগের বঙ্গভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ রচয়িতা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের জীবন বেছে নিয়েছেন। গঙ্গেশ ছিলেন মাতৃসাধক, জন্মান্তর সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ। কোন্ দৈবী প্রেরণায় সাধক শিবচন্দ্র এ গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই প্রসঙ্গে বলছেন, 'সকল রসের পর্যবসান যে রসে হয়, গঙ্গেশের জীবন সেই রসেরই মত্তমধুকর। যে চরণারবিন্দ হইতে এ রসমকরন্দ নিত্য নির্গলিত, সে রসে যিনি আত্ম-সমর্পণ করিয়া সেই কমলের সেই সরোবরে চিরশয্যায় শয়ন করিয়া স্বয়ং চৈতন্যময় হইয়াও শবরূপে সাজিয়াছেন, তাঁহার সে অপরূপ রসের কথা তুলিয়া আর কাজ কি ভাই! এ রসের কথা যে লেখে সেও পাগল, যে শোনে সেও পাগল, যে বোঝে সে যে পাগল সে কথা আর বলিবার অপেক্ষা কি আছে?'

তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রাণদীপ্তি ও জীবনসিদ্ধির উপায় রূপে মাতৃ সাধনাকে গ্রহণ করলেও, বৈষ্ণবীয় প্রেম সাধনার মর্মেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তার নিদর্শন রয়েছে 'রাসলীলা' গ্রন্থে। রাসলীলা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন, 'রাসক্রীড়াচ্ছলে কামদর্প নির্মূলণ করাই ভগবানের উদ্দেশ্য। রাস প্রারম্ভে তাঁহার যাহা কিছু কার্য ও চেষ্টা, তাহার সমস্তই কামদর্প

সম্বর্ধনের জন্য। কেননা সে দর্প সম্বর্ধিত না হইলে, ভগবৎশক্তির পরিস্ফুরণ ও পরিচয় সম্ভবে না। এই জন্যই মহর্ষি ভগদ্বংশী গীতের বিশেষণ দিয়াছেন 'অনঙ্গবর্ধনং'—ব্রজবধূমণ্ডলী ভগবৎপ্রেমোৎকণ্ঠিতা বিরহব্যাকুলা এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতির প্রতীক্ষাপরায়ণা, তাহাতে আবার বংশীধ্বনি অনঙ্গবর্ধন। কামাগ্নি সন্দীপন। এস্থানে আশঙ্কার বিষয় এই যে এক সময়ে এক পুরুষের নিকট সহস্র সহস্র কামিনীর কামচেষ্টার চরিতার্থতা যে একেবারেই অসম্ভব এবং তাহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সাপত্ন্যবিদ্বেষও স্বভাবতঃই সুসম্ভব। সেই আশঙ্কার অপনোদনার্থ ই হেতুগর্ভ অপর বিশেষণ "কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁদের মনোবৃত্তির স্বাধীনতা লোপ করিয়া, আত্মাধীন করিয়াছেন। আত্মাভিমুখে জীবের মনোবৃত্তি আকর্ষণ করা যাঁহার স্বভাব-ধর্ম, তাঁহারই নাম কৃষ্ণ। এ আকর্ষণ শক্তি ভগবানে ভিন্ন জীবে কখনও সম্ভবে না। কামশক্তির অভ্যন্তরে ভগবৎ শক্তির প্রেরণা না থাকিলে কেবল কামিনী হইলে, ব্যাকুল কামিনীকুল কখনও একদা একত্র একের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেন না। এ স্থলে কামের কামশক্তি, গোপীর সাধনা শক্তি ও প্রেমশক্তি আর ভগবানের কৃপাশক্তি, শক্তি-লীলার এই চতুষ্পথ আসিয়া একত্র সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভগবানের কৃপাশক্তি একা একেশ্বরী, এক পথ হইতে আসিতেছেন, অন্যদিক হইতে গোপীর সাধনাশক্তি ও প্রেমশক্তি তাঁহার অভিমুখে ছুটিয়াছেন। এখন কামের কামশক্তি স্বাধীনভাবে স্বপ্রকাশ হইয়া ভগবানের সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহসী নহেন। এমন কিছু আবরণের প্রয়োজন যাহাতে কাম সেই আবরণে আত্মগোপন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে স্বশক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল গোপীর দেহপথে। সাধনাশক্তি ও প্রেমশক্তি একত্র যাত্রা করিয়া ভগবানের কৃপা-শক্তির অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন, পরস্পরের আলিঙ্গনে পরস্পর বিজড়িত, এই অবসরে তাঁদের অঞ্চল আবরণে কামের কামশক্তি সেই পথে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে আসিয়া সকলে সম্মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থলেই গোপীর সাধনাশক্তি ও প্রেমশক্তি উভয় দিক হইতে পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া ভগবানের কৃপাশক্তির অবলম্বনে তাঁহার বাম-দক্ষিণ উভয় পার্শ্বের সঙ্গিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কামের কামশক্তি তখনই আবরণের অভাবে স্বপ্রকাশ

হইয়া পড়িয়াছেন। কেননা, স্বপ্রকাশ ভগবানের সন্নিধানে কাহারও অপ্রকাশ থাকিবার উপায় নাই।'

* * *

'কুলনাথ আজ প্রেমসাগরের অকূলকূলে আকর্ষণ করিয়াছেন। কাহার সাধ্য তাহার জলে আত্ম অস্তিত্ব রাখিতে পারে?……যে অগাধ প্রেমের জলে কামের কুম্ভ ডুবাইয়াছেন দেখিতেছেন তাহাতে একা গোপী কেন? অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর নরনারী, ঐ ত্রিতাপহরণ বারিদবরণ বারিসঞ্চয়ের জন্য তাঁহার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কেহ ডুবিয়াছেন কেহ ডুবাইয়াছেন, কেহ ডুবিতেছেন কেহ ডুবিবেন কেহ ডুবাইবেন,—কিন্তু যিনি একবার আসিয়াছেন তিনি আর ফিরিয়া যাইবেন না। যদিও কেহ ফিরিয়া যান, যেমন আসিয়াছিলেন তেমন আর যাইবেন না, শ্যাম সাগরের অগাধ জলে কামের কান্তি ধুইয়া গিয়া প্রেমিকের প্রেমময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শ্যামকান্তি ছড়াইয়া পড়িবে। তখন কি সাগরে কি নগরে কি গগনে কি পবনে কি ভুবনে কি ভবনে শ্যামময় নয়ন হইয়াছে, অথবা নয়নময় শ্যাম হইয়াছেন। বাঁশী বাজাইয়া মন হরণ করিয়া মনের অধীশ্বর আপনি আসিয়া মনের স্থান পূরণ করিয়াছেন; মনের সঙ্গে প্রাণকেও আকর্ষণ করিয়াছেন।……'গোবিন্দাপহৃতাত্মা' অর্থাৎ গোবিন্দ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে আত্মা যাঁহাদিগের। বহির্মুখ দেহবৃত্তি বাহিরে আকর্ষণ করিয়া যোগীন্দ্রগণের অন্তরের নিধি, বহির্বৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননে প্রেমমন্থর নব নটবর ত্রিভঙ্গমধুর ত্রিজগতের নাথ শ্যামসুন্দর সাজিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভগবান কামকিঙ্কর হইয়া রাসলীলার অভিনয় করেন নাই। কামসাগরের পারান্তরে থাকিয়া কাম সমরে বিজয় পতাকা উড়াইয়াছেন। রাসলীলার অভিনয় তাহারই অজর অক্ষর অটলস্তম্ভ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাসলীলার পঞ্চাধ্যায়ে ভগবান বেদব্যাস সেই স্তম্ভেরই স্তরভেদ করিয়া প্রেমভক্তির সুকোমল সুচিত্রিত সোপানপরম্পরা বিরচিত করিয়াছেন, আজও তাহার অঙ্গে অঙ্গে অনন্তরূপ ভগবান অনন্তচরণের অনন্ততালে নৃত্য করিয়া প্রেমমন্ত্রের সুমধুর মোহনবংশী নামে অনন্ত জগতের ভক্ত মনঃ প্রকৃতি কুলকে সংসার সন্ন্যাসী সাজাইয়া আত্মাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া জগদ্বিজয়ী 'কৃষ্ণ' নামের অতুল মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিতেছেন। শ্রীধর স্বামী তাই রাস

ব্যাখ্যার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণচ্ছলে মদন সমর-রসোল্লাসে মদন মোহনের বিজয়-গাথা কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন,

ব্রহ্মাদিজয়-সংরূঢ়দর্প-কন্দর্পদর্পহা
জয়তি শ্রীপতি গোপীরাসমণ্ডল মণ্ডিতঃ।"

* * *

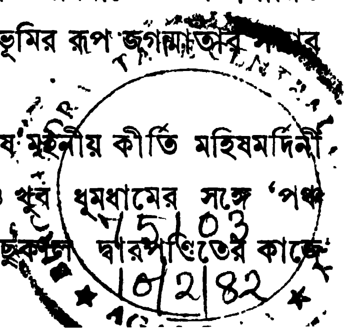
তখন ১৯০৫ সাল। সমগ্র দেশব্যাপী সুরু হয়েছে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। কুষ্টিয়ায়ও স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান বক্তা ও উদ্যোগী হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অম্বিকা মজুমদার, অক্ষয়কুমার মৈত্র, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি। অক্ষয়কুমার মৈত্র শিবচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শিবচন্দ্রের পরিধানে ছিল রক্ত গৈরিক বসন, ললাটে সিন্দুর রক্ত চন্দন তিলক, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকমালা, বাহুতে প্রস্তরমালা। যেন এক মহাশক্তিধর তন্ত্রসিদ্ধ মহাসাধকের চেহারা। বেশ ভূষার সঙ্গে নামের অপূর্ব মিলন ঘটেছিল। ভবভয়হীন দুর্জয় বিরাট পুরুষ যোগীন্দ্র শিবচন্দ্র দশ সহস্রাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীর মহতী সমাবেশে দণ্ডায়মান হয়ে বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, 'দক্ষযজ্ঞে আর একবার মাকে এমনি করেই অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল। বাঙলার এই মাটি শুধু মাটি নয়, 'মা'-টি। এই মা-টিকে খাঁটি বলে চিনতে না পেরে আমরা মাটি হতে চলেছি।'..........। স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনলেন শিবচন্দ্রের বক্তৃতা জনসাধারণ। গ্রাম্য মানুষেরা। আর অভিভূত হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন ইংরাজী ভাষায়। গ্রামাঞ্চলের খুব কম লোকেরই তা বোধগম্য হয়েছিল। সে সভায় বক্তৃতার মাধ্যমে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন শিবচন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথও ভূয়সী প্রশংসা করলেন শিবচন্দ্রের। সেদিনের সেই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে শিবচন্দ্র ব্যক্তি হিসাবেই শুধুমাত্র বিখ্যাত হয়ে পড়লেন না, তাঁর তন্ত্র ধর্মকেও তিনি এক অভিনব মহিমায় মহনীয় করে তুললেন! তিনি আরও বলেছিলেন, 'দেশমাতা আর জগন্মাতার কোনো ভেদ নেই। অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী হয়ে রয়েছেন মা ব্রহ্মময়ী। এই ধরিত্রী ও তার অংশ ভারতবর্ষ সেই ব্রহ্মময়ীরই অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। জগজ্জননী মহামায়া যেমন

বিশ্বাতীতা, তেমনি আবার বিশ্বগতাও বটেন। তাই ধ্যান দৃষ্টিতে দেখা যায়, দেশমাতার ভেতরেই রয়েছেন চৈতন্যরূপা ব্রহ্মময়ী।'

সেদিনের ঐ স্মরণীয় বক্তৃতা সম্পর্কে 'গৌর ভাবিনী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধাবিনোদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'শিবচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ' প্রবন্ধের মাধ্যমে লিখছেন, 'তাঁহার সেই ছন্দোময়ী ভাষার কি মাধুর্যময়ী তেজস্বিতা, আর তাঁহার সেই উদাত্ত কণ্ঠের কি কমনীয় নমনীয়তা! তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া ললিত উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করিতেছিলেন, মনে হইতেছিল যেন পুণ্যসলিলা জাহ্নবী কলতরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন! তদুপরি তাঁহার ত্রিপুণ্ড্রক লাঞ্ছিত গৌরবর্ণ ললাটস্থিত রক্ততিলকের আভা, আয়তনেত্র সমুদ্ভাসিত তপ্তকাঞ্চন-বিনিন্দিত মুখমণ্ডলের সেই প্রশান্ত জ্যোতি, আবক্ষলম্বিত কাঁচ পাথর সমন্বয়ে গ্রথিত রঙবেরঙের বিচিত্র রুদ্রাক্ষের মালা, সর্বোপরি আজানুলম্বিত সেই রক্ত গৈরিক সবগুলি মিলিয়া তাঁহাকে এক অনির্বচনীয় শ্রী প্রদান করিয়াছিল। তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতে-ছিলেন ভাবে বিভোর হইয়া। আর তাঁহার দুই আয়ত নেত্র বহিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিতেছিল। মহাকবি ভবভূতির বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি ইত্যাদি উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, সেদিন সেকথা আমরা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, শিবচন্দ্র সত্যই একজন লোকোত্তর-চরিত পুরুষ।'

সাধক শিবচন্দ্র দেশমাতৃকার মধ্যে মহাশক্তি মহামায়ার চৈতন্য সত্ত্বাকে অনুভব ও উপলব্ধি করেছিলেন। দেশমাতৃকা ও জগন্মাতার মধ্যে অভিন্নতা ও ঐক্যানুভূতি চিন্তা বা অনুভব করা নব্য বাঙলার তন্ত্রধর্মের নবাবিষ্কার। জননী জন্মভূমি ও জগন্মাতার মধ্যে এক অখণ্ড চৈতন্য-সত্তা স্রোত অন্তঃ-প্রবাহিত। এই অনুভব, উপলব্ধি বাস্তব তন্ত্রতত্ত্বের সাধনাতেও সম্প্রসারিত ছিল। তাইতো তিনি এক স্বাধীন অখণ্ড ভারতভূমির রূপ জগন্মাতার সত্তার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন।

সাধক শিবচন্দ্রের জীবনের আর একটি বিশেষ স্মরণীয় কীর্তি মহিষমর্দিনী দেবীর বিভিন্ন অবতার মূর্তিতে মহাড়ম্বর ও খুব ধুমধামের সঙ্গে 'পঞ্চ দুর্গোৎসব' অনুষ্ঠান। বলিহার রাজবাড়ীতে কিছুকাল দ্বারপণ্ডিতের কাজে



নিযুক্ত থাকবার পর, ভাল না লাগায়, ঐ কার্য পরিত্যাগ করে স্বগ্রাম কুমারখালিতে ফিরে এসে এই পঞ্চ দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। এই মহোৎসবের বিশেষ তাৎপর্য হলো, এই পূজার মাধ্যমে তিনি ভক্ত শিষ্যদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, বিবিধের মাঝে আছেন অখণ্ড অভেদ এক ভগবান। চৈতন্যরূপা পরব্রহ্মময়ী মহামায়া। এই পঞ্চ দুর্গোৎসবের ফলে সাধক শিবচন্দ্রের সাধনার যশঃসৌরভ বঙ্গভূমিতে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের নিকটই তিনি শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি ভিন্নধর্মীয় সংস্কারের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

কাশী ও বৈদ্যনাথধাম ছিল শিবচন্দ্রের খুব প্রিয়। কাশীতে নানা গুপ্ত শক্তিপীঠে বিশেষ করে মণিকর্ণিকার শ্মশানে কৌল পদ্ধতি অনুসারে বহু নিগূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়া তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। 'সর্বমঙ্গলা সভা' স্থাপনের পর দীর্ঘদিন কাশীই ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। আবার তপস্যার জন্য তিনি বৈদ্যনাথধামের নির্জনতায়ও কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। বৈদ্যনাথধামের শ্মশানটি ছিল শিবচন্দ্রের অতিশয় প্রিয়। অমারজনীর গভীর তমিস্রায় প্রাচীন সেই শ্মশানভূমির বুকে বসে শব সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন সাধকপ্রবর। বৈদ্যনাথ ধামের তান্ত্রিক সাধক গঙ্গাপ্রসাদ ফলাহারী অনুরক্ত হয়ে পড়েন শিবচন্দ্রের প্রতি এবং শ্মশানের সেই নিগূঢ় অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন সহকারীরূপে।

এই ভাবে শিবচন্দ্র ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, কাশ্মীরখণ্ডের শারদাপীঠ অমরনাথ, জম্মু রাজ্যের ত্রিকূট 'ভগবতী', পাঞ্জাবের জ্বালামুখী কাঙড়াদেবী, উত্তর প্রদেশের হরিদ্বার হৃষীকেশ কেদার বদরীনারায়ণ, আসামে কামাখ্যাদেবীর মন্দির ও বঙ্গভূমির তারাপীঠ, দক্ষিণভারতের বিভিন্ন স্থান, তিব্বত, নেপাল ও মহিমময় হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করে সাধনা করেন। এছাড়া নর্মদা কাবেরী গঙ্গা,যমুনা ও সিন্ধুর ঘাটে ঘাটে তটে তটে অরণ্যানী অঞ্চলে তীব্র তপশ্চর্যা করেন। তবে যখন যেখানেই অবস্থান করেছেন ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার অর্চনা ও ভোগের ব্যাপারে ত্রুটি হতে দেন নি। তান্ত্রিকী পূজার উপচার ও বিধি বিধানে কোনরূপ ত্রুটি

বিচ্যুতি ঘটবার উপায় ছিল না। সে গৃহেই হোক বা শ্মশানেই হোক। সবকিছুই অলৌকিক ভাবে সম্পন্ন হয়ে যেতো।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনে কৃপালীলার প্রকাশও বহুবার দেখা গেছে। শুধু মাত্র ভক্ত মুমুক্ষু মানুষই তাঁর আশ্রয় লাভ করেন নি, ঈশ্বরবিমুখ সংশয়-বাদীরাও তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়ে উন্নততর জীবন লাভ করেছেন।

ঈশ্বরদ্বেষী কালীধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এমনই এক ব্যক্তি। হাওড়ার ব্যাঁটরা গ্রামে তিনি বাস করতেন। শিবচন্দ্র যখন হাওড়া শিবপুরে অবস্থান করছিলেন তখনই সাক্ষাৎ হয় কালীধন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর প্রথম দর্শনেই অভিভূত হন কালীধন চট্টোপাধ্যায়। কালীধনকে দেখা মাত্রই শিবচন্দ্র স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওরে আয় আয়। আমার কাছে আয়। মায়ের পাগল ছেলে যে তুই। এতদিন মা'কে ভুলে কোথায় ছিলি রে? তোর সঙ্গে একটিবার দেখা না করে যে আমি এ জায়গা ছাড়তেই পারছিলুম না। আয় আয়!' মুহূর্ত মধ্যে কালীধনের নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সিদ্ধ পুরুষের জ্যোতির্ময় দিব্যমূর্তি। সমস্ত দেহ ঘন ঘনকম্পিত হতে লাগলো। দেহ মন আত্মায় অনুভব করলেন অপূর্ব এক শিহরণ। যা জীবনে কখনও অনুভব করেন নি। বিস্মিত অভিভূত কালীধন মহাত্মার চরণে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। অবশেষে যোগিবরের স্নেহাশীর্বাদে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এলেন। শিবচন্দ্র তাঁকে দীক্ষা দিয়ে, তন্ত্রানুসারী সাধন ক্রিয়ার মাধ্যমে বিশিষ্ট সাধকরূপে গড়ে তুললেন। শিবচন্দ্র অবশ্য সংসারে থেকেই সাধন করতে বলতেন। এক সন্ন্যাসকামী দীক্ষিত শিষ্যকে এক সময় বলেছিলেন, 'দেবাদিদেব স্বয়ং বলেছেন, গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও ভক্ত সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঘর-সংসারে জড়িয়ে থেকে কেবলই ধন বৃদ্ধি ক'রে যেতে হবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সাধন ও গুরুকৃপার বলে ব্রহ্মলাভ করে থাকে, আবার সংসার আশ্রমী সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুরণ হলে গোটা সংসারটাই হয়ে পড়ে ব্রহ্মময়। সংসার ছেড়ে অতদূরের পথ পর্যটন করা কলিযুগের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তাই তন্ত্রশাস্ত্র বলেছেন, সংসারে বাস করেই বাড়িয়ে তোল ব্রহ্মদৃষ্টি। যে সব সাধক গৃহী হয়েও বৈরাগ্যবান্ এবং কায়মনোবাক্যে

সন্ন্যাসী, তারাই ত সত্যকার শ্মশানবাসী। শব আর কঙ্কালে পূর্ণ পূতিগন্ধময় মহাশ্মশানে তাঁরাই ত চৈতন্যরূপী মহাশিব।......সংসারে থেকেই ক্রিয়াবান সার্থক তান্ত্রিক হও, মহামায়ার চরণ ধরে পড়ে থাকো, মায়ার কেশপাশে আর জড়িয়ে পড়তে হবে না।'

হাওড়ার শিবপুর নিবাসী মুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীশশধর বন্দ্যোপাধ্যায়ও শিবচন্দ্রের কৃপালাভ করে উত্তর জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন। প্রথমে ইনি তারাপীঠে বামাক্ষেপার নিকট দীক্ষা ও সাধন প্রার্থনা করেন, কিন্তু বামাক্ষেপার নির্দেশেই তিনি শিবচন্দ্রের চরণ আশ্রয় করেন।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা শ্রীরামেশ্বর সিং শিবচন্দ্রকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন স্বীয় রাজপ্রাসাদে এবং সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তন্ত্রতত্ত্বের অনুশীলন করেন। তাঁরই অর্থানুকুল্যে শিবচন্দ্রের অনেকগুলি রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

শিবচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের সর্বভারতীয় খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বারাণসীধামে দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন পণ্ডিত শিবচন্দ্রের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সাধনার প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে সাধক জীবনে উন্নীত হন। কয়েকজন জার্মান পণ্ডিতও তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে কাশীধামে এসে শিবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং তন্ত্রতত্ত্বের স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে তান্ত্রিক তত্ত্ব সাধনার গভীর মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হতে সক্ষম হন।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনের আর একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় হলো কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন উডরফকে দীক্ষা দেওয়া ও তন্ত্র প্রচারে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করা। সে যুগে ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে তন্ত্র ছিল অবজ্ঞাত ও অবহেলিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মত যুগন্ধর পুরুষও তন্ত্রকে সম্যক মর্যাদা দিতে পারেন নি। অধিকাংশ বিদেশীর চোখে তন্ত্র ছিল হীন বৃত্তির পরিপোষক এক প্রকার কুসংস্কার। কোন্ এক অজানা প্রেরণায় উডরফ তখন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অতল গহ্বরে ডুব দেবার চেষ্টা করছিলেন। আর এই কারণেই তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন হাইকোর্টের সরকারী দোভাষী হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়কে। তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। এবং অল্প

দিনের মধ্যেই প্রতিভাধর উডরফ্ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। এই সময়ে হাইকোর্টেব প্রবীণ উকিল অটলবিহারী ঘোষের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা জন্মে স্যার জন উডরফের। অটলবিহারী ছিলেন 'আগম অনুসন্ধান সমিতির' একজন বিশিষ্ট সদস্য। কিছুদিনের মধ্যেই উডরফ এই সমিতির সংস্রবে এসে তন্ত্র-সাধনার রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থও অধ্যয়ন করলেন। কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হলো না। তন্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের পিপাসা তাঁকে অধীর করে তুললো। সে সময় পুরী কোণারকের সেই নীলাম্বুবেলায় অনেকেই উডরফকে নগ্নপদে ভ্রমণ করতে দেখেছেন। কেবল পুরী কোণারকেই নয়, দূর গ্রাম গ্রামান্তরে তীর্থে তীর্থে ছোট বড় খ্যাত অখ্যাত মন্দিরে মন্দিরে উডরফ গভীর তৃষ্ণায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।* সুদূর পল্লী বাংলার শ্মশানে কালী মন্দিরে উডরফকে দেখেছেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অনেকেই। দেখেছেন বীরভূম জেলার বেহুলা নদী তীরবর্তী আমোদপুর গ্রামের মহাশ্মশানের কালীমন্দিরে। অকস্মাৎ এক রকম দৈবযোগেই উপস্থিত হলো এক পরম সুযোগ। হাইকোর্টের একটি মামলার ব্যাপারে হিন্দু শাস্ত্রের বিশেষত তন্ত্র শাস্ত্রের কতকগুলি প্রশ্নের উপর আলোকপাতের জন্য কাশী থেকে আহ্বান করা হয় পণ্ডিত সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে। হরিদেব শাস্ত্রী সহাস্যে উডরফকে বল্লেন, 'আপনি একজন উচ্চকোটির তন্ত্রবিদের সন্ধান চাচ্ছিলেন, এবার তিনি এসে গেছেন।'

কে বলুন তো শাস্ত্রীজী ? ব্যগ্রভাবে জিগগেস করলেন উডরফ।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কথাই আমি বলছি। হাইকোর্টের কাজ উপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছেন। এই সুযোগে আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। তন্ত্র সাধনার গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে সবকিছুই অবগত হতে পারবেন। তবে তিনি কিন্তু ইংরাজী জানেন না। এমন আচার্য আপনার পছন্দ হবে কিনা জানিনে।

—ইংরেজী না জানা শাস্ত্রবিদ্ই তো আমি চাই। তাঁর ভেতরে রয়েছে নির্ভেজাল বস্তু।'

অবশেষে হরিদেব শাস্ত্রীর সহায়তায় উডরফ নিজ ভবনেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গে।

শক্তি সাধক তন্ত্র তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে প্রথম দর্শন করেই অভিভূত হলেন স্যার জন উডরফ। তারপর সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা শুরু করলেন তন্ত্র শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে।

উডরফ হৃদয়ঙ্গম করলেন মহাপুরুষের প্রতিটি উচ্চারিত বাক্যের পিছনে রয়েছে যেন অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক প্রজ্ঞা। প্রতিটি বাক্য যেন মন্ত্র চৈতন্য দিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। তন্ত্র সাধনা ও তন্ত্র তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব সংশয় ভঞ্জন হলো স্যার জন উডরফের। বিদায়ের সময় শিবচন্দ্রও বিস্মিত হয়ে বললেন,—'সাহেব, আপনার ভেতরে জন্মান্তরের শুভ সংস্কার রয়েছে, নতুবা তন্ত্র সম্বন্ধে এরূপ শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা ত সম্ভব নয়।'

বিদ্যার্ণব কাশীধামে চলে গেলেন কিন্তু উডরফের মনোজগতে দীপ্যমান হয়ে রইলো সাধক শিবচন্দ্রের তপস্যাপূত মূর্তি ও তাঁর শাস্ত্রীয় ভাষণের স্মৃতি। দেহে মনে আত্মায় এক অভাবনীয় আকর্ষণও অনুভূত হতে লাগলো।

এ আকর্ষণকে অস্বীকাব করতে পারলেন না উডরফ্। আবার একদিন, এক শুভমুহূর্তে হরিদেব শাস্ত্রী সহ উডরফ যাত্রা করলেন কাশীধামের পথে। শিবচন্দ্র সান্নিধানে। শিবচন্দ্র তখন পাতালেশ্বরে অবস্থান করছেন। শিবচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হয়ে শুনলেন, তিনি মায়ের পূজায় বসেছেন, অপেক্ষা করতে হবে। ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষার পর, পূজা সমাপন হলে শিবচন্দ্র দর্শন দিলেন ভক্ত উডরফকে। রক্তগৈরিক পট্টবাস পরিহিত, ললাটে বৃহৎ সিঁদুরের ফোঁটা ও রক্তচন্দনের তিলক। মাথায় দীর্ঘ কেশের গুচ্ছ, কণ্ঠে বিলম্বিত রুদ্রাক্ষ আর আয়ত নয়ন দুটি শাণিত ছুরিকার মত ঝক্ ঝক্ করছে। তাম্রকুণ্ড হতে ভস্ম নিয়ে লেপন করে দিলেন উডরফের ললাটে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে উডরফের সর্বসত্তায় সঞ্চারিত হলো এক অলৌকিক শিহরণ। বিদ্যুতের তরঙ্গপ্রবাহ যেন। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থর থর করে কাঁপতে থাকে। বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়।

শিবচন্দ্রের ইঙ্গিতে হরিদেব শাস্ত্রী তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেন। এবং পাশের তক্তপোশে শুইয়ে দেন। তারপর সম্বিৎ ফিরে এলে তন্ত্রতত্ত্বের ও সাধনা সম্বন্ধে নানা আলোচনা শুরু হয়।

আলোচনা শেষে অভিভূত উডরফ শিবচন্দ্রকে বলেন, 'আমি আপনার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। শক্তি সাধনার আলো জ্বেলে আপনি আমায় পথ দেখিয়ে দিন এই আমার প্রার্থনা।' বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে যোগীরাজের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর উপলব্ধি করেন এই ঈশ্বরকল্প মহামানবের দৃষ্টির বাইরে কোন কিছুই নেই। আর মনে মনে ভাবেন যে জগতে পার্থিব যুক্তিতর্ক নির্ভর মস্তিষ্কের শক্তিটাই সব নয়। যে তত্ত্বশক্তির বলে সাধক এইরূপ মহাযোগৈশ্বর্যশালী শক্তিধর হয়ে থাকেন, এখন হতে সেই সাধনাতেই আত্ম-নিয়োগ করতে হবে।

সেদিন কাশীতে শিবচন্দ্রের গৃহে উডরফ যে দিব্য অনুভূতি লাভ করেছিলেন, সেই অনুভূতির পুণ্যময় স্মৃতিটি উত্তরকালে তাঁর অন্তরে চির-জাগরূক ছিল।

পরবর্তীকালে শিবচন্দ্র প্রসঙ্গে উডরফ বলেন, 'একদা জীবনে পথের সন্ধানে ব্যাকুলচিত্তে দিশাহারা হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরছিলাম এবং আকুলভাবে ভাবছিলাম কে আমায় প্রকৃত পথের সন্ধান দানে সমুন্নত সাধনার সোপান ধরিয়ে দেবে? যখন মর্মে অনুভব করছিলাম জীবন্ত গুরুর অভাব এবং কোথাও স্থির থাকতে পারি নাই, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে প্রথমে যিনি আমায় পথ দেখিয়েছিলেন, যাঁর পূত নির্মল সঙ্গস্পর্শে আমার চঞ্চল ব্যাকুল চিত্ত শান্ত হয়ে আত্মচৈতন্যের পথে গতিপ্রাপ্ত হয়ে জীবনকে ধন্য করেছিল, তিনিই ছিলেন পুরুষোত্তম দেবমানব শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। মদীয় গুরুদেব। তাঁর পবিত্র শ্রীচরণ সরোজে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি।'

উডরফ কাশী থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। ভিন্ন এক ভাব নিয়ে ভিন্ন এক মূর্তিতে।

অবশেষে এক শুভদিনে স্যার জন উডরফ ও পত্নী এ্যালেন উডরফ শিবচন্দ্রের নিকট থেকে তন্ত্রোক্ত বিধান ও পদ্ধতিতে শাক্তধর্মে কর্ণ দীক্ষা

গ্রহণ করলেন। শিবচন্দ্র শাক্তাভিষেক ক্রিয়াও সম্পন্ন করেছিলেন।* এই দীক্ষা প্রসঙ্গে 'গৌর ভাবিনী' সম্পাদক শ্রীরাধাবিনোদ বিদ্যাবিনোদ লিখছেন, 'জাষ্টিস উডরফ তদীয় সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রীর মুখে—শিবচন্দ্রই যে তদানীন্তন বাংলার তন্ত্রধর্মের একমাত্র ধারক ও বাহক সেকথা বুঝিতে পারিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।'

দীক্ষান্তে গুরু দক্ষিণা দেবার অভিপ্রায় জানালে, শিবচন্দ্র বললেন, 'যদি আমার প্রিয় বস্তু দ্বারা দক্ষিণান্ত করে আমাকে সন্তুষ্ট করবার বাসনা অন্তরে জন্মিয়া থাকে তবে আমার ইচ্ছা, বিশ্বে মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃনাম ব্যাখ্যা ও প্রচার করুন। এর অধিক কাম্য বস্তু আমার জীবনে আর কিছুই নাই। এই তারক মন্ত্র বিশ্বমানবের কল্যাণে ও মুক্তির জন্য প্রচারই আমার জীবনে একমাত্র প্রিয় ও কাম্যবস্তু।'

নবীন শিষ্য উডরফ বিস্ময়ে হতবাক হলেন কোনরূপ পার্থিব গুরু-দক্ষিণা না চাওয়ার জন্য। শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন যেন গুরুর ঈপ্সিত কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হন।

আবার একদিন। উডরফ গুরু শিবচন্দ্রের জীবনী লিখবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। শোনামাত্রই বাধা দিয়ে বললেন শিবচন্দ্র। 'সাহেব আমি এতদিন ধরে শুধু মায়ের জীবনীই সন্ধান করে ফিরছি, আর তুমি সেই

মহামায়ার জীবনী বাদ দিয়ে আমার জীবনী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ ? কোনও প্রয়োজন নেই। মায়ের জীবনী নিয়েই মত্ত থাক।'

এই ঘটনার পর থেকে উডরফ শিবচন্দ্র রচিত 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থই 'প্রিন্সিপল্স অব তন্ত্র' নামে প্রকাশিত হয়। তারপর একের পর এক তন্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন। শিবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর হতেই তাঁর তন্ত্রাভিলাষী মানসভূমি হয়ে উঠল উর্বর। শিবচন্দ্রের সযত্ন শিক্ষায় তাঁর প্রসুপ্ত মন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। একদিকে চললো সাধনা, অপর দিকে লেখনী। লিখে ফেললেন, 'শক্তি অ্যাণ্ড শাক্ত', 'সারপেণ্ট অব পাওয়ার', 'ক্রিয়েশন অ্যাজ এক্সপ্লেইনড ইন দ্য তন্ত্র' ; 'মহামায়া দ্য ওয়ার্লড অ্যাজ পাওয়ার কনশাস্‌নেস্' ; 'ইনট্রোডাকশান টু তন্ত্রশাস্ত্র', 'কুলকুণ্ডলিনী নিগম', প্রভৃতি আরও অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ। মাতৃ-তন্ত্রাশ্রিত হয়ে ধর্মীয় তত্ত্ব সাধনায় আত্মনিয়োগ করে গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্ত্য দেশে তন্ত্র সম্বন্ধে উদ্ভট ধারণা যে অজ্ঞতা প্রসূত তা প্রমাণ করলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ়রহস্য ও সত্যতা প্রচারের গৌরব লাভ করলেন। এই প্রসঙ্গে লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেছিলেন, 'ইউরোপীয়দের মধ্যে উডরফ তন্ত্র সম্বন্ধে সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। কেবল তাই নয়, স্যার উইলিয়ম জোন্স যেমন অবজ্ঞাত সংস্কৃত সাহিত্যের স্বরূপ দেখিয়ে তাকে সমগ্র সভ্যজগতে সম্পূজিত করেছিলেন, স্যার জন উডরফ তেমনি ঘৃণিত তান্ত্রিক ধর্মের উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিয়ে তাতে নিহিত ভারতীয় প্রতিভাস্ফূর্তি দেখিয়েছেন।'*

সত্য সত্যই উডরফ তন্ত্র শাস্ত্রের চর্চায় যে অবদান রেখে গেছেন তা কেবল এ দেশেরই মানস মুক্তির জন্য নয়, সকল দেশের জন্যই। উডরফকে বাদ দিলে বিংশ শতকের প্রারম্ভে তন্ত্র ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত কল্পনা করা যায় না। তাঁর অসীম পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মনীষাদীপ্ত গ্রন্থগুলির দ্বারাই পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তন্ত্রের প্রসার ঘটে। এবং বিদ্বম্মণ্ডল তন্ত্র ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর এর মূল প্রেরণা হলেন গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

গুরুর মনোগত ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার জন্যই উডরফের চলে সাধনা। সুযোগ পেলেই উডরফ সমাদরের সঙ্গে গুরুদেবকে স্বগৃহে আনয়ন করেন আর গ্রহণ করেন নূতন নূতন নিগূঢ় ক্রিয়ার উপদেশ। আবার কখনো নিজেই কুমারখালি গ্রামে অথবা কাশীধামে শিবচন্দ্রের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। গুরুর সন্নিধানে থাকার সময় পরিধান করেন রক্তবর্ণ ক্ষৌম বসন, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা আর কেশের শিখায় দোলে একগুচ্ছ রক্তজবা। তখন তন্ত্রধারক পণ্ডিত ও অন্যান্য শিষ্যবৃন্দ এই বিদেশী কৌল সাধকের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন।

আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল ও শিল্পশাস্ত্রী আনন্দ কুমারস্বামীর শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেই উডরফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আর উডরফের সাহায্যেই এঁরা উভয়ে পরিচিত হন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গে।

তন্ত্রতত্ত্বের আলোকে শিবচন্দ্র ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব, চারুকলা ও ভাস্কর্যের অপরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন উভয়েরই কাছে। এইসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনে হ্যাভেলের বহু সংশয়ের নিরাকরণ হয়। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মর্মকথা উপলব্ধি করে অভিভূত হন। শোনা যায় এ সময়ে হ্যাভেল তান্ত্রিক ঐতিহ্য যুক্ত কোনো কোনো দেবদেবীর ভাস্কর্যমূর্তি দর্শন করে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। হ্যাভেল সরলভাবে বন্ধু মহলে বলতেন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রের প্রসাদেই ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিগূঢ় রহস্য তাঁর দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

হিন্দুদর্শন ও ধর্মের প্রতি কুমারস্বামীর যে সুগভীর আসক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁর শিল্প সমালোচনাকে প্রভাবিত করেছিল তার পিছনে ছিল শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রভাব।

গুরু শিবচন্দ্র সম্বন্ধে উডরফ পরবর্তীকালে বলেছেন, 'আমার মতো লোকের প্রতি গুরুদেবের ছিল অহেতুক কৃপা, তাঁর জীবিতকালে এবং তাঁর তিরোধানের পরে কত করুণালীলা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর যোগ-বিভূতির মাধ্যমে পেয়েছি কত গভীর স্নেহের স্পর্শ! কলকাতায় থাকতে যেমন তাঁর দর্শন ও সাহায্য পেয়েছি, তেমনি লণ্ডনে এসেও তা পেয়ে ধন্য হচ্ছি।'

'একদিন কলকাতা হাইকোর্ট বেঞ্চে একটি গুরুতর এবং জটিল মামলা চলছে। আইনের বহু কূট তর্ক উঠেছে এবং বহু চেষ্টাতেও কোনো স্থির

সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে পারছি না। দেহ-মন ক্লান্তিতে নৈরাশ্যে মুহ্যমান, অসাড় হয়ে পড়েছে। এমন সময় দেখতে পেলাম বিদেহী গুরু মহারাজের আবির্ভাব। তাঁর আত্মিক স্পর্শে সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধি সতেজ ও স্বচ্ছ হয়ে উঠল, মামলাটি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পড়লাম অচিরে।'*

'কলকাতায় ও লণ্ডনে বার বার তাঁর বিদেহী আত্মার স্নেহস্পর্শ পেয়েছি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে। যখন যে সব দুশ্চিন্তা ও সংকটে মুষড়ে পড়তাম, তখনি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেতাম তাঁর কাছ থেকে। কর্তব্য ও কর্মপন্থা সেই মুহূর্তে সহজ সরল হয়ে উঠতো।'

দিন, সপ্তাহ, মাস, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়। অকস্মাৎ একদিন শিবচন্দ্রের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে নিজ গ্রাম কুমারখালির জন্য। দীর্ঘদিন কাশীবাস করে অবশেষে একদিন ফিরে এলেন স্বগ্রাম কুমারখালিতে। স্থায়ী ভাবেই বসবাস করতে লাগলেন।

বিদ্যার্ণবের সংসার ভোগের ছিল না, ছিল ত্যাগের। তাঁর নিজের বলে কিছুই ছিল না। যা কিছু সবই ছিল মা সর্বমঙ্গলার। তাই মায়ের বাড়ীর যত কিছু সকলই তাঁর সেবায় অম্লান বদনে ত্যাগ করতেন। আর বাড়ীর সকলেরই ধারণা ছিল, মায়ের পূজা অর্চনা উৎসব ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারলেই অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা কামনা সমস্তই পূর্ণ হবে। সহধর্মিণীও ছিলেন ঠিক যেন মা অন্নপূর্ণা। দিনে রাত্রে সময়ে অসময়ে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারদ্বার সর্বদাই ছিল আগন্তুক ও ভক্তকুলের জন্য অবারিত। সব দিক দিয়ে সুসংযম রক্ষা করেই পরিচালিত হতো সংসারটি। কেউ যদি কোনদিন শিবচন্দ্রকে সঞ্চয়ের কথা বলতেন, প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে বলতেন, 'কাল যদি কিছু নাই জুটে কলমীর শাকের ঝোল দিয়েই মাকে ভোগ দেবো।'

ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার পূজা ও ধ্যানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় শিবচন্দ্রের। এক একদিন সারারাত্রিই কেটে যায় ভাবাবেশে। মাতৃসাধক রূপান্তরিত হন মায়েরই এক শিশু সন্তানরূপে। অনেক সময় আবার মায়ের সঙ্গে কথা বলেন, আদর আবদারও করেন। মাতৃদর্শনের দিব্য সুধা শুধু পান

* 'তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব'—শ্রীবসন্তকুমার পাল।

করা নয় পরমানন্দে বিলিয়ে দেন প্রিয় ভক্ত শিষ্যবর্গের মধ্যেও। তাইতো কৃপালু গুরুদেবকে ভক্তরা অভিহিত করতেন 'সদাশিব' নামে।

আবার একদিন, অকস্মাৎ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শিবচন্দ্রের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়লো প্রিয় ভক্ত নেপালচন্দ্র সাহা। মরণাপন্ন ভাইপো নীরদ। তাকে বাঁচিয়ে দিতেই হবে। ছোটভাই মৃত্যুর সময় হাতে ধরে এই ছেলেটিকে ওর হাতে সঁপে দিয়েছিল যে। প্রাণাপেক্ষা অধিক ছেলেটিকে বাঁচাতে না পারলে সে আত্মঘাতী হবে। শহরের খ্যাতনামা ডাক্তাররাও চিকিৎসা করে নিরাময় করতে পারেন নি। অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তাই ভক্ত নেপাল সাহা'র এই কান্নাকাটি। এ বিশ্বাস আছে যে, গুরুদেব সদাশিব শিবচন্দ্রের ইচ্ছায় সবই সম্ভব।

ভক্তের বেদনায় শিবচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হলো। বল্লেন, 'তান্ত্রিকমতে অভিচার হতে পারে কিন্তু তার ফলে সাধকের প্রাণ থাকবে না।' তবুও কান্না থামলো না ভক্তের। তখন নিরুপায় শিবচন্দ্র অভিচার ক্রিয়ায় রত হলেন। শুরু করলেন—আত্মাহুতি যজ্ঞ ক্রিয়া। শিশুটি ধীরে ধীরে বেঁচে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন শিবচন্দ্রের পায়ে ফুটলো বেলের কাঁটা আর সেই কণ্টকই নিয়ে এলো লোকান্তরের ডাক। চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার সবকিছুকে ব্যর্থ করে শিবচন্দ্র সেই ডাকে সাড়া দিলেন। ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে। বাংলা ১৩২০ সালের ১১ই চৈত্র। মা সর্বমঙ্গলার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উচ্ছ্বসিত স্বরে ডেকে ওঠেন কালী কালী তারা তারা। নয়ন দুটি ধীরে ধীরে নিমীলিত হয়ে এলো চিরদিনের জন্য। বাংলার কৌল সাধনার আকাশ হতে স্খলিত হলো একটি উজ্জ্বল তারকা। সমস্ত কুমারখালি গ্রামেই নেমে এলো শোকের কৃষ্ণছায়া। তখনও যেন সাধক শিবচন্দ্রের কণ্ঠ হতে ভেসে আসে অন্তর-উৎসারিত মাতৃসঙ্গীত—

কুলের মাঝে কুলের মা যে
কুলকুণ্ডলিনী সাজে
সে কুলের কাণ্ডারীর হাতে
ঐ যে কুলের বাঁশী বাজে ॥

সাধক শ্যামাকান্ত

নৈমিষারণ্য! নৈমিষারণ্যের সাধনভূমি। মহা মহা ঋষি যোগী তপস্বীদের চরণপূত মহান তীর্থভূমির এক বৃক্ষনিম্নে ধ্যানমগ্ন নবীন তাপস। তাঁর দিব্য-জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মহাসিদ্ধির শুভ সূচনা। অটল ধৈর্য নিরলস সংগ্রাম ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠার মধ্যদিয়ে চলে সুকঠোর তপশ্চর্যা। ধীরে ধীরে তন্নমালা হয়ে ওঠে নামমালা। অহংবোধ অন্তর্হিত হয়ে বুদ্ধি হয় স্থির। একটা অব্যক্ত সত্য চৈতন্যবোধ ফুটে ওঠে দেহে, মনে, আত্মায়। সত্যানু-সন্ধানী তপস্বী সত্যকে লাভ করে স্থিতধী হন। সোঽহং অবস্থা। সঃ (সো) অর্থ সে, আমি। অহং অর্থ অর্থাৎ আমার মধ্যে তারই প্রকাশ—সে ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁরই সুপ্রকাশ হয় হৃদয়ে। আত্মানুভূতির শুভ্র আলোকছটায় তখন তাঁর মানবরূপ জ্যোতির্ময় দেবমূর্তিতে হোল রূপান্তরিত। গুরু তিব্বতীবাবা সন্ন্যাসীর দীক্ষা দিয়ে নামকরণ করেছিলেন সোঽহং স্বামী। মল্লবীর শ্যামাকান্ত সত্য সত্যই আত্মপ্রকাশ করলেন সন্নাসী সোঽহং স্বামী রূপে। ব্রহ্মানুভূতির আনন্দে বিভোর হয়ে মুমুক্ষু মানুষের প্রতি কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে রইলেন না। হিমালয়ের নির্জনতায় বসে সাধনার অমর ইতিবৃত্ত প্রকাশ করলেন সোঽহংতত্ত্ব, সোঽহং-সংহিতা, সোঽহং গীতা, বিবেক-গাথা প্রভৃতি গ্রন্থরাজির মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ জানলো চিনলো বাংলার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ব্যাঘ্রবশকারী শ্যামাকান্তকে সাধক শ্যামাকান্ত রূপে। ত্যাগী সন্ন্যাসিপ্রবর সোঽহং স্বামী রূপে।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার দীপ্তি ও ইন্দ্রজালে বাঙ্গালী তরুণ সম্প্রদায় আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হওয়ায় আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসও ফেলেছিল হারিয়ে। জাতির কপোলদেশে ফুটে উঠেছিল পরাধীনতার দুর্মোচনীয় জঘন্য কালিমা। বীর বিজেতার বাহ্যতঃ উৎকৃষ্টতর সভ্যতার সম্মুখে সে দাঁড়িয়েছিল হতবুদ্ধি হয়ে। প্রাণশক্তিহীন, অনুকরণপ্রিয়, কৃত্রিম, বিস্মৃতিশীল সেই তরুণ সম্প্রদায়ের সম্মুখে, বিপুল দৈহিকবল, প্রাণবল আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্যামাকান্ত।

দুর্বলদেহ ভীরু নামে পরিচিত বাঙ্গালীর জীবনে শ্যামাকান্তের অসীম বীরত্ব সেদিনের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে এনে দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস। বাংলার নব-জাগরণের মহাসমুদ্রে যে বিভিন্ন সাধনাধারা এসে মিলিত হয়েছিল শ্যামাকান্ত ছিলেন তারই একটি ধারার প্রতীক।

একদিকে দৈহিক বল বৃদ্ধির জন্য শরীরচর্চা অপরদিকে অন্তর্মুখীন দিব্য-জীবন লাভের সাধনা। এই দুই ধারার মধ্য দিয়ে তাঁর নিরলস সাধনা চলেছিল সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত। ফলে মহাসিদ্ধির সিংহদ্বার ধীরে ধীরে তাঁর সম্মুখে হয়ে যায় উন্মুক্ত। অন্তরের দিব্যশক্তি মিলিত হয়েছিল দৈহিক শক্তির সঙ্গে। তাইতো সবকিছু বিচ্যুতি বিভ্রান্তি জয় করে আশ্চর্য নৈতিক শক্তি লাভ করে শ্যামাকান্ত হয়ে উঠেছিলেন নির্ভয়।

এই প্রসঙ্গে শ্যামাকান্তের নিজেরই স্বীকারোক্তি, "আমার বিশ্বাস যে সিংহ ও বাঘের মত ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু পশুকে বশ করার যে ক্ষমতা তা ভগবানের দান। প্রত্যেকের এ ক্ষমতা নেই। যার এ ক্ষমতা নেই, সে যতই প্রাণপণ চেষ্টা করুক না কেন, কখনও তা আয়ত্ত করতে পারবে না। তাহলেও আমার এই ক্ষমতার পেছনে একটি গোপন শক্তি আছে। সেটি হচ্ছে —'নির্ভয়'। আপনারা যাকে ভয় বলেন তা আমি জীবনে কখনও অনুভব করিনি। এমন কি প্রথম যেদিন আমি বাঘের খাঁচায় ঢুকলাম, সেদিনও মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের কম্পন অনুভব করিনি। একমাত্র এই ধরনের নির্ভীকতাই বন্য হিংস্র জন্তুকে বশ মানাবার ক্ষমতা দিতে পারে। যদি বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ভয় পেয়েছেন এক মুহূর্তের জন্য এমন চিহ্ন দেখান, তক্ষুনি সে আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাঘের সঙ্গে যখনই মোলাকাত করেছি, কখনও ভয়কে আমি মনে ঢুকতে দিইনি। কারণ নির্ভয়ই যে ছিল আমার গোপন শক্তি।"

ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামাকান্ত জন্মগ্রহণ করেন বাংলার মাটিতে। ঢাকা জেলার আড়িয়ল গ্রামে। পিতা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ধর্মপ্রাণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, আর মাতৃদেবীও ছিলেন মধুর স্বভাবের ধর্মপ্রাণা মহিলা।

শশিভূষণের কর্মস্থল ছিল ত্রিপুরার মুরাদনগর। আদালতে সেরেস্তাদার

ছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক ফকিরের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু আচারেই পুজা উপাসনা করতে স্নুরু করেন। ফকিরসাহেব কিন্তু তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করতে বলেন নি। তাঁর নির্দেশে তাঁরই প্রদত্ত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাধনা করতেন শশিভূষণ। তুবেলা দরজা বন্ধ করে। নির্জন ঘরে বসে। তারই ফলশ্রুতি ধর্মজীবনের পরিবর্তন। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এই ফকির বাস করতেন মুরাদনগরে। একটি বৃক্ষনিম্নে। গ্রামের লোকের বিশ্বাস ছিল ফকির বাবা বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ। ভক্তিভরে লোকে যা ফলমূল দিয়ে যেত, তাই খেয়ে দেহধারণ করতেন। আবার কখনও কিছুই গ্রহণ করতেন না। দিনের পর দিন, সপ্তাহ, মাস থাকতেন অনাহারে। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতে চাইতেন না। নিতান্ত বিরক্ত করলে কিছুটা মাটি রোগীর হাতে তুলে দিয়ে বলতেন, 'ওতেই ভাল হয়ে যাবি। আর বিরক্ত করতে আসবি না।' রোগীও ফকির-প্রদত্ত মাটিকে মহৌষধ মনে করে তৃপ্ত মনে গৃহে ফিরে যেত, আর সত্য-সত্যই হয়ে যেত রোগমুক্ত। সাধন পথের কোন গণ্ডি স্বীকার করতেন না ফকির বাবা। মন্দির ও মসজিদের ভেদ মানতেন না। তাই কেউ বলতো পাগল, কেউ বলতো উদ্‌ভ্রান্ত। কোথা থেকে কবে কিভাবে এসেছিলেন ফকির বাবা মুরাদনগরে কেউ জানে না। বলতে পারে না। একবার এক মুসলমান ভক্ত অনেক অনুনয় করে তাঁকে নিজের বাড়ীতে রহিমপুর গ্রামে নিয়ে যান। জীবনের শেষভাগ সেখানেই অতিবাহিত করেন। ফকির বাবার অলৌকিক শক্তি ও সাধনার যশঃসৌরভ সমস্ত ত্রিপুরা ও কুমিল্লায় ছড়িয়ে পড়েছিল। রোগী, শোকসন্তপ্ত ও মুমুক্ষু মানুষ সর্বদাই তাঁর কাছে ভিড় করতো। একদিন শশিভূষণও অকস্মাৎ কিসের আকর্ষণে যেন এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এই ফকির বাবার পদতলে। আর কৃপালাভ করে হয়েছিলেন ধন্য। এই ফকির বাবাই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করবে। এবং তা একদিন সত্যে পরিণত হয়েছিল।

এই মুরাদনগরের বিত্যালয়েই শ্যামাকান্তের বাল্যের প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। তারপরেই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। বাল্যকাল থেকেই শ্যামাকান্ত ছিলেন সুস্থদেহী ও সাহসী। এই কলেজিয়েট

স্কুলেই পরেশনাথ ঘোষের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। উভয়ের জীবনাদর্শ একই ধারায় চলে প্রবাহিত হয়ে। তাই তো পরবর্তীকালেও এই মধুর সম্পর্কের জীবনে ছেদ পড়েনি কোনদিন।

উভয়েই সে সময়ের মল্লগুরু অধরচন্দ্র ঘোষের আখড়ায় প্রবেশ করেন এবং মাত্র চার-পাঁচ বছরের সাধনায় ওঁদের শরীর হয়ে ওঠে সুগঠিত। নবীন বনস্পতির মত সুন্দর ও তেজোদ্দীপ্ত দুই তরুণের দেহের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হন ঢাকার মানুষ। তাতে প্রেরণা লাভ করেন যুবাবৃন্দ।

শ্যামাকান্তের কৈশোরের স্বপ্ন ছিল সৈনিকরূপে নিজের শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া! তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যই—একবার দুই বন্ধুতে মিলে সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে পালিয়ে যান বাড়ী থেকে। অবশ্য হতাশ হয়েই ফিরে আসতে হয়েছিল। কারণ, সে যুগে বৃটিশ শাসকরা বাঙ্গালী ছেলেদের রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। সহজে তাদের সৈন্যদলে ভর্তি করা হোত না।

ঢাকার কুট্টিরা ছিল ঝগড়া-মারামারির জন্য প্রসিদ্ধ। নিরীহ জনসাধারণেয় উপর সুযোগ পেলেই অত্যাচার করতো। এমন কি, মেয়েদের নিয়ে পথে বের হওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। একবার কয়েকজন ভদ্র নাগরিক কুট্টিদের দ্বারা অপমানিত হয়ে নালিশ জানালেন শ্যামাকান্তের নিকট। শ্যামাকান্ত বন্ধু পরেশনাথকে নিয়ে ছুটলেন ঘটনাস্থলে। সব কিছু দেখে তিনি বুঝলেন দোষ কুট্টিদের। আর দেরি করেননি, প্রচণ্ড মার দিতে শুরু করলেন তাদের। অলি-গলিতে ঢুকে তাদের পেছু নিলেন। দুই বন্ধুর মারের চোট সামলাতে না পেরে তারা ক্ষমা ভিক্ষা করলো এবং প্রতিজ্ঞা করলো আর কখনও তারা ভদ্র নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করবে না। মেয়েদেরও সম্মান রক্ষা করে চলবে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্যামাকান্ত ঢাকার মধ্যবিত্ত ভদ্র নাগরিকদের হৃদয় জয় করেন।

একবার ট্রেনের একই কামরায় বসেছিলেন শ্যামাকান্ত ও বরদাকান্ত। বরদাকান্ত শ্যামাকান্তের বাল্যবন্ধু। ছাত্র-জীবনের সহপাঠী। একই সঙ্গে শরীরচর্চা করতেন। অনেকদিন পর সাক্ষাৎ হওয়ায় নানা গল্পে মশগুল হয়ে রইলেন উভয়ে। সেই কামরাতে উঠলেন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক

তাঁর সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। কামরাটি ছোট। যাত্রীও ছিল মাত্র পাঁচ-ছয় জন। সকলেই নিরুপদ্রবে শান্তিতে বসে আছেন। ট্রেন চলেছে দ্রুতগতিতে। ধীরে ধীরে নেমে এলো রাত্রির অন্ধকার। হঠাৎ একটি স্টেশন থেকে দুইজন মদ্যপায়ী শ্বেতাঙ্গ সৈনিক এসে উঠলো সেই কামরাতে। তাদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়লো সেই বধূটির উপর। অভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য তারা বসে পড়লো বধূটির পাশেই। ভীত সন্ত্রস্ত বধূটি আরও জড়সড় হয়ে বসলো। স্বামীটি তখন অনুরোধ করলেন সৈনিক দুটিকে একটু সরে বসবার জন্য। প্রত্যুত্তরে অভদ্রোচিত গালাগালি দিয়ে তারা আরও চাপতে লাগলো বধূটিকে। বধূটি এবারে ভয়ে লজ্জায় উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ একজন গোরা সৈনিক বধূটির হাত ধরে টেনে নিয়ে নিজেদের দু'জনের মাঝখানে বসালো। বধূটি সমস্ত মুখ ঘোমটায় ঢেকে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। স্বামীটি মৃতবৎ বসে রইলেন। অন্যান্য যাত্রীরাও স্থাণুর মত চুপ করে বসে আছে।······* 'বধূটির অদৃষ্টে লাঞ্ছনার সর্বশেষ পরিণতি বুঝি অতি সন্নিকট! মদ্যপায়ী পশু দুইটির লালসা-দৃষ্টি নম্র, শান্ত, সুন্দরী বাঙ্গালী বধূটিকে যেন ঝলসাইয়া দিতে লাগিল। স্বামীর বাধাদান শুধু পশু দুইটির পদধারণ ও আবেদন-নিবেদনেই শেষ হইল!

একটি পশু বধূটির মুখাবরণ খুলিয়া দিল। বধূটির রক্তশূন্য সাদা মুখের উপর অসহায় দুটি চোখের সেকি কাতর দৃষ্টি! অন্য পশুটি উল্লাসে বধূটির গায়ে হাত দিতে উদ্যত হইল। বাস্, এই পর্যন্ত!

শ্যামাকান্ত ও বরদাকান্ত এতক্ষণ শুধু অবস্থার অগ্রগমনটুকু লক্ষ্য করিতেছিলেন। এবার দুজনের চোখে চোখে কি ইশারা হইয়া গেল। সাহেবের অত উল্লাসপূর্ণ হাতখানি সতীর অঙ্গে কালিমা লেপনের সুযোগ আর পাইল না। মুহূর্তে বরদাকান্তের হাতের বজ্র স্পর্শ পাইয়া সে আরও উল্লাসেই বোধ হয় পাটাতনের উপর গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। শ্যামাকান্তের বাঘের থাবা পড়িল দ্বিতীয় সাহেবের উপর। তারপর মুহূর্ত মধ্যে দুই ঘৃণ্য কুকুর দুই বাঘের পায়ের তলায় চাপা পড়িল।' পরবর্তী স্টেশন না

* 'ঠাকুর শ্রীশ্রীবরদাকান্ত' (পৃঃ ৩৮)—লেখক শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসা পর্যন্ত পাটাতনের উপর মুখ গুঁজিয়া বরদাকান্ত ও শ্যামাকান্তের পায়ের তলায় চাপা থাকিয়া কাঁইকুঁই করিতে লাগিল। পরবর্তী স্টেশনে গাড়ী থামিলে দুই ভীম পদাঘাতে ট্রেন হইতে প্লাটফর্মে পড়িয়া তাহারা অন্তর্হিত হইল।' বরদাকান্ত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্ত, ভবিষ্যতের ঠাকুর শ্রীশ্রীবরদাকান্ত এবং শ্যামাকান্ত ভবিষ্যতের সোঽহং স্বামীর পুণ্য পাদস্পর্শে পশু দুইটির কাম-প্রবৃত্তি হয়তো ভবিষ্যতে বক্রপথে বিচরণ হতে বিরত হয়েছিল।

অবশেষে বধূটির স্বামী কৃতজ্ঞতায় শ্যামাকান্ত ও বরদাকান্তের পা জড়িয়ে ধরলেন। প্রত্যুত্তরে শ্যামাকান্ত বললেন,—

'পা ধরতে ধরতেই জীবন কাটবে, অথচ সুফল পাওয়া যাবে না! আবেদন-নিবেদনে মানুষের সহানুভূতি পাওয়া যায় কিন্তু পশুর মন তাতে পরিবর্তন করা যায় না। এরা মহানুভবতা জানে না। জানে শুধু পাশবিক শক্তির মর্যাদা। যেমন দেবতা তাকে তেমন নৈবেদ্য না দিলে যোগ্যতা রক্ষা হবে কেমন করে?'

এই ধরণের ছোট-খাট বহু ঘটনার সঙ্গে শ্যামাকান্ত জড়িত ছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই অত্যাচারীর সঙ্গে যেমন তিনি কখনও আপোষ করেননি, তেমনি অসহায়ের প্রতি দুঃখে অন্তর তাঁর বিগলিত হতো, বিচলিত হয়ে পড়তো। বিপুল দৈহিক শক্তির অধিকারী শ্যামাকান্তের মনের কঠিনতার সঙ্গে মিশ্রণ হয়েছিল কোমলতার। অন্যায়—তা ধর্মক্ষেত্রেই হোক আর কর্মক্ষেত্রেই হোক কোনদিন সহ্য করেননি। অন্যায়ের প্রতিকারে তিনি ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর।

ধীরে ধীরে শ্যামাকান্ত দেশীয় ও পাশ্চাত্য নানা ব্যায়াম-পদ্ধতিতে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ডন কুস্তির মধ্য দিয়ে তৈরী হলেও শেষের দিকে ক্রমশঃ জিমনাষ্টিক্‌সের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন এবং সেইদিকেই তিনি নিজেকে বেশি সমৃদ্ধ করে তুললেন। বিশ্ববিখ্যাত মল্লবীর স্যাণ্ডোর সঙ্গী এলমো নামে একজন মুষ্টিযোদ্ধা শ্যামাকান্তকে চ্যালেঞ্জ জানান। শ্যামাকান্তও নির্ভয়ে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। শ্যামাকান্তের ভীষণ মুষ্টির আঘাতে এলমো অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য

হলেন। শ্যামাকান্তের সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার যশঃসৌরভ ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে, সমগ্র ভারতবর্ষে।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অল্প বয়সেই শ্যামাকান্তের বিবাহ হয়েছিল। স্ত্রীর নাম কাদম্বিনী দেবী। ঢাকা জেলারই দ্বিপাড়া নিবাসী কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। ধর্মপ্রাণা ও ভক্তিমতী রমণী। স্বামীর রুচি, ভালোমন্দ বোধের সঙ্গে তিনি নিজেকে এমনভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন যেন পতি ছাড়া তাঁর নিজস্ব কোন সত্তাই ছিল না। ভাই-বোনদের মধ্যে শ্যামাকান্তই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তাই সংসারের দায়িত্ব অল্প বয়স থেকে বালিকা বধূকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল।

শ্যামাকান্তের জননী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রেখে অকস্মাৎ ইহলীলা সম্বরণ করলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শশিভূষণ আড়িয়ল গ্রাম ত্যাগ করে পুত্রবধূ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে এলেন কর্মস্থলে, মুরাদনগর, কুমিল্লাতে। আবার একদিন কর্মজীবন থেকেও নিলেন অবসর। চলে এলেন ঢাকা শহরে। এখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। শ্যামাকান্ত তখন বরিশালে ছোটখাট একটি সার্কাস পার্টি গড়ে তুলেছেন। ভগ্নীপতি মধুসূদন, ভজুয়া, তিনকড়ি এবং আরও চার পাঁচটি স্বাস্থ্যবান ছেলে নিয়ে তাঁর এই সার্কাসদল। ছোট্ট একটি সখের সার্কাসদল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ করেননি শ্যামাকান্ত। কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা ছিল তাঁর অসীম। অবসর সময়ে নানা গ্রন্থ পাঠ করতেন। ধর্মগ্রন্থের উপর অনুরাগ ছিল গভীর। কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি পার্বত্য ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পার্শ্বচর নিযুক্ত হয়েছিলেন। দু'বছর পর এই কাজ ছেড়ে দিয়ে বরিশালের গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ড্রিল ও ব্যায়ামের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

শ্যামাকান্তের সেজ ভাই সূর্যকান্ত তখন ঢাকায় ওকালতী করেন। শ্যামাকান্তরা ছিলেন চার ভাই তিন বোন। মেজ ভাই নিশিকান্ত জীবনে উন্নতি করতে পারেন নি। ছোট ভাই শীতলকান্ত বি. এ. পাশ করে কলকাতাতেই কাজকর্ম নিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

বোনেদের মধ্যে বড় বোন সরলাদেবী ছিলেন বালবিধবা। স্বামীর

মৃত্যুর পর পিত্রালয়েই আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেবা ব্রতকেই তিনি জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসিনী 'স্বয়ং-ভাতি' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মেজ বোন সুশীলাদেবীর বিবাহ হয় ফরিদপুর জেলার নড়িয়া গ্রামে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়েব সঙ্গে। এই মধুসূদনই যোগদান করেছিলেন শ্যামাকান্তের সার্কাস দলে। আর ছোট বোন সুনীতি দেবীর বিবাহ হয় ফরিদপুর জেলার ঝিঝরি গ্রামে, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁরা বসবাস করতেন কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাকান্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে সার্কাসদল গঠন করেন। শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জে একটি চিতাবাঘ কিনে তাকে কয়েকদিন শিক্ষা দিয়ে ওখানেই একদিন প্রকাশ্যে বাঘের খেলা দেখান। তখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে এ ধরণের জন্তু নিয়ে যুদ্ধ প্রচলিত ছিল না। শ্যামাকান্ত আরও লোকজন ও জন্তুজানোয়ার সংগ্রহ করে গঠন করলেন "দি গ্রেট ওরিয়েন্ট্যাল সার্কাস"। এই সার্কাস পার্টির মাধ্যমে শ্যামাকান্তের সাহসিকতার খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লো। শ্যামাকান্ত শুধু বাংলার মানুষ নয়, সমস্ত ভারতবাসীর কাছেই এক বিস্ময় হয়ে উঠলেন।

শ্যামাকান্তের প্রধান খেলা ছিল বাঘের সঙ্গে লড়াই এবং বুকের উপর এগারো মণ পাথর তুলে কয়েকজন বলশালী লোকের সাহায্যে তা ভাঙ্গা।

সার্কাস পার্টি নিয়ে তিনি নগরে নগরে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। বর্ষার সময় দলবল নিয়ে চলে আসতেন ঢাকায়। খেলা দেখাতেন ঢাকাতেই। শুরু হোত তাঁর পারিবারিক জীবন। পিতৃদেব ও অকৃতদার সেজভাই সূর্যকান্ত তাঁর পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

শ্যামাকান্তের বাঘের খেলায় খুশি হয়ে অনেকে তাঁকে নূতন নূতন এবং বড় বড় বাঘ উপহারও দিয়েছিলেন। এসব বাঘের মধ্যে ভাওয়ালের রাজা বাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর 'রাজা' ও 'গোপাল' এবং পাটনার নবাব বাহাদুরের 'বেগম' ছিল প্রসিদ্ধ।

শ্যামাকান্তের সাহসিকতা সম্বন্ধে বলছেন পাটনার নবাব সৈয়দ ইব্রাহিম আলী খাঁ। ঘটনাটি ১৮৯৪ সালের।* 'প্রফেসর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

'*অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮৯৪ স্যালের ২৯শে এপ্রিল।

পাটনাতে যখন তার সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছিলেন, তখন আমি সে খেলা দেখতে যাই। অন্য খেলাগুলিও চমৎকার। কিন্তু বিশেষ একটি খেলা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। তিনি একটি বাঘের সঙ্গে কুস্তি লড়েন, তার পিঠে চড়ে বেড়ান এবং তাকে নিয়ে এমনভাবে খেলান যে মনে হয় বাঘটি গৃহপালিত নিরীহ একটি পশু। কিন্তু আমার সন্দেহ হলো যে, প্রফেসর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের বাঘ ছাড়া অন্য বাঘের সঙ্গে ঠিক এমনিভাবে খেলতে পারবেন কিনা। তাই আমি তাঁকে বললাম যে, তাঁর যদি সাধ্য থাকে তাহলে তিনি যেন আমার নিজের একটি অত্যন্ত হিংস্র পোষ না মানা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচায় ঢুকে তার সঙ্গে খেলা দেখান। তিনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং একটি সর্ত করে নিলেন যে, তিনি যদি সফল হন তাহলে আমি তাঁকে বাঘটি উপহার দেব।

তারপর বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শকের সম্মুখে তিনি যখন ঐ অসম-সাহসিক কাজ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন আমি তাঁকে বাধা দিলাম। কারণ এতে তাঁর জীবন চরম ভাবে বিপন্ন হবে বলে আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম। আমি তাঁকে আরও বললাম যে খাঁচায় ঢুকতে প্রস্তুত হয়ে তিনি যে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তারই পুরস্কার স্বরূপ আমি তাঁকে বাঘটি দিয়ে দেব। কিন্তু আমার সমস্ত বাধা ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দর্শকদের তৃপ্তিবিধানের জন্য ঐ হিংস্র বন্য বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করলেন এবং বিপুল উচ্ছ্বাস ও প্রশংসাধ্বনির মধ্যে বাঘটিকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে আনলেন। তাঁর এই কীর্তিতে আমি এমন মুগ্ধ হলাম যে আমি কেবল ঐ বাঘটিই নয়, তার সঙ্গে দুটি ঘোড়াও তাঁকে দিলাম এবং তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে তাঁর মহান আদর্শকে রূপ দেবার কাজে আমার শক্তি অনুযায়ী আমি সাহায্য করবো।'

*বাঘের সঙ্গে ত আপনি বহুবার সংগ্রাম করেছেন, কখনও কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছেন?

একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন শ্যামাকান্ত।

—'হ্যাঁ বিপদে পড়েছি বইকি! বাঘের স্বভাবই উগ্র। অত্যন্ত সাধারণ

* 'The Statesman'—২৮শে মে ১৮৯৮।

কারণে তাদের মেজাজ খারপ হয়ে যায়। হয়তো বাঘ ঠাণ্ডা মেজাজে আছে, তার সঙ্গে নানারকম খেলা করছি, সহসা এক মুহূর্তে তার বিরক্তি আর রাগ প্রকাশ পাবে। সে সাংঘাতিক আঘাত হানতে চাইবে। সেই বিপদের মুহূর্তে যদি আপনি ভয়ে হার মানেন তাহলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। একবার বাঘ আমার মাথাটা তার মুখের মধ্যে পুরে ফেললো। আমার অবস্থা একেবারে অসহায়। সেই অবস্থা থেকে দুই হাতের জোরে বাঘের চোয়াল দুটি ফাঁক করে আমি মাথা বের করে আনলাম। আঘাত যা পেলাম তা এমন কিছু মারাত্মক নয়। বড় বড় বাঘের কামড় অনেকবার আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। একদিন হুগলীতে আমি যখন খেলা দেখাচ্ছি, তখন একটি বাঘ আমাকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর চেপে বসলো। আমার মৃত্যু অবধারিত ভেবে কয়েকজন ইউরোপীয় বিমূঢ় ভাবে তাঁবু ছেড়ে চলে গেলেন। কয়েকটি মহিলা অজ্ঞান হয়ে গেলেন সে দৃশ্য দেখে। আমার সহকারীরা তখন ভয়ে বিহ্বল। তারা বন্দুক নিয়ে বাঘকে গুলি করবার জন্য এগিয়ে এলো। আমি তাদের গুলি করতে বারণ করলাম। এবং তাড়াতাড়ি খাঁচার মধ্যে একটি পাঁঠার পুরো ঠ্যাং ছুঁড়ে দিতে বললাম। ঐ মাংসের লোভেও বাঘ আমাকে ছেড়ে গেল না। বেশ কিছুক্ষণ বুকের উপর দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ তার মেজাজের পরিবর্তন হল। এবং এক লাফে মাংসের টুকরোর দিকে এগিয়ে গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে উঠে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলাম।'

—আপনার বুকের উপর ভারী পাথর তুলে হাতুড়ির ঘায়ে তা ভাঙ্গা হয়। এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

—'কাকিনার রাজা একবার আমায় বলেছিলেন যে, বুদ্ধি ও মানসিক শক্তি দরকার হয় এমন অনেক ব্যাপারেই বাঙ্গালীরা অন্য জাতিকে হার মানাতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে অসাধারণ শারীরিক শক্তির প্রকাশ মোটেই দেখা যায় না। তারপর রাজা বললেন যে, তাঁর অধীনে একজন হিন্দুস্থানী কুস্তিগীর আছে। সে বুকের উপর তিন মণ পাথর তুলে অন্য লোকের হাতুড়ির ঘায়ে তা ভাঙতে পারে। আমি রাজাকে বললাম যে আমিও অনায়াসে তা করতে পারি! আমার কথা মত আমি কাজও

করেছিলাম। অমার বুকের উপর ছয়মণ পাথর তুলে তা ভাঙা হয়েছিল। এখন আমি বুকে দশমণ পাথর তুলে ভাঙাই।'

—আপনার প্রধান খাদ্য কি?

—'আমি রোজ দেড়সের মাংস, সামান্য ভাত এবং কয়েকটি ডিম খাই।'

—নেশা হয় এমন কোন ওষুধপত্র খাওয়ার অভ্যাস কি আপনার আছে?

—'মোটেই না। আমি চা কিংবা কফিও খাই না।'

* * *

সে যুগে শ্যামাকান্ত বাংলার সকল শ্রেণীর মানুষের মনেই সৃষ্টি করেছিলেন চমক। তাইতো সম্ভব অসম্ভব অসংখ্য গল্প তৈরী হয়ে তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়ও শ্যামাকান্ত সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হতো। সমকালীন সমাজের উপরও শ্যামাকান্তের প্রভাব ছিল অসীম। নানা কবিতা কাহিনী প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করতেন সেকালের মানুষ।

সে যুগের কবি বন্দনা-সঙ্গীত রচনা করেছেন শ্যামাকান্তকে উদ্দেশ্য করে

সুধু দেব শূলপাণি, স্বভুজ-বলয়
ভুজঙ্গম সনে করেন কেলি,
চারু নলিন-নয়না, পাষাণ-তনয়া
তাঁরি বক্ষোপরি শোভিছে মিলি,
আর শ্যামাকান্ত হৃদে ধরিছে পাষাণ
করিছে চূর্ণিত মুদ্গর ঘায়,
কত অম্লান বদনে ব্যাঘ্রবধূসনে
খেলিছে; জগৎ বিস্মিত তায়॥

তখনকার জনসমাজের মনোভঙ্গি এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের আধুনিক ভারতের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের উপরও পড়েছিল শ্যামাকান্তের প্রভাব। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণ তারই সত্যতা প্রমাণ করছে।

* 'আমাদের বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতদের আসা-যাওয়া লেগেই থাকতো। তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী অতিথি হতেন তখনকার দিনের বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ্ শ্যামাকান্ত। পরবর্তী জীবনে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন। ভগবানের চিন্তায় তিনি হিমালয়ের কন্দরে জীবনের শেষের দিনগুলি কাটিয়ে গিয়েছেন। যাক্ সে কথা আমার বক্তব্য বিষয় নয়।

যে কথা বলছিলাম। আমি শুনতাম তিনি নাকি বাঘের ঘরে প্রবেশ করে নিজের ইচ্ছামত বাঘকে খেলাতে পারেন। বিস্ময়ে ভরে যেত আমার মন।

ছু' একবার তাঁর খেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রায়ই আমার মনে এই প্রশ্ন জাগতো, কেমন করে তিনি এই অসাধ্য সাধন করেন?

একদিন জিজ্ঞাসাই করলাম তাঁকে—আপনার ভয় করে না? বাঘ যদি আক্রমণ করে আপনাকে, তাহলে আপনি কি করে আত্মরক্ষা করবেন?

উত্তরে শ্যামাকান্তবাবু বললেন,—দেখ, আমি যখন বাঘের খাঁচার মধে ঢুকি, তখন আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঘকে বোঝাতে চেষ্টা করি আমিই তার প্রভু। শক্তিতে সে আমার কাছে কিছুই নয়। তাই সে আমার কাছে পোষ মানে। আমার ইচ্ছামত খেলা দেখাতে সে তখন ভয়ে বাধ্য হয় কিন্তু আমি যে মুহূর্তে বুঝতে পারি, এবারে বাঘ তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আমি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসি। নইলে সে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

ঠিক তেমনি আমাদের দেশের এই ইংরেজ প্রভুরা। তারা সদা-সর্বদা আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করে আমরা ঘৃণ্য, আমরা পদদলিত। ইংরেজের বুটের তলায় থাকতেই আমাদের জন্ম। স্বাধীনতা লাভের কোন অধিকার বুঝি আমাদের নেই। বন্দী বাঘের মতই ভারতবাসী আজ সেই কথা বিশ্বাস করে। কিন্তু যেদিন ভারতবাসী তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবে বুঝতে পারবে তার শক্তির কথা, সেইদিন কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে ইংরেজ জাতিও ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। আমার বিশ্বাস সে দিন

* নবকল্লোল—১৩৬৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা

আর দেরি নেই। কথা বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাঁর সামান্য ক-একটা কথাই আমার শিশু মনেও করলো রেখাপাত। আমরা ভারতবাসী, আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলেই আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল খুলে পড়তে বাধ্য।

এই কথায় বিশ্বাস করে সেই ভুলে যাওয়া শক্তিকে জাগাবার জন্যই যৌবনে আমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম দেশবন্ধুর। ভালবাসলাম নিজের দেশকে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দেশের কাজে উৎসর্গ করলাম নিজেকে। তখন থেকে আমার একমাত্র ব্রত হলো আমার দেশের সেবা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্রিত করাই হল আমার একমাত্র লক্ষ্য।'

বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসে শ্যামাকান্তের দান সম্বন্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আলোকপাত করলেন। সে যুগের মল্লবীর, ব্যাঘ্রবশকারী শ্যামাকান্তের সত্যকার রূপটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো বিধানচন্দ্র রায়ের এই ক্ষুদ্র রচনাটির মধ্য দিয়ে।

যৌবনে শ্যামাকান্তের জীবনসাধনা ছিল জাতির দেহমনে শক্তি সঞ্চারের সাধনা। নিজেও তিনি দৈহিক শক্তিসাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সে শক্তি সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী দলের অন্যতম প্রেরণা ছিলেন মল্লবীর শ্যামাকান্ত।

শ্যামাকান্তের পিতৃভক্তিও ছিল অসীম। তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা ছিল ঢাকায় বাড়ী করার, কিন্তু পিতার অমত থাকায় তিনি সে বাসনা ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেন নি। অবশেষে ফরিদপুর জেলার নড়িয়া গ্রামেই বাড়ী করলেন। সেখানেই তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে অভিভাবকরূপে থাকতেন তাঁর পিতৃদেব।

শ্যামাকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হাস্যবালা দেবী পরবর্তীকালে রচনা করেন 'শ্যামাকান্ত জীবনী' গ্রন্থ। তাঁর পিতৃদেব শ্যামাকান্ত প্রসঙ্গে তিনি বলছেন,—'সোঽহং স্বামীর যে রূপটি আমার মনে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে অঙ্কিত আছে, তা হিমালয়ের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমিতে সেই আশ্রমে তাঁর সন্ন্যাসীর রূপ। তাঁর সংসার জীবনের রূপ আমার কাছে

সুস্পষ্ট নয়। আমার যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।'....

আর একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠলো শ্যামাকান্তের জীবনে। যে অজানা শক্তি তাঁর মধ্যে এতদিন সুপ্ত ছিল, অকস্মাৎ তা যেন সুবিপুল হয়ে পর্বতশৃঙ্গের মত সমুদ্রের গভীর থেকে মাথা তুলে জেগে উঠলো। প্রভাত-সূর্যের স্বর্ণ-কিরণ এসে পড়লো প্রথম সেই পর্বতশৃঙ্গে। আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো শ্যামাকান্তের মন।

একটি মৃত্যু! পিতার মৃত্যুসংবাদ তাঁর জীবনস্রোতে এনে দিল আমূল পরিবর্তন। জ্ঞানচক্ষু হলো উন্মীলিত। তিনি উপলব্ধি করলেন, শুধুমাত্র দৈহিক শক্তি অর্জন করলেই পূর্ণতালাভ হয় না। আত্মিক শক্তি লাভের মধ্য দিয়েই মানুষের চরম ও পরম সার্থকতা।

সেদিন তিনি মৈমনসিংহ শহরে খেলা দেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাঘটি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মুখে বসিয়ে দেয় একটি হিংস্র থাবা। শ্যামাকান্ত চোখ, নাক আর গলাতে আঘাত পেলেন। চোখটি অল্পের জন্য বেঁচে গেল। কিন্তু নাক ও গলার আঘাত থেকে বের হতে থাকে রক্তধারা। বাঘ তখন রক্তের গন্ধে হয়ে উঠেছে মরিয়া। এই চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েও শ্যামাকান্ত মুহূর্তের জন্যও মনের স্থিরতা হারালেন না। চাবুক দিয়ে তীব্র আঘাত হেনে তিনি বাঘকে ধীরে ধীরে খাঁচার দিকে নিয়ে এলেন। সার্কাসের কর্মচারীরা তখন বন্দুক নিয়ে গুলি করবার জন্য তৈরী হয়ে আছেন, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন না। শ্যামাকান্তের গায়েও গুলি লাগার সম্ভাবনা। অসীম উদ্বেগে যখন দর্শকেরা হতভম্ব হয়ে আছে, তখন শ্যামাকান্ত বাঘকে শক্তিতে পরাভূত করে খাঁচার মধ্যে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহিস বাঘের গলায় শিকল পরিয়ে দিল। শ্যামাকান্তও খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেন। সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ডাক্তার ছুটে এসে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

পরদিন শ্যামাকান্ত একটু সুস্থ হলে জানানো হোল তাঁর পিতার মৃত্যু-সংবাদ। সার্কাসে যখন বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখনই এই দুঃসংবাদ এসে পৌঁছায়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর। স্নেহময় পিতার মৃত্যুতে ভীষণ

আঘাত পেলেন তিনি। মনোজগতে সৃষ্টি হোল তুমুল আলোড়ন। পূর্ণ স্বাস্থ্য, যৌবন, দৈহিক শক্তি, মনোবল সবই তুচ্ছ সেই পরমব্রহ্ম, ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে। যশ, মান, অর্থ সবই মূল্যহীন। কিছুই স্থায়ী নয়। প্রিয়জন, বন্ধু, আত্মীয় কেউ কারো নয়। মৃত্যুর করাল গ্রাসে একদিন সকলকেই পতিত হতে হবে। এই চিন্তাই তাঁকে যেন পেয়ে বসলো। পিতার চিতার উপর এক পঞ্চরত্ন মঠ প্রতিষ্ঠা করে তাতে লিখলেন—

'ধন মান যশ যত সকলই অসার,
ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ নহে কার,
নয়ন মুদিলে জগৎ অন্ধকার।'

* * *

অকস্মাৎ অন্তরের সুপ্ত ঈশ্বরানুরাগ জাগ্রত হয়ে উঠলো। ব্যাকুল হলো অন্তর। অন্তরের ব্যাকুলতা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো। এক অপ্রাকৃত ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন। দেহে মনে অসাধারণ শক্তি অনুভূত হতে লাগলো। সাধারণ মানুষের শক্তি নয়, পুরুষপ্রবর পুরুষোত্তমের শক্তি। এক ভাবাতীত রহস্যময় শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে হয়ে রইলেন প্রভাবান্বিত।

ধীরে ধীরে আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠতে লাগলেন বাংলার মল্লবীর শ্যামাকান্ত। অকস্মাৎ একদিন বুকভরা ব্যাকুলতা নিয়ে সংসারের সকল টান পিছনে ফেলে রেখে তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হলেন। সার্কাসের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন সেজ ভ্রাতা সূর্যকান্তের উপর,* ১৯০১ সালের আগষ্ট মাসে। তিনি আর ফিরে আসেননি সংসারে।

বিদেশী সার্কাস কোম্পানীর মালিকরা নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন শ্যামাকান্তকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। ওঁদের সার্কাস পার্টিতে যোগদান করবার জন্য শুধু অনুরোধই করেননি, প্রচুর অর্থের প্রলোভনও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শ্যামাকান্তের মন ভোলেনি। অর্থের লালসা শ্যামাকান্তের মনকে বিচলিত করতে পারেনি। তখন যে তিনি পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ করে ফেলেছেন সেই পরম পুরুষের শ্রীচরণে। তিনি তখন ভগবৎভাবে বিভোর, আত্মহারা।

* 'শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়'—লেখক শ্রীসমর বসু [সংহতি—ভাদ্র ৬৯]

তবে সংসার থেকে মুক্তি নেওয়ার পূর্বে তিনি সংসার-জীবনের শেষ কর্তব্যগুলি যথাযথ সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন। অল্প বয়সেই দুটি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। বিধবা বোন ও স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য তিনি মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্যের কাছে সঞ্চিত অর্থ রেখে যান। তাঁরা থাকতেন কাশীতে। জগৎকিশোর কাশীতে প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়ে দিতেন। জগৎকিশোর ছিলেন শ্যামাকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর পুত্র যতীনবাবুও শ্যামাকান্তকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। শ্যামাকান্তের সন্ন্যাস-জীবনের রচিত গ্রন্থরাজি জগৎকিশোরই প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন।

কাশীতে এসেই অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হলো শ্যামাকান্তের যোগীবর পরমহংস 'তিব্বতীবাবা'র সঙ্গে। এবং তাঁকেই গুরুরূপে বরণ করলেন। সন্ন্যাসীর দীক্ষা নিয়ে প্রথম দিকে নৈমিষারণ্যে যোগসাধনা করতে লাগলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দিব্য অনুভূতি লাভ করে আধ্যাত্মিক জীবন প্রাপ্ত হলেন। মল্লবীর, ব্যাঘ্রবশকারী শ্যামাকান্ত পরম সত্যকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সত্যানুসন্ধানী শ্যামাকান্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মনের আবরণের পশ্চাতে যে দীপ্ত গোপন বিশ্বচেতনা রয়েছে, সেই চৈতন্যময় আপন শুদ্ধস্বরূপকে অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

দৈহিক সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত শ্যামাকান্ত এবার আত্মিক শক্তি অর্জনের সাধনায় ব্রতী হলেন। যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন।

অন্ধ ভক্তি এবং যুক্তিহীন ধর্মতত্ত্বের প্রতি তাঁর একান্ত অনীহা। তীব্র বৈরাগ্য-অনলে রাগ দ্বেষ ও অন্যান্য প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে আপন সত্তায় ব্রহ্মের উপলব্ধি তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি।

অলৌকিক শক্তির প্রকাশ তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন যে, যোগসাধনা করতে করতে মানুষের অনেকগুলি শক্তি জন্মায়। যোগী বাক্‌সিদ্ধ হয়ে যান। তিনি যা বলেন, তাই ফলে। কিন্তু অলৌকিক শক্তির প্রকাশ সন্ন্যাসীদের পক্ষে এক ধরণের বন্ধন। কারণ ঐ শক্তিবলে মানুষের কাছ থেকে ভক্তিশ্রদ্ধা লাভের বাসনা অজ্ঞাতসারে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বাসনা আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী। পরম সিদ্ধির যাত্রাপথে

যেতে যেতে এই বাসনা-বন্ধনে যোগীকে থেমে যেতে হয়। সোঽহং স্বামীর সাধনা ছিল জ্ঞানমার্গের সাধনা। জ্ঞানের নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলেই অলৌকিক শক্তি যে একটা বিরাট বন্ধন তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

১৯০৩ সালে তিনি নৈনিতাল থেকে সাত মাইল দূরে হিমালয়ের পাদদেশে 'ভাওয়ালী' গ্রামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। আশ্রমের এক পাশে একটি পার্বত্য নদী, অপর দিকে নির্জন শ্মশানভূমি। এমনই এক নির্জন পরিবেশের মধ্যে বসে নিজ জীবনের সত্যোপলব্ধিকে তিনি দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করে রচনা করলেন,—সোঽহং তত্ত্ব, সোঽহং সংহিতা, সোঽহং গীতা প্রভৃতি গ্রন্থরাজি।

কয়েক বৎসর পর—স্বামীজী স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন নৈনিতালের কাছে গেঁঠিয়া-গাঁওতে। স্বামীজী এবং তাঁর বোন সন্ন্যাসিনী স্বয়ংভাতি ও শিষ্যপ্রবর বিজ্ঞানপাদের নশ্বর দেহ এই আশ্রমেরই মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে।

সোঽহং স্বামী নূতন কোন ধর্মের প্রবর্তক নন। উপনিষদের চিরন্তন সত্যকেই উপলব্ধি করে প্রকাশ করেছেন। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আবেগের দ্বারা অন্তর্জীবনকে সম্প্রসারণ করে সেই বিশ্বচেতনায় পৌঁছাবার জন্য বৈরাগ্যের পথকেই বরণ করে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। বৈরাগ্যই যে জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ। মানুষের পূর্ণতালাভের পথে বৈরাগ্য-সাধনার প্রয়োজন আছে। এই পৃথিবীর নাট্যশালায় নটের সাজ পরে কেউ রাজা বাহাদুর, কেউ বা রাজা মহারাজার ভূমিকায় অভিনয় করছে। কেউ সচ্চরিত্র সাধু, কেউ বা ব্যসনে রত। কেউ কৃপণ, কেউ বা দান-ধ্যানে আনন্দলাভ করেন। নিষ্কাম বা নিত্যকর্মে কেউ মন শুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন, কেউ আবার মৎস্য মাংস ত্যাগ করে সত্ত্বশুদ্ধি করছেন।

'এ সংসার রঙ্গালয়ে বিচিত্র নটের মেলা,
পরিয়া বিচিত্র সাজ খেলিছে বিচিত্র খেলা।'

কিন্তু সকলেরই মনে এক অভিলাষ, অর্থাৎ দুঃখের একান্ত নাশ এবং নির্বিশেষ সুখলাভ। কোথায় সুখ? জীব তা জানে না, তবু তারা সর্বদাই

সুখের জন্য লালায়িত। কত ভাবে কি অসীম কামনা নিয়ে মানুষ এই সুখের অনুসন্ধান করছে। 'কত আশা অভিলাষ সুখের কল্পনা কত, খেলিছে হৃদয় মাঝে সাগরে লহরী মত।' 'সোঽহং গীতা' গ্রন্থে তাই তো বলছেন সোঽহং স্বামী—

'মজিয়া বিষয় ভোগে ব্রহ্মানন্দ নাহি হবে,
অনলে পশিয়া স্নিগ্ধ বল কে হয়েছে কবে?
কণামাত্র ভোগতৃষ্ণা থাকে চিত্তে যতক্ষণ,
নাহি হয় নিরোধিত প্রবল চঞ্চল মন।
তাই বলি ত্যজ এবে বিষয় ভোগ বাসনা,
পরিজনে অনুরাগ অলীক সুখ কামনা।
সিংহ যথা ছিন্ন করি' ব্যাধের জালবন্ধন,
গরবে নিনাদ করে ত্রাসে কাঁপে ত্রিভুবন।
সেইরূপ জ্ঞানবলে ছেদ মায়া আবরণ,
শৃগাল বৃত্তিতে মুক্তি নাহি মিলে কদাচন।
সুতীব্র বৈরাগ্যবলে হবে মন নির্বাপিত,
মনের বিলয়ে তুমি যেই পদে প্রতিষ্ঠিত।
পরম কৈবল্যধাম বলে তারে ঋষিগণ,
করে যাচ্ঞা সেই পদ প্রজ্ঞানেত্র যোগীজন।'

জীবনের সুখ দুঃখ সবই আমাদের কর্মফল। এই বিশ্বাসের উপর সংশয় প্রকাশ করে স্বামীজী বলছেন,—

* 'যদি কর্মফলেই জীবকে সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয় এবং এর ব্যতিক্রম যদি কখনও না ঘটে, তাহলে কর্মই ত প্রধান। পূজা আরাধনা প্রার্থনার তাহলে প্রয়োজন কি? সুকর্ম কুকর্ম পাপ পুণ্য নরকাদি সকলই ত ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাহলে একজনের সুকর্মে অন্য জনের কুকর্মে মতি কেন? সত্ত্ব রজ তম্ যোগে মনের সৃষ্টি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি। ঈশ্বর যদি বিশ্বস্রষ্টা, তাহলে এ সকলেরই কারণ তিনি। তিনি যদি প্রেমময়, তাহলে পাপ তাপ নরকাদি তিনি কেন সৃজন করলেন? নর-নারীকে সৃষ্টি

* 'শ্যামাকান্ত জীবনী'। লেখিকা—হাস্যবালা মুখোপাধ্যায়।

করে তাদের কুবুদ্ধি সুবুদ্ধি দিয়ে কেন দুঃখার্ণবে মগ্ন করলেন? খৃষ্ট এবং মহম্মদ বলেছেন যে, শয়তান সুকৌশলে জীবকে পাপে নিমগ্ন করে। কিন্তু প্রেমময় ভগবান মানুষের এমন ভীষণ শত্রুকে কেন সৃষ্টি করলেন? ভগবান যদি সর্বজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে এই সৃষ্টির ফলাফল সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং শয়তান দায়ী নয়, জীবগণও দোষী নয়, ভগবানই পাপ তাপের নিদান। কোন কোন ধর্মসম্প্রদায় বলে যে, ভগবান পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। তাই মানুষ যা ভোগ করে তা নিজেরই ইচ্ছার ফল। কিন্তু নিস্পৃহ বিচারের আলোকে এ মতও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। দেশ কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধর্মে ও সমাজে পাপ পুণ্য বোধ একরূপ নয়। এক মতে যাহা পাপ তাহাই মতান্তরে স্বর্গপ্রদ পুণ্য কর্মরূপে গণ্য হয়। গাজি যখন স্বর্গ কামনায় কাফেরকে হত্যা করে তখন সে নরহত্যাকেও পুণ্যকর্ম বলেই মনে করে। কোন ধর্মমতে পশুবধ স্বর্গপ্রদ, আবার কোন ধর্মমতে প্রাণীবধ মহাপাপ। সুতরাং নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে পূর্বাপর বিচার করলে দেখা যায় যে, কুকর্ম সুকর্ম হিত অহিত ইত্যাদি জ্ঞানের ভিত্তি মানুষের শিক্ষা সমাজ ও সংস্কারের উপর। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব নেই। তার পুরুষকার সর্বদাই পরাহত হচ্ছে। তার সমস্ত ইচ্ছা, আকিঞ্চন ব্যর্থ হচ্ছে। জীবের জীবনচক্রকে সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রিত করছেন অজ্ঞাত অলক্ষ্য এক শক্তি।

জগতে এমন কে আছে নিজের ইচ্ছায় অন্ধ পঙ্গু দীন মূর্খ রূপহীন বধির হতে চায়? সকলেই চায় সুস্থ সবল বিদ্বান ধনী জ্ঞানী মানী রাজা বাগ্মী বীর হতে। জীব স্বেচ্ছায় দস্যু তস্কর শঠ প্রবঞ্চক হয় না। প্রদীপ্ত জঠরানল ও ভোগ সুখের বাসনাই তাকে পাপ পথে টেনে নিয়ে যায়।

শব্দলুব্ধ মৃগগণ শুনিয়া বাঁশরী রব
পরে গলে বাগুরা বন্ধন।
হস্তিনীর ছলনায় আলানে আবদ্ধ হয়
স্পর্শ লোভে মত্ত করিগণ।

রূপমুগ্ধ পতঙ্গম দেখিয়া রূপের ছটা
ঝাঁপ দেয় অনল শিখায়।
সুস্বাদু চারের লোভে রক্তলোলুপ মীনের
সুতীক্ষ্ণ বঁড়িশে প্রাণ যায়।
পদ্ম মধ্যে হ'য়ে বদ্ধ গন্ধে লুব্ধ ভৃঙ্গগণ
চিরদিন হইতেছে হত,
এইরূপে জীবগণ ভোগে দুঃখ হয় হত
বিষয় বিশেষে হয়ে রত॥
পাতিয়া মোহের জাল ব্যাধরূপী জগদীশ
অন্তরালে আছ লুকায়িত।
বিষম বিষয় ফাঁদে বিমুগ্ধ মানবগণ
অহরহ হতেছে পতিত।

অন্ধ বিশ্বাসের গণ্ডী অতিক্রম করে যদি কেহ বিচার করে দেখে, তাহলে সে বুঝতে পারে যে ভগবানের অস্তিত্বের মূল হচ্ছে, অনুমান, বিশ্বাস ও সংস্কার। আপন বিশ্বাস ছাড়া আস্তিকের নিকট ভগবানের অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণ নেই। তেমনই নাস্তিকের পক্ষেও আপন অবিশ্বাস ও জড়জ্ঞান ছাড়া ভগবানের নাস্তিত্বের প্রমাণ নেই। ভগবানের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব রূপ-গুণ-স্থান-বাক্য সব মানুষের কল্পনায় রচিত। অজ্ঞেয় হৃদয়রাজ্যে বিশ্বাস-মন্দিরে ছাড়া ভগবান আর কোথায় অবস্থিত আছেন?

জগদীশ যদি জড় জীব হতে ভিন্ন সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী বলে স্বীকৃত হন, তাহলে সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তি সর্বব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণ ভগবানে আরোপিত হয় কিরূপে? জড়জীব হতে ভিন্ন অসীম ঈশকে সর্বব্যাপী আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত। অণু পরমাণু মধ্যে জড় জীবে দেহ আত্মা মনে যে চৈতন্য পরিব্যাপ্ত সেই সর্বব্যাপী হতে জীবের স্বতন্ত্র সত্তা কিভাবে বিশ্লেষিত হবে?

তুমি তিনি সর্বব্যাপী এরূপে ঈশে নির্দেশ
দ্বৈতজ্ঞানে করে যেই জন।
নাহি তার অন্তর্দৃষ্টি তার সর্বব্যাপী শব্দ
অর্থহীন প্রলাপ বচন।

সোঽহং স্বামীর বিচার অনুসারে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঈশ বা সগুণ ব্রহ্ম জীবভাবে অলঙ্কৃত নয়। ঈশ্বরে ন্যায়পরায়ণতা দয়া প্রেম ইত্যাদি ভাব আর্য শাস্ত্রানুমোদিত নয়। পুরাণে দয়া প্রেম গুণযুক্ত যে অবতারের দেখা মেলে তিনি জীব হতে ভিন্ন নন। মুসলমানের আল্লা এবং খৃষ্টানের গড একত্রে মিলিত হয়ে স্রষ্টা, পিতা, দয়াময় ঈশ্বররূপে পতিত হিন্দু সমাজে উপস্থিত হচ্ছেন। জীবের মধ্যে দয়া প্রেম শক্তি জ্ঞান বিবেক ইত্যাদি যত শ্রেষ্ঠতম উপাদান আছে, মানুষ ঈশ্বরকে সেই সমস্ত উপাদানে গঠিত বলে কল্পনা করে নিয়েছে। কিন্তু যোগী যখন নিভৃত হিমাদ্রি অঙ্কে আত্মস্থ হন, তখন তিনি সর্ববিশ্বকে আত্মময় দেখেন। জীব জড় ঈশ তখন ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয় না। এ জগতে একই তেজ, ভিন্ন রূপ-গুণ যোগে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত। এ জগৎ আত্মার স্পন্দন মাত্র। ইহা মায়া ছাড়া আর কিছু নয়। জীবের যতক্ষণ দ্বৈত বোধ আছে ততক্ষণই তার ইষ্টানিষ্ট সুখ-দুঃখের অনুভব এবং সাধন-ভজনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ঈশ্বর-চৈতন্যে কখনও দ্বৈত অনুভূতি নাই।

দ্বৈতভাবে কভু জীব নাহি পায় জগদীশে
ইদং জ্ঞানে ঈশ গ্রাহ্য নয়
অস্মদ্ প্রত্যয় গম্য চৈতন্য সর্ব সময়ে
আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি হয়।
দেহ অভিমান রূপ অবিদ্যার আগমনে
হয় যবে 'আমি' সর্বময়,
ত্রিতাপ হয় স্তিমিত লভে জীব ঈশ্বরত্ব
ইহার ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়।
অবিদ্যায় অধিষ্ঠিত চৈতন্য ঈশ্বর আখ্য
অবিদ্যাভিভূত জীবগণ
অধ্যাসের অপগমে থাকে চৈতন্য নিষ্ফল
জীব ঈশ থাকে না তখন।
নাহি সৃষ্টি নাহি স্রষ্টা নাহি জীব নাহি ঈশ
মায়ার খেলনা সমুদয়।
মোহ নিদ্রা অবসানে থাকি একমাত্র 'আমি'
অদ্ধ ভূমা অব্যক্ত অব্যয়।

অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে সোঽহং স্বামীর জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত। সোঽহং-তত্ত্ব গ্রন্থে স্বামীজী বলছেন,—'দেহাভিমানী চৈতন্য জীব স্বীয় পরিচ্ছিন্নতা অনুভব করিতেছে ও জীবধর্ম ত্রিতাপ দ্বারা ক্লিষ্ট হইতেছে। আত্মজ্ঞ গুরু মহামোহময় সংসার সাগরে নিরন্তর নিমগ্ন জীবের উদ্ধারার্থ ....অনুগত শিষ্যকে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য দ্বারা আত্মস্বরূপ উপদেশ দিচ্ছেন। * * * * * হে শিষ্য তুমি অবিদ্যাহেতু দেহাত্মকভাবে অভিভূত হইয়া স্বীয় পরিচ্ছিন্নতা অনুভব করিতেছ এবং এই জগৎ ও জাগতিক পদার্থসকলে দ্বৈত দর্শন হইতেছে। আসক্তি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপে তাপিত হইতেছ। কিন্তু পরমার্থতঃ তুমি পরিচ্ছিন্ন নহ! তোমার দেহাত্মজ্ঞান অবিদ্যাপ্রসূত মাত্র। তুমি ভূমা। মহান। ষট্‌গুণসম্পন্ন স্থিরপ্রজ্ঞ। শিষ্য এই তত্ত্বমসি উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেহাত্মক জ্ঞানজনিত পরিচ্ছিন্নতা বিস্মৃত হন এবং স্বীয় বিরাটত্ব অনুভব করিয়া ত্রিতাপ বিমুক্ত হন। সুতরাং মহাবাক্যসকল ('তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা', ব্রহ্মেতি,—অহং ব্রহ্মাস্মি) দ্বৈত ভাবব্যঞ্জক নহে, অদ্বৈত ভাবব্যঞ্জক। উহা দ্বারা একাত্ম বিজ্ঞান বা আত্মার অপরিচ্ছিন্নতাই মাত্র ব্যক্ত হইতেছে।'

সোঽহং তত্ত্বের 'সাধন তত্ত্ব' অধ্যায়ে স্বামীজী সাধনার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বলেছেন,—যতক্ষণ এই মন লয় না হয় ততক্ষণ জীব জানতে পারে না, সে কে, সৃষ্টি কি এবং সৃষ্টির কারণ কি। মনের লয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের উদয়। এই মন লয় করবার চেষ্টার নামই যোগ। প্রকৃতপক্ষে মন নামে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। আমার (আত্মার) কল্পিত সৃষ্টির সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ যোগ তাই মন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। মনের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিজ্ঞানের লয়। সৃষ্টিজ্ঞানের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনের লয় হয়। সুষুপ্তির পর জাগ্রদবস্থার প্রারম্ভেও এর কতক আভাস পাওয়া যায়। যেমন—বাল্যাবস্থার লয়ে যৌবনের উদয়, যৌবনের লয়ে বার্ধক্যের উদয়। এক অবস্থায় বিদ্যমান থাকতে অন্য অবস্থা পাওয়া যায় না। তেমনি জীবাবস্থায় থেকে ব্রহ্মাবস্থা বা ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায় না। জীবাবস্থা থেকে ব্রহ্মাবস্থায় উত্তরণের পথে যোগীকে যে ভ্রম ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয় স্বামীজী তা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন। সব কিছুই অবশ্য সোঽহং স্বামীর অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত।

'প্রথম জীবাবস্থা হইতে সমাধি অবস্থায় যাইবার সময় মুগ্ধাবস্থা আসিয়া যোগীর গতি রোধ করে। এই মুগ্ধাবস্থাতে জগৎ-জ্ঞান এবং স্বীয় অস্তিত্ব-জ্ঞান থাকে না। এই অবস্থা হইতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া সাধক উপলব্ধি করেন যেন কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার আত্মসত্তা ও সৃষ্টির সত্তা লোপ হইয়াছিল। ইহা সুষুপ্তির ন্যায় জীবেরই অবস্থা বিশেষ। কিন্তু অনেক সাধক এই মুগ্ধাবস্থাকেই সমাধি অবস্থা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। এবং অভ্যাস দ্বারা এই অবস্থারই স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায়। সৃষ্টিজ্ঞান ও দেহাত্মক জ্ঞান লোপ হইয়া যে শুদ্ধ চিন্ময় নির্গুণ আত্মসত্তাতে উপস্থিতি তাহাকেই সমাধি অবস্থা বলা যায়। সুতরাং মুগ্ধাবস্থাতে আত্মসত্তার অবিদ্যমানতা হেতু সমাধি অবস্থা হইতে পারে না।

অন্তর্মুখী মন যখন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ এবং সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন যদি আত্মসত্ত্বা বা ব্রহ্মবস্তু অবলম্বন করে, তবে আত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়। এবং সমাধি অবস্থা বা ব্রহ্মাবস্থা উপস্থিত হয়। সাধনার এই তত্ত্বকেই সোঽহং স্বামী কাব্যচ্ছলে প্রকাশ করেছেন।

বিবেক বৈরাগ্যবলে প্রত্যাহৃত মন
আত্মতত্ত্ব করিলে আশ্রয়
রবি শশী গ্রহ তারা স্থাবর জঙ্গম সহ
দৃশ্যমান বিশ্ব লুপ্ত হয়॥
হয় লোপ সে সময়ে সৃষ্টিসহ স্রষ্টা ঈশ
দেহ সহ জীবাত্মাভিমান।

* * *

দ্রষ্টৃত্ববিহীন 'দ্রষ্টা' জ্ঞাতৃত্ববিহীন 'জ্ঞাতা'
'আমি' সত্তা মাত্রে বিরাজিত
প্রকৃতি বা মায়া খ্যাতা আমার স্পন্দন মাত্র
বিশ্বরূপ করে বিবর্তন,
হে বিবেকী একবার দেখ স্বীয় ভূমা সত্তা
আত্মতত্ত্বে লয় করি মন॥

* * *

পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত মোহাচ্ছন্ন প্রাণহীন বাঙ্গালী জাতিকে আত্মিক শক্তিতে জাগ্রত করবার মানসে সোঽহং স্বামী উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

'একমাত্র মুক্ত-আত্মা জ্ঞাত হয়
অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয়,
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া,
সাক্ষীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি জীবাত্মা রূপে প্রকাশিত,
'তত্ত্বমসি', ওহে সন্ন্যাসীপ্রবর
ধর ধর ধর উচ্চে তান ধর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ'।

বেদান্তের মহাসত্যকে উপলব্ধি করে বেদান্তের জটিল তত্ত্বকে সরল সহজ করে কাব্যছন্দে রচনা করলেন সোঽহং স্বামী 'Truth and Common-sense' গ্রন্থ, ইংরাজী ভাষায়। সে যুগের ইংরাজী শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী হৃদয়ে বোধ হয় সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করেছিলেন ছায়াচ্ছন্ন তপোবনের আর্য ঋষিদের চিন্তাকে।

ইউরোপীয় চিন্তাধারার মধ্যে যা ভ্রান্ত, কৃত্রিম তাকে যেমন আঘাত করেছেন, তেমনি নিস্পৃহ জ্ঞানযোগী রূপে ইউরোপীয় দার্শনিকদের সংস্কারমুক্ত জ্ঞানকেও তিনি দিয়েছেন স্বীকৃতি। দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসারের দর্শনকে তিনি যুক্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য দর্শন বলে স্বীকার করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এবং সাধকরূপে শ্যামাকান্ত ছিলেন সংস্কারমুক্ত মহাপুরুষ। বিশেষ কোন মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। অন্তরের উপলব্ধিকে, মহাসত্যকে প্রকাশ করেছেন গভীর আবেগের সঙ্গে। প্রজ্বলিত করে তুলেছেন একটি উজ্জ্বল দীপশিখায়। সত্য বাণী রূপ পেয়ে সে যুগের বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়েছিলেন মনুষ্যত্ব লাভের প্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

মহাসাধক শ্যামাকান্ত এইভাবে ধ্যানমৌন হিমালয়ের বুকেই জীবনের

শেষ দিনটি পর্যন্ত ছিলেন ধ্যানে মগ্ন। আত্মিক সাধনায় মগ্ন। অবশেষে ১৯১৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর ষাট বৎসর বয়সে হিমালয়ের কোলেই সাঙ্গ হোল তাঁর নিত্যলীলা। তখনও যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁর কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হতে লাগলো,—

গিরিশৃঙ্গে বসি অশনি নিনাদে
গাইব বৈদিক গান।
হইবে জাগ্রত ভারত সন্তান
যদি দেহে থাকে প্রাণ।

পরমহংস যোগানন্দ

'ভারতবর্ষে আমি বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থার সাধিকার দর্শন লাভ আমার আগে কখনও ঘটে নি। তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ মুখশ্রী আনন্দে উজ্জ্বল, তাতে করেই তাঁর নাম হয়েছে 'আনন্দময়ী মা'। সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণকেশপাশ অবগুণ্ঠনহীন মস্তকের পিছনে লুটিয়ে পড়েছে। কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা—তৃতীয় নেত্রের প্রতীক, তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অন্তরে তাঁর সদা জাগ্রত। ছোট্ট মুখখানি, ছোট্ট দুটি হাত আর ছোট্ট দুটি পা—তাঁর আধ্যাত্মিক বিরাটত্বের সঙ্গে কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য।

........তারপর আনন্দময়ী মা যেন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। মূর্তি তাঁর মর্মর প্রতিমার মত নিথর, নিস্পন্দ। মন কার ডাকে যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে ছুটে বেরিয়েছে। গভীর কালো চোখ দুটি তাদের অতল-স্পর্শিতা হারিয়ে প্রাণহীন নিষ্প্রভ—কাঁচের মত। সাধুসন্তরা যখন জড়দেহ হতে তাঁদের চৈতন্য অপসারিত করেন, তখন প্রায়ই তাঁদের এই রকম ভাব বর্তমান থাকে। সে সময় বোধ হয় দেহটা যেন একটা নিষ্প্রাণ মাটির পুতুলের মত। ঘণ্টাখানেক ধরে দুজনেই আমরা তখন ধ্যানানন্দে মগ্ন হয়ে রইলুম। সে যে কী আনন্দ! ছোট্ট একটি উচ্ছ্বসিত হাসিতে টের পেলুম,—আনন্দময়ী মার সম্বিত ফিরে এসেছে।

সকল প্রকার তুচ্ছ আকর্ষণ পরিহার করে আনন্দময়ী মা ভগবানে একান্তভাবে পরিপূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণ করেছেন। পণ্ডিতের চুলচেরা বিচারে নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধ্রুবন্যায়ে এই আপনভোলা শিশুটির মত সরল সাধিকা মানব জীবনের একমাত্র সমস্যার সমাধান করেছেন—সেটা হচ্ছে ভগবানের সাযুজ্য লাভ। লক্ষকোটি সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে মানুষ আজ এই একমাত্র সহজ সরল সত্যটা একেবারে ভুলে গেছে। কুজ্ঝটিকার অন্তরালে এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি প্রেম অস্বীকার করে জাতিসকল বাহ্যিক মানবহিতৈষণার প্রতি উৎকট নিষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের নাস্তিকতা লুকোবার

চেষ্টা করে। অবশ্য এইসব মানবকল্যাণকর প্রচেষ্টাগুলিও সৎ—কারণ তারা মানুষের মন সাময়িকভাবে তাদের নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় বটে কিন্তু যীশুখৃষ্ট তাঁর 'প্রথম আজ্ঞা'য় যা বলেছেন, জীবনের সেই একমাত্র দায়িত্ব থেকে তা আর মানুষকে মুক্ত করে না। ঈশ্বরকে ভালবাসার যে উন্নতিসাধক কর্তব্য, তা তার একমাত্র দাতার মুক্ত হস্তের দান,—প্রথম শ্বাস গ্রহণের সাথে সাথেই এসে পড়ে।'

বলছেন পরমহংস যোগানন্দ। আনন্দময়ী মাকে প্রথম দর্শন করে। এ কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর রচিত 'অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ যোগী' নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে। ১৯২০ সালে যোগানন্দজী আমেরিকার বোস্টন সহর থেকে ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ্ রিলিজিয়াস লিবারেলস-এর ধর্ম সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে আহূত হয়ে আমেরিকা গমন করেন। সেখানে তিনি বক্তৃতার মধ্যদিয়ে আমেরিকাবাসীর চিত্ত জয় করে ফেলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পর ভারতীয় যোগীরূপে তিনি সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। বহু ইউনিভার্সিটি চার্চ ক্লাব ও বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশ থেকে বক্তৃতা প্রদানের আহ্বান আসে। তিনিও সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে পৃথিবীর নানা স্থানে চুরাশীটি সৎসঙ্গ আশ্রম ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এক আমেরিকাতেই দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের উপর নারী ও পুরুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রবর্তিত 'যোগদা' প্রণালীর (ক্রিয়াযোগের) শিক্ষার্থী হন। তাঁর অধ্যাত্ম জীবনে এ এক বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব কীর্তি। ১৯১৭ সালে ভারতবর্ষে দামোদর নদের তীরে ডিহিকা গ্রামে মাত্র সাতটি ছাত্র নিয়ে যোগদা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতিতে স্থান সংকুলানের অভাবে ১৯১৮ সালে রাঁচিতে এই বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করেন সুবিস্তৃত উদ্যান সম্বলিত আশ্রম বাটিকায়। এবং এখান থেকেই তিনি আমেরিকা গমন করেন।

সনাতন হিন্দু ধর্মের বাণী প্রচার করাই যোগানন্দজীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহকে তাদের বিভিন্ন মত ও পথ কর্মপন্থা বিচিত্র জীবনধারা দৈনন্দিন জীবনের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও, একই আধ্যাত্মিক যোগসূত্রে আবদ্ধ করে ঈশ্বরভাবে উদ্বুদ্ধ

করা। এবং তাঁর প্রবর্তিত যোগদা প্রণালীর (ক্রিয়াযোগ) মাধ্যমেই তা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর সাধনায় অবশ্য তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাসী তাঁর প্রদর্শিত ঈশ্বরানুসন্ধানের সহজ ও সরল পথের সন্ধান পেয়ে তৃপ্ত ও ধন্য হয়েছিল।

এই মহাপুরুষ ইংরাজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী, উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে আবির্ভূত হন। এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী কায়স্থ পরিবারে। পিতা-মাতার দ্বিতীয় পুত্র এবং চতুর্থ সন্তানরূপে। ভাই ভগ্নী মিলে ওঁরা ছিলেন আট জন।

পিতা শ্রীভগবতীচরণ ঘোষ ছিলেন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ধর্মপ্রাণ ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। মাতা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীলা ও ভক্তিমতী রমণী। ভালবাসার মাধ্যমেই তিনি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনী থেকে উদাহরণ বেছে নিয়ে শাসন উপদেশ আর নীতি শিক্ষার বিষয় সুচতুর ভাবে প্রয়োগ করতেন। শিক্ষা আর শাসন পাশাপাশি চলতো। পিতামাতা উভয়েই ছিলেন যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর মন্ত্রদীক্ষিত শিষ্য ও ভক্ত।

শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যোগানন্দজী পিতামাতার প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলছেন, 'উভয়েই ছিলেন সাধুপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি প্রশান্ত মহিমময় প্রীতি কখনও চপলতার দ্বারা লঘু হতে দেখিনি। পিতামাতার সুসমঞ্জস জীবনই ছিল আমাদের আটটি তরুণ জীবনের চপল আবর্তনের শান্তিময় কেন্দ্র।'

বাপে-মায়ে আদর করে নাম রাখলেন মুকুন্দ। যিনি মুক্তিদাতা তিনিই তো মুকুন্দ। তিনিই বিষ্ণু। তাঁকে লাভ করেই তো সাধক আনন্দময় হয়ে যান। সেই রস-স্বরূপ আনন্দময় পুরুষই হলেন শিশুরূপী মুকুন্দ। মহাশিশু শিশুরূপী মুকুন্দের ছদ্মবেশে দিনে দিনে বড় হতে লাগলেন। মহিমময় হিমালয়ের সন্নিকটে গোরক্ষপুরে এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শহরে শহরে। যে অজানা শক্তি তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে ক্রমশ ক্রমশ যেন তা সুবিপুল হয়ে ওঠে। তার ছোট্ট শিশু দেহের বদ্ধ কারায় যেন গর্জন করে উঠতে থাকে, দুরন্ত সাগর তরঙ্গের মত। শিশুর দেহ…নবীন বিশ্বের

সূতিকাগার....সীমাহীন শিশুর সত্তা....যা কিছু আছে ব্রহ্মাণ্ডে সবই যেন আছে তার ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে।

ক্রমশ চেতনার সুগভীর গহ্বর হতে স্পষ্ট সব মূর্তি জেগে উঠতে থাকে, একটি দুটি করে ঘটনার সুস্পষ্ট রেখা। তেমনি আসে সীমাহীন দিন, একটির পর একটি সেই একই ছন্দে বাঁধা। কিন্তু প্রত্যেক দিনের শৃঙ্খলের আড়ালে একটু একটু করে জেগে উঠতে থাকে নূতন সব মূর্তি। ক্রমশঃ প্রতি দিবসের শৃঙ্খলও যেন আলগা হয়ে যায়। দৃষ্টি খুলে যায়। কালের সুগভীর অন্ধকার স্তরে, চেতনার প্রতি মোড়ে মনে হয় যেন সেই অতিপরিচিত ধ্বনিই সে শুনে আসছে। সেই নাদ ধ্বনি—সেই প্রণব—ওঁকার। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে যে ধ্বনি আকাশে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল।

মাঝে মাঝে শিশু নিশ্চল হয়ে বিছানার উপর বসে থাকে। একটা গম্ভীর নিস্পন্দ অবস্থা। আবার কখনও কখনও দেখা যায় চোখ দুটি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, দূরে আগ্রহোদ্দীপক কোন কিছু যেন দেখছে। একটা রহস্যময় ভাব তাকে যেন ঘিরে রয়েছে। চিন্তিত হন স্নেহশীলা জননী। মনে পড়ে গুরুদেব *যোগীরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের এই পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী,—'মা জননি, তোমার ছেলে একটি যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের মত এ বহু লোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে।'

বাল্যকাল থেকেই যোগানন্দজী লাহিড়ী মহাশয়ের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলছেন, 'লাহিড়ী মহাশয়ের ছবিটি কিন্তু আমার জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে যোগিরাজের বিষয় চিন্তাও আমার বাড়তে লাগল। ধ্যানে বসে আমি প্রায়ই দেখতে পেতুম যে, তাঁর ফটোগ্রাফের মূর্তি ছবির ছোট ফ্রেম হতে বেরিয়ে একটি জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করে আমার সামনে এসে বসেছে। যেমনি সেই জ্যোতির্ময় দেহের চরণ স্পর্শ করতে হাত বাড়াতুম, অমনি তখনই তা বদলে গিয়ে আবার ফটোগ্রাফের ছবি হয়ে দাঁড়াত। শৈশব হতে

* যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী। জন্ম ১৮২৮ খৃঃ, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের গ্রামে। কাশীধামে বাস করতেন। এঁরই শিষ্য শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ ছিলেন যোগানন্দ পরমহংসের গুরু।

কৈশোরে উপনীত হয়ে দেখলুম যে, লাহিড়ী মহাশয় আমার মনের ফ্রেমে আঁটা একটা ছোট ছবি থেকে একটি জীবন্ত ভাবসঞ্চারী সত্তায় পরিণত হয়েছেন। সঙ্কটকালে ও বুদ্ধি বিপর্যয়ে আমি প্রায়ই তাঁর নিকট প্রার্থনা করতুম আর অন্তরে তাঁর সান্ত্বনাদায়ক অভয়বাণীর নির্দেশ পেতুম। আট বছর বয়সের সময় লাহিড়ী মহাশয়ের ফটোগ্রাফের কৃপায় আমার একবার অত্যাশ্চর্যভাবে রোগমুক্তি ঘটেছিল। এই ঘটনা আমার ভক্তি আরও গাঢ়তর করে তুলেছিল। বাংলা দেশে একবার আমাদের পৈতৃক ইছাপুরের বাড়ীতে থাকতে আমি দারুণ এসিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হই। জীবনের আর কোন আশাই রইল না। ডাক্তারেরা কিছুই করতে পারলেন না। রোগশয্যার পাশে বসে মা আমার মাথার উপর দেওয়ালে টাঙান লাহিড়ী মহাশয়ের ছবির দিকে ইঙ্গিতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য উন্মত্তের মত প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি জানতেন যে, আমি এত দুর্বল যে প্রণাম করবার মত হাত তোলবার ক্ষমতাও আমার নেই। তাই বললেন, 'মনে মনে প্রণাম কর। যদি তোমার আন্তরিক ভক্তি থাকে, আর মনে মনে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে পার, তাহলেই তুমি প্রাণে বেঁচে যাবে।'

আমি ফটোগ্রাফের দিকে চেয়েই রইলুম। হঠাৎ দেখলুম, সেখানে এক চোখঝল্‌সান উজ্জ্বল আলো, আমার সমস্ত শরীর আর ঘর ছেয়ে ফেললে। আমার বমির ভাব আর অন্যান্য প্রবল উপসর্গগুলি একেবারে অন্তর্হিত হল। আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলুম। গুরুর প্রতি মায়ের অপরিমেয় বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নেবার জন্য যথেষ্ট শক্তিও আমি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেলুম।

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকৃতির অলৌকিক শক্তি প্রভাবে আরোগ্য লাভের অল্পকাল পরেই আমার এক অপূর্ব প্রভাবান্বিত আধ্যাত্মিক দর্শন লাভ হয়।

একদিন সকাল বেলায় বিছানায় বসে থাকতে থাকতেই এক জাগর স্বপ্নে মগ্ন হলুম। বন্ধ চক্ষুর অন্ধকারের অন্তরালে কি আছে? এই মর্মসন্ধানী প্রশ্ন মনের গহনে প্রবলভাবে উদয় হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্চক্ষুর সামনে এক বিরাট জ্যোতির স্ফুরণ হল। পর্বতগুহার মধ্যে ধ্যানে উপবিষ্ট সাধু সন্তদিগের দিব্য মূর্তি সকল আমার ললাটের ভিতর প্রশস্ত জ্যোতিঃপটে সিনেমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ছবির মত প্রতিভাত হল। উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলুম, আপনারা কে? উত্তর এলো, 'আমরা সব হিমালয়ের যোগী।' সে স্বর্গীয় বাণী বর্ণনা করা কঠিন। হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলো। বললুম, আমারও অন্তরের একান্ত বাসনা যে, হিমালয়ে গিয়ে আপনাদের মত যোগী হই। দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার রজত রশ্মিরেখা ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকারে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে পড়তে লাগলো। প্রশ্ন করলুম, এই অপূর্ব আলোর ছটা কিসের? মেঘমন্দ্র-ধ্বনিতে উত্তর এলো, 'আমিই ঈশ্বর, আমিই জ্যোতি।' তারপর সেই স্বর্গীয় আনন্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো আমার অন্তরাকাশ হতে। আমি ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রেরণা লাভ করবার চির-উত্তরাধিকার খুঁজে পেলুম। তিনি শাশ্বত, তিনি চিরনবীন আনন্দ। এই স্মৃতি সেই পরমানন্দ লাভের দিন হতে বহুকাল স্থায়ী হয়েছিল।'

* * *

বাল্যকালেই মুকুন্দ মাতৃহারা হলো। মুকুন্দ তখন বেরিলীতে। মা এসেছেন কলকাতায় জ্যেষ্ঠ পুত্র অনন্তের বিবাহ উপলক্ষে। হঠাৎ বেরিলীর বাংলো বাড়ীতে মধ্য রাত্রে স্বপ্ন দেখলো মুকুন্দ। মা বলছেন, 'এক্ষুনি তোমার বাবাকে ডেকে তোল, আর আমায় যদি শেষ দেখা দেখতে চাও ত' ভোর চারটের গাড়ী ধরে কলকাতায় শীগ্‌গির রওনা হয়ে পড়।' পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হোল সে ছায়া মূর্তি। ঘুম ভেঙ্গে গেল মুকুন্দর। ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বাবাকে ডেকে তুললো। কাঁদতে কাঁদতে সবকিছুই বললো সে। পিতা ভগবতীচরণ সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করলেন পুত্রকে। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, সকালেই টেলিগ্রাম এলো, 'মাতা সাংঘাতিক পীড়িত, বিবাহ স্থগিত, এখনই চলে আসুন।' পিতা পুত্র বেরিয়ে পড়লেন কলকাতার পথে। কলকাতার বাড়ীতে পা দিয়েই হৃদয়বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হলেন উভয়েই। যোগানন্দের ভাষায়, 'আমার তখন মনে হতে লাগল যে, মাকে হারিয়ে মরুভূমির মত এই হঠাৎ অন্তঃসারশূন্য পৃথিবী আর আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। এ জগতে মাকেই আমি আমার সবার চেয়ে প্রিয় সাথী বলে ভাবতুম। তাঁর স্নেহকোমল সান্ত্বনামধুর কালো চোখ দুটি আমার শৈশবের তুচ্ছ ব্যথাবেদনার পরম আশ্রয়স্থল ছিল।'

স্নেহময়ী জননীর শ্রাদ্ধশান্তির পর কিশোর মুকুন্দ আবার ফিরে এলো বেরিলীতে পিতার সঙ্গে। মনের স্বাভাবিক স্থৈর্য ফিরে আসতে বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুতে পারিবারিক বন্ধনে এলো এক মহাশূন্যতা। পিতৃদেব মায়ের স্থান পূর্ণ করবার জন্য অবশ্য আরও স্নেহকোমল হয়ে উঠেছিলেন। এবং অবশিষ্ট চল্লিশ বছরের জীবনে আর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন নি। কিন্তু মাকে ভুলতে পারলো না কিশোর মুকুন্দ। মাতৃহারা কিশোরের অন্তরের আর্তক্রন্দনধ্বনি এসে পৌঁছালো ভগবানের চরণ প্রান্তে। জগজ্জননীর অভয়বাণী শুন্‌তে পেলো সে। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষা তাকে যেন পেয়ে বসলো। ঈশ্বর লাভের তীব্রতা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো। মাতৃপ্রেম ঈশ্বরপ্রেমে রূপান্তরিত হলো। ঈশ্বরপ্রেমের বন্যা তার অন্তরে মহাপ্লাবনের প্রবাহের মত প্রবাহিত হয়ে চললো। একটি মৃত্যু তার মনোজগতে চিন্তাস্রোতে জীবনধারায় এনে দিল আমূল পরিবর্তন। অবশ্য স্নেহময়ী জননীই ছিলেন কিশোর মুকুন্দের আধ্যাত্মিক জীবন লাভের প্রেরণা। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্রকে আশীর্বাদ স্বরূপ একখানি পত্র ও একখানি কবচ উপহার দিয়েছিলেন। কবচটি তিনি লাহোরে এক সাধুর নিকট থেকে অলৌকিক ভাবে লাভ করেছিলেন। এই কবচটি প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে পরমহংস যোগানন্দ বলেছিলেন, 'কবচটি পেয়ে যেন অন্তরে জ্ঞানাগ্নি শিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। বহু সুপ্ত স্মৃতি জাগরিত হলো। গোলমত পুরানো সেই অদ্ভুত ধরণের সুন্দর কবচটির উপর সংস্কৃত অক্ষরে কি সব খোদাই করা ছিল। আমি জানতে পেরেছিলুম যাঁরা অদৃশ্য ভাবে আমার জীবনপথে আমায় পরিচালিত করছিলেন, সেই সব পূর্বজীবনের গুরু মহারাজদের কাছ থেকেই সেটি এসেছিল। এর অন্য একটা উদ্দেশ্য বা অর্থ ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কবচের ভিতর যে কি আছে তা কেউ সম্পূর্ণ প্রকাশ করে বলে না। আমার জীবনের গভীর দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে কবচটি অন্তর্হিত হয় এবং গুরুলাভের সুচনা হয়।'

আশীর্বাদী পত্রে জননী লিখেছিলেন, 'আমার প্রিয় মুকুন্দ! এই কথাগুলিই তোমার কাছে আমার শেষ আশীর্বাদ। তোমার জন্মের

পর কতকগুলো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, তা বলবার এখন সময় এসেছে। আমার কোলে যখন তুমি নিতান্ত ছোট্ট শিশুটি তখনই তোমার জন্যে নির্দিষ্ট পথ যে কি, তা আমি প্রথম জানতে পারি। সে সময় আমি তোমায় একবার কাশীতে আমার গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট নিয়ে যাই। ···সর্বদর্শী গুরুদেব আমার প্রার্থনা পূর্ণ করায় আমার হৃদয় নেচে উঠলো। তোমার জন্মাবার কিছু আগেই কিন্তু তিনি আমায় বলেছিলেন যে, তুমি তাঁরই পথ অনুসরণ করবে। তারপর বাছা তোমার দিদি রমা আর আমি তোমার সেই বিরাট জ্যোতিঃদর্শনের কথা জানতে পারি। কারণ পাশের ঘর থেকে তোমায় বিছানার উপর নিশ্চল অবস্থায় বসে থাকতে দেখতে পেলুম, তোমার ছোট্ট মুখখানি স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। ঈশ্বর লাভের জন্য হিমালয়ে যাবার কথা বলবার সময় দেখলুম যে, তোমার কণ্ঠস্বরে লৌহকঠিন সঙ্কল্পের দৃঢ় প্রকাশ! এই সব রকমে বাছা আমি টের পেয়েছিলুম যে, তোমার পথ এইসব পার্থিব বাসনা কামনা হতে বহুদূর। তা ছাড়া আমার জীবনে সবচেয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা এ বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল। ঘটনাটি এমনই অলৌকিক যে, আমি আজ এই মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তোমায় তা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। সেটা হচ্ছে পাঞ্জাবে থাকতে একটি সাধুর দর্শনলাভ। তখন আমরা লাহোরে। একদিন সকালে বাড়ীর চাকরটা আমার ঘরে এসে বল্লে, 'গিন্নিমা, এক অদ্ভুত গোছের সাধু আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। তিনি বলছেন যে, তিনি মুকুন্দর মা'র সঙ্গে দেখা করতে চান।' এই নিতান্ত সরল আর সোজা কথাগুলি কিন্তু আমার হৃদয়তন্ত্রীতে গভীরভাবে আঘাত করলো। তৎক্ষণাৎ আমি সাধুটিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেলুম। পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতেই টের পেলুম—আমার সামনে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে। তিনি বল্লেন, মা সিদ্ধ পুরুষ মহাগুরুগণ তোমায় জানিয়ে দিতে চান যে, 'পৃথিবীতে তোমার অবস্থান আর বেশীদিন নয়। এর পরের অসুখই হবে তোমার শেষ অসুখ।' ···তোমার কাছে একটি রুপোর কবচ গচ্ছিত থাকবে······তোমার মৃত্যুশয্যায় তোমার বড়ছেলে অনন্তকে কিন্তু অবশ্য বলে যাবে যে কবচটি এক বছর তার কাছে রাখবার

পর যেন সে তোমার দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দকে সেটি দিয়ে দেয়। মুকুন্দ এর মর্ম মহাপুরুষদের কাছ থেকেই জানতে পারবে। পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা সব ত্যাগ করে সে যখন ঈশ্বরানুসন্ধানের জন্যে মনে প্রাণে প্রস্তুত হবে, প্রায় সেই সময় নাগাদ সে এটা পেয়ে যাবে। কবচটি কিছুকাল ধারণ করবার পর তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলেই কবচটি অন্তর্ধান করবে। যত গোপনীয় স্থানেই লুকিয়ে রাখ না কেন, কবচটি যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই আবার ঠিক ফিরে যাবে।······এখন অনন্তর হাতে দিলুম। আমার জন্য শোক কোরো না মুকুন্দ। গুরুমহারাজ আমায় অনন্তের কোলে নিয়ে যাবেন। চললুম বাবা, মা জগদম্বাই তোমায় রক্ষা করবেন।'

এইভাবে সেদিন একটি কিশোর হৃদয়ে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন তারই স্নেহময়ী জননী।

ধীরে ধীরে হিমালয়ের হাতছানি ক্ষুদ্র কিশোরটিকে উন্মত্ত করে তুললো। মহিমময় হিমালয়ের আকর্ষণ থেকে সে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে সক্ষম হোল না। সুযোগ পেলেই পালিয়ে যেতে চেষ্টা করতো হিমালয়ে। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কিশোর হিমালয়ে পলায়নের চেষ্টায় বারংবার বাধা পেলেও, কবচের পক্ষবিস্তারের সাহায্যে প্রত্যহ সে বহু দূরদূরান্তেই উড়ে বেড়িয়ে আসত! ধীরে ধীরে তার মনের গ্রন্থি, দৃষ্টির গ্রন্থি খুলে যেতে লাগলো। আধ্যাত্মিক নেত্র উন্মোচন করেই দেখল প্রথম হিমাদ্রিশিখরকে। আর হিন্দু যোগীদের চিরবিস্ময় মহিমময় হিমালয়ের আশ্রিত ধ্যাননিমগ্ন এক যোগীরূপে নিজেকে। তখন তার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠলো অপূর্ব এক রাগিণী। ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হলো কিশোর সাধক মুকুন্দ।

অবশেষে একদিন উত্তর ভারত থেকে পিতৃদেব চলে এলেন কলকাতায়। তাঁর কর্মক্ষেত্র হলো কলকাতা শহর। স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন চার নম্বর গড়পার রোডের বাড়ীতে। মুকুন্দের লেখাপড়া শুরু হোল হিন্দু হাইস্কুলে। দিন, সপ্তাহ, মাস, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হতে লাগলো, কিন্তু হিমালয়ের চিন্তা মন থেকে মুছে গেল না। এই সময়ের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যোগানন্দ বলছেন, 'স্বপ্নে যাঁর মুখ প্রায়ই দেখতে পেতুম, সেই গুরুকে হিমালয়ের তুষারের মধ্যেই খুঁজে পাব বলে মনে আশা হয়েছিল।

গড়পারের বাড়ীর একটি চিলেকোঠায় আমি নিত্যনৈমিত্তিক ধ্যান-ধারণা আর ঈশ্বর লাভের সাধনায় মনকে নিয়োজিত করে রাখতুম।'

এই সময়ে পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করে লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য পিতৃদেব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কে তার সংস্কৃত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। উদ্দেশ্য, পুত্রের চরিত্রগঠন ও শিক্ষালাভ। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাধু প্রকৃতির মানুষ এবং লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য। ইনিই পরবর্তী জীবনে স্বামী কেবলানন্দ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী 'শাস্ত্রী মহাশয়' ভবিষ্যতের স্বামী কেবলানন্দজীকে ঋষি আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। এই মহাত্মা পণ্ডিতপ্রবরের সান্নিধ্যে এসে কিশোর মুকুন্দের সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভের চেয়ে ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার তীব্রতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। যোগীরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের নানা কাহিনী মুগ্ধচিত্তে শুনতো ছাত্র মুকুন্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখ থেকে। এই প্রসঙ্গে যোগানন্দ বলছেন, 'আমার নবনিযুক্ত শিক্ষকটি, বৌদ্ধিক শুষ্কতার পরিবর্তে আমার অন্তরের ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে পবন সঞ্চার করলেন। পিতার কিন্তু জানা ছিল না যে, স্বামী কেবলানন্দজী লাহিড়ী মহাশয়ের একজন উন্নত শিষ্য।

কেবলানন্দজীর সুন্দর মুখখানি কোঁকড়ান চুলে ঘেরা। তাঁর কালো চোখ দুটি শিশুর ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল। তাঁর সুকুমার দেহের গতি একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্যের দ্বারা সংযত। চিরশান্ত ও স্নেহময় তিনি আত্মজ্ঞানে সুসমাহিত। গভীর ক্রিয়াযোগ অভ্যাসে তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে কাটতো।

সংস্কৃত বিদ্যায় আমার পণ্ডিত হওয়া কখনও ঘটে উঠে নাই বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যায় কেবলানন্দজী আমায় আরও উচ্চতর ঐশ্বরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেছিলেন।'

'ঈশ্বরই সরল আর সবই জটিল। আপেক্ষিক প্রাকৃতিক জগতে কোন পরম মান খুঁজতে যেয়ো না।' বললেন একজন পরিব্রাজক সাধু মুকুন্দকে কালীঘাটের কালীমন্দিরে। কালীমন্দিরে কালীমাতাকে যখন দর্শন করছিলো মুকুন্দ তখনই পাশ থেকে মুকুন্দকে উদ্দেশ করেই সাধুটি এই কথা বললেন। মুকুন্দও মৃদু হেসে কৃতজ্ঞ হয়ে বললো, 'সত্যিই আপনি আমার মনের জটিল

চিন্তারাশির মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন। প্রকৃতির রুদ্র আর প্রসন্ন এই দুইভাব মূর্ত হয়েছে কালীপ্রতিমার মধ্যে। কিন্তু তাদের বৈপরীত্য আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী গুণীদেরও বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়েছে।' ধীর গম্ভীরস্বরে সাধুটি আবার বলতে শুরু করলেন, 'অতি অল্প লোকই আছেন যাঁরা তার রহস্য ভেদ করতে পারেন। শুভাশুভ এই দুই ভাবের দুর্ভেদ্য প্রহেলিকায় মানুষের জীবন সকল লোকের বুদ্ধির কাছে যেন এক বিরাট রহস্যের সৃষ্টি করে। এর সমাধানের কোন চেষ্টা না করে অধিকাংশ লোক তাদের জীবন বৃথাই ব্যয় করে। মান্ধাতার আমল হতে, এমন কি আজ পর্যন্তও লোকে সেই দণ্ডই দিয়ে আসছে। এক আধজন হয়ত তাদের বিরাট ব্যক্তিত্বের জোরে কথনও পরাজয় মান্‌তে চায় না। দ্বৈত মায়াবাদের মধ্যে হয়ত বা সে অদ্বৈতবাদের অখণ্ড সত্যের সন্ধান পায়।'

* * *

'বহুদিন ধরে অকপটভাবে জ্ঞানরাজ্যে অন্তর্দর্শনের অনুশীলন করে দেখেছি, প্রবেশের পথ দারুণ কঠিন। আত্মপরীক্ষা আর চিন্তায় নির্মম শুদ্ধির কৃচ্ছ্রসাধনায় কঠিন আর দারুণ অভিজ্ঞতা জন্মে। প্রবল আত্মাভিমানকে চূর্ণ করে দেয়। সত্যিকারের আত্মবিশ্লেষণেই কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে সত্যদ্রষ্টার ভাব আনয়ন করে।'

* * *

'মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ব্যক্তিগত সংস্কার হতে মুক্ত হতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষের মন যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কারের পলিমাটিতে আবৃত, সংখ্যাতীত জগৎমায়ার অধীন নিরানন্দ জীবনের নিষ্ফলতায় পরিপূর্ণ। মানুষ যখন তার অন্তঃশত্রুর সঙ্গে লড়াই শুরু করে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ লড়াই তখন তার কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। দুর্ধর্ষ শারীরিক শক্তিতে পরাজিত হবার মত মরজগতের শত্রু এরা নয়। সর্বত্রই সজাগ দৃষ্টি, নিরন্তর নিরলস থেকে মানুষকে এরা স্বপ্নেও অনুসরণ করে। ভীষণ আর মারাত্মক রকমের অস্ত্রশস্ত্রে গুপ্তভাবে সজ্জিত হয়ে অন্ধ কামনার এই সব সৈন্যের দল আমাদের হত্যা করবার সুযোগ অনবরত খুঁজে বেড়ায়। অদৃষ্টের কাছে যে আত্মসমর্পণ

করে তার আদর্শের অপমৃত্যু ঘটায়, সে নিতান্তই দুর্বুদ্ধি আর কি !.........
তবে অন্তরের মধ্যে খুঁজে দেখলে মানুষের মন যা স্বার্থবুদ্ধিজড়িত, তার মধ্যেও একটা ঐক্যের ভাব খুঁজে পাওয়া যায়। এক হিসেবে অবশ্য মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিচয় মেলে। এবং এই ভাবধারার মধ্য দিয়েই একটা উদার দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।' তারপর হঠাৎ মৃদু হেসে বললেন, 'ইঁটকাঠে মনে কোন সাড়া জাগে না, হৃদয় কেবল প্রাণের সুরেই উন্মুক্ত হয়।' আবার উপদেশচ্ছলে মুকুন্দকে লক্ষ্য করেই বল্লেন, 'তুমি শিশু, ভারতবর্ষও শিশু! প্রাচীন মুনি-ঋষিরা আধ্যাত্মিক জীবনের অক্ষয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাঁদের সনাতন প্রথা অধুনাতন দেশ ও কালের পক্ষেও যথোপযুক্ত। জড়বাদের মোহে আচারভ্রষ্ট আর বিকৃত না হয়ে সেই সব ধর্মানুশাসন বা তার উপদেশাদি এখনও ভারতবর্ষকে গড়ে তুলছে। হাজার হাজার বছর ধরে বিপর্যস্তবুদ্ধি পণ্ডিতেরা যার মূল্যায়ন করতে পাবেন নি, সন্দেহপ্রবণ সেই কালের বিচারে বেদের মূল্য আজ নিরূপিত হয়ে গেছে। এইটেই তোমার উত্তরাধিকার বলে গ্রহণ করো।' মুকুন্দকে উপযুক্ত আধার মনে করেই বোধ হয় সেই অপরিচিত জ্ঞানী সাধুটি উপদেশ দান করেছিলেন এবং ইঙ্গিত করেছিলেন 'বেদ'-কেই জীবনবেদ রূপে গ্রহণ করতে। তারপরেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কালীঘাট থেকে ঘরে ফেরবার পথে আকস্মিক-ভাবে সাক্ষাৎলাভ হলো 'গন্ধবাবা'র সঙ্গে। তিনি নিকটেই এক ভক্তগৃহে অবস্থান করছিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দই 'গন্ধবাবা' নামে পরিচিত ছিলেন। কাশীধামে বাস করতেন। আশ্রম ছিল। তিনি অলৌকিকভাবে নানারকমের গন্ধ সৃষ্টি করতেন, নানা প্রকারের জিনিসও তৈরী করতে পারতেন। তাঁকে প্রথম দর্শন করে যোগানন্দ বলছেন, 'গন্ধবাবা বাঘছালের উপর বসে রয়েছেন। তাঁর চঞ্চল দৃষ্টি আমার উপর স্থির হয়ে দাঁড়ালো। শ্যামবর্ণ নধর দেহটি শ্মশ্রুবিশিষ্ট, চক্ষু দুটি বেশ বড় বড় আর উজ্জ্বল। বললেন, বাবা, তোমায় দেখে খুব খুশী হয়েছি।'

কিন্তু গন্ধবাবা প্রদর্শিত অলৌকিক কার্যাবলী মুকুন্দের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। পরবর্তীকালে যোগানন্দ বলেন, 'কালীঘাটের সেই নিরপেক্ষ সাধু ও তিব্বতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই যোগী 'গন্ধবাবা'

কেউই আমার গুরু অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি এনে দিতে পারেন নি।'

সাক্ষাৎ করলো সে সোঽহং স্বামীর সঙ্গে, স্বামী প্রণবানন্দ, লঘিমা-সিদ্ধ সাধু শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ও মাষ্টার মহাশয়ের (কথামৃত রচয়িতা শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত) সঙ্গে—সকলের নিকট হতেই লাভ করলো আধ্যাত্মিক প্রেরণা কিশোর মুকুন্দ। কিন্তু স্বপ্নজগতের সেই গুরুদর্শন আর মিললো না। দিনে দিনে গুরুলাভের আকাঙ্ক্ষা কিশোর প্রাণে তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক ভাবেরও অপূর্ব বিকাশ হতে লাগলো তার সারা দেহ-মনে। সাধু নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে যোগানন্দ বলেন, 'স্কুলের ছুটির পর সেই সাধুর কাছে আমার প্রত্যহই যাতায়াত চলতে লাগলো। নীরব উৎসাহ দানে তিনি আমায় প্রত্যক্ষ অনুভব লাভে সাহায্য করতেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত মাষ্টার মহাশয়ও অপার স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন কিশোর মুকুন্দের মনকে।

এক শুভদিনে সাঙ্গ হলো হিন্দু হাইস্কুলের ছাত্রজীবন। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মুকুন্দ পিতৃদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলো। আর সেই সঙ্গে জানালো কাশীধামের মহামণ্ডলের আশ্রমে যোগদান করবে সে, আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য। অবশেষে পিতার অনিচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি সংগ্রহ করে বন্ধুবর জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো সে কাশীধামের পথে। আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ। দীর্ঘকায়, কৃশ আকৃতি-বিশিষ্ট চিন্তাশীল স্বামীজী মহারাজের প্রতি মুকুন্দের মনে অনুকূল ধারণারই উদয় হলো। স্বামীজীর সুন্দর মুখের উপর বুদ্ধদেবের ন্যায় একটা ধ্যান-স্তিমিত গভীর প্রশান্তির ভাব মুকুন্দের সরল পবিত্র প্রাণের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আশ্রমিকদের সঙ্গে তার মতান্তর ঘটলো এবং মতান্তর ক্রমে ক্রমে মনান্তরে পরিণত হলো। ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পরিবর্তে সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাইল না মুকুন্দ। আর তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ তাকে স্বামী দয়ানন্দের আশ্রম ত্যাগ করতে হলো। এই সময়েই অকস্মাৎ একদিন কাশীর পথে সাক্ষাৎলাভ হলো এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর সঙ্গে। বিস্মিত

অভিভূত ও হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মুকুন্দ সেই সৌম্যদর্শনের মুখের দিকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হলো 'গুরুদেব'! তাঁর পরিচয়ের জন্য কোন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয় নি। মনে ভাবের উত্তাল তরঙ্গ, মুখে কোন উত্তর যোগাল না। যোগানন্দের ভাষায়, 'সেই মূর্তি আমার হাজার স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া তাঁর দিব্যমূর্তি ছাড়া ত' আর কারুর নয়! ঐ শান্ত স্নিগ্ধ দুটি চোখ, সিংহের মত উঁচু মাথা, ছুঁচলো দাড়ি, আর বাবরি চুল—এ ত' প্রায়ই আমার নৈশ স্বপ্নের অন্ধকার ভেদ করে উঁকি মারত, আর কি যে ইঙ্গিত করতো তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারতুম না। আমার গুরুদেব আনন্দকম্পিত স্বরে বার বার বলতে লাগলেন, "আমার কত আপনার তুমি, আজ আমার কাছে এলে। কত বছর ধরে যে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।" পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে তখন আমরা দু'জনে এক হয়ে গেছি। কথা বলা যেন তখন নিতান্তই বাহুল্য মাত্র।' গুরুর অন্তর থেকে শিষ্যের কাছে নীরব ভাষায় যেন বাক্যের স্রোত অবিরাম ভাবেই বয়ে যেতে লাগলো। 'অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির বেতারে জানতে পারলুম যে আমার গুরু ভগবানকে লাভ করেছেন আর আমাকেও তাঁর সন্নিধানে নিয়ে যেতে পারবেন। এ জীবনের অন্ধ তমিস্রা প্রাক্‌জীবনের স্মৃতি মৃদু উষার আলোকে অন্তর্হিত হলো। একটা নাটকীয় মুহূর্ত! অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যেন এর ঘূর্ণ্যমান দৃশ্যাবলী! সেই চরণযুগলে যেন এই আমার প্রথম প্রণতি নয়। আমার হাত ধরে তিনি কাশীর রাণামহলে তাঁর বাসা বাড়ীতে নিয়ে চললেন। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ আর দৃঢ়পদবিক্ষেপে তিনি অগ্রসর হলেন। বাড়ীটি গঙ্গার উপরে। দোতলার পাথরের বারান্দায় গিয়ে বসতে সস্নেহে তিনি বললেন, 'দেখ, আমার আশ্রম আর যা কিছু আছে সবই তোমায় দিয়ে দেব, বুঝলে?'

—আমি জ্ঞানলাভ আর ঈশ্বরোপলব্ধির আশায় ঘুরছি। ঐ সব ধনরত্নের উপরই আমার লোভ, অন্য কিছুতে নয়। বললো মুকুন্দ।

মনে মনে খুশী হলেন সন্ন্যাসিপ্রবর। তারপর—স্নেহমধুর কণ্ঠে বললেন, 'তোমায় আমি আমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিলুম।' শিশুর মত সরল বিশ্বাসে আমায় জিগগেস করলেন, 'তুমি কি আমায় ঐ রকমই ভালবাসা দিতে পারবে, বল?'

—'গুরুদেব। চিরকালই আমি আপনাকে ভক্তি করব।' নম্রমধুর স্বরে তিনি বললেন, 'সাধারণ ভালবাসা স্বার্থময়, কামনা বাসনা পরিতৃপ্তির গাঢ় অন্ধকারের ভিতরই এর মূল দৃঢ় হয়ে থাকে। স্বর্গীয় ভালবাসা প্রতিদান চায় না। সীমাহীন বাধাবন্ধনহীন এর কোন পরিবর্তন নেই। অনাবিল প্রেমের পরশমণির ছোঁয়ায় এর সব আবিলতা চিরতরে দূর হয়ে যায়।'

'ওঁর সঙ্গে কথাবার্তার ভিতর দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারেই তিনি আমার প্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়ে বসলেন। অন্তরের বিনয়নম্র ভাবের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানের বিরাট ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম।'

এই মহাপুরুষই হলেন স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ। বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য। প্রধান আশ্রম শ্রীরামপুর, বায়ঘাট লেনে। কাশীধামে এসেছেন বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করতে।

এবারে কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য প্রকাশ করে বললেন, 'বৎস, তোমাকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হতে হবে। লেখাপড়া শিখতে হবে। ভবিষ্যতের প্রয়োজনে। আর তোমার আত্মীয়-স্বজনদেরই বা তোমার বিশ্বপ্রেম থেকে বঞ্চিত করবে কেন বল?'

প্রত্যুত্তরে মুকুন্দ কলকাতায় ফিরে যেতে অস্বীকার করলেও, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সে শ্রীরামপুর আশ্রমে এসে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। গুরুদেব তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করতে আদেশ করেন। বল্লেন, 'একদিন তোমায় হয়ত পশ্চিমে যেতে হবে। সেখানকার লোকেরা ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয় খুবই মন দিয়ে শুনবে যদি তারা দেখে যে, সেই হিন্দু গুরুর কোন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী আছে, বুঝলে?'

পশ্চিমে যাওয়ার ইঙ্গিত কিশোর মুকুন্দের কাছে দুর্জ্ঞেয় আর রহস্যময় বলেই বোধ হোল। তবুও গুরুদেবের সন্তোষ বিধানই হোল তার জীবনের একমাত্র কাজ। তাইতো কলকাতায় ফিরে কলেজে ভর্তি হওয়ার স্বীকারোক্তি করলো। তারপর বললো, 'গুরুদেব, আমার জীবনের উপর আপনার সর্বময় কর্তৃত্ব আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে মানতে পারি—কেবল একটি মাত্র সর্তে।'

'কি বল ?'

'আপনি আমায় ভগবানের দর্শন লাভ করিয়ে দেবেন বলুন ?'

'তুমি দেখছি নেহাৎই নাছোড়বান্দা।' সস্নেহ কণ্ঠে বল্লেন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ, 'বেশ তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।'

আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হলো কিশোর যোগী মুকুন্দের মন। মনে মনে বললো, 'আজ আমি প্রকৃত সদ্‌গুরুর চরণে চির আশ্রয় লাভ করলুম।' এক অন্ধকার যবনিকা তার মন হতে অপসৃত হোল। তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো এক স্বর্গীয় প্রশান্তির ছায়া। অনির্বচনীয় এক ভাব নিয়ে হারিয়ে যাওয়া কিশোর মুকুন্দ আবার ফিরে এলো কলকাতায়—গড়পারের বাড়ীতে পিতৃসন্নিধানে। পিতৃদেব পুত্রকে ফিরে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সবকিছু শুনে সস্নেহে বললেন, 'বাবা, আমরা দুজনেই আজ সুখী। আমি যেমন দৈবক্রমে আমার গুরু খুঁজে পেয়েছিলুম, আজ তুমিও তেমনি তোমার গুরু খুঁজে পেয়েছো। লাহিড়ী মহাশয়ের পুণ্যহস্তই আমাদের জীবন রক্ষা করে চলেছে। তোমার গুরুদেব হিমালয়ের কোন দুর্লভ সাধু নন। নিতান্তই কাছের লোক। আজ আমার প্রার্থনা সফল হয়েছে। তুমি ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে চিরতরে আড়াল হয়ে যাও নি।' পরদিনই স্কটিশ চার্চ কলেজে পুত্রকে ভর্তি করে দিলেন। শুরু হোল মুকুন্দের কলেজীয় শিক্ষা জীবন।

এই সময়ের কথা বর্ণনা করছেন যোগানন্দ। স্বামী যোগানন্দের ভাষায়, 'সময় খুব সুখেই কাটতে লাগল। আমার পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই অনুমান করে বসেছেন যে, কলেজের ক্লাসে আমার অতি অল্পই দর্শন মিলত। শ্রীরামপুরের আকর্ষণ আমার কাছে দুর্নিবার। গুরুদেব আমার অবারিত উপস্থিতিতে কোন রকম প্রশ্ন করতেন না। পরম আশ্বাসের কথা যে, তিনি কলেজের কথা কদাচিৎ উত্থাপন করতেন। যদিও সকলে পরিষ্কার জানতো যে পণ্ডিত হবার জন্য আমি গঠিত হই নি। তবুও মাঝে মাঝে অন্ততঃ পাশ মার্ক রেখে চলতুম।'

গুরু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ ধীরে ধীরে কিশোর মুকুন্দকে ধ্যান-ধারণা ও ক্রিয়াযোগের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে লাগলেন। একই সঙ্গে

চললো কলেজীয় শিক্ষার অনুশীলন। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে যুক্তেশ্বর গিরিজী ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির আর আচরণেও ছিলেন খাঁটি। কোন কিছুতে অস্পষ্টতা বা স্বপ্নালুতা ছিল না। করিৎকর্মা লোকদের তিনি প্রশংসাই করতেন। বলতেন, 'সাধুগিরি মানে এ নয় যে, বোবা হয়ে থাকতে হবে। ঈশ্বরানুভূতি হলে অকর্মণ্য হয়ে থাকতে হয় না। সদ্‌গুণাবলীর প্রত্যক্ষ প্রকাশেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিকাশ হয়। আত্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে তিনি অলৌকিক কোন কিছু দেখান না যতক্ষণ না মনের ভিতর থেকে কোন সায় পান। ভগবান তাঁর সৃষ্টিরহস্য যত্রতত্র প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন না। আর তাছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। কোন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি সেই স্বাধীনতার উপর কখনও হস্তক্ষেপ করেন না।' গুরুদেব প্রসঙ্গে বলছেন যোগানন্দ, 'শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পুণ্যপাদস্পর্শে সর্বদাই আমার এক অপূর্ব পুলক শিহরণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো।' গুরুর সহিত ভক্তিপূতস্পর্শে শিষ্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর সর্বশরীরে একটা সূক্ষ্ম তড়িৎপ্রবাহ জন্মায়। ভক্তের মস্তিষ্কে অনভীপ্সিত অভ্যাসের যন্ত্রগুলি যেন প্রায়ই আগুনে পুড়ে গিয়ে পবিত্র অগ্নিশুদ্ধ হয়ে যায় আর সাংসারিক প্রবৃত্তির যে সব বিচিত্র রেখা থাকে, তখন তাদের কল্যাণকর পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্ততঃ সাময়িকভাবেও সে দেখতে পায় যে, মায়ার আবরণ অপসারিত হয়ে যাচ্ছে আর পরমানন্দের আভাস সে পাচ্ছে। 'গুরুদেবের চরণতলে যখনই গিয়ে নতজানু হয়ে পড়তুম তখনই মনে হোত যে, আমার সর্বশরীর যেন মুক্তির জ্যোতিঃধারায় স্নান করে উঠে এক অপূর্ব উদ্দীপনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

* * *

'তাঁর সঙ্গে থেকে প্রতিদিনই নব নব জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতুম। তাঁকে আমি কখনও বিভ্রান্ত অথবা লোভ ক্রোধ কিংবা কোন আসক্তির ভাবাবেগে উত্তেজিত হতে দেখি নি। 'মায়ার অন্ধকার নীরবে ঘনিয়ে আসছে। চল এবার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করা যাক।' এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তিনি শিষ্যদিগকে তাদের ক্রিয়াযোগ সাধনের

প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে কোন নতুন শিষ্য যোগাভ্যাসে তার নিজের যোগ্যতার বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করলে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, 'অতীতের কথা একদম ভুলে যাও। সব লোকেরই অতীত জীবন কোন না কোন লজ্জা বা গ্লানিতে অন্ধকার হয়ে আছে। মানুষের প্রকৃতি একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানে দৃঢ়মূল হয়। তুমি যদি এখন থেকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা শুরু কর, তাহলে ভবিষ্যতে তোমার সর্ববিষয়েই উন্নতিলাভ হবে জেনে রেখো।' গুরুদেব দ্রুত ইংরাজী ফরাসী বাংলা ও হিন্দী বলতে পারতেন। সংস্কৃতেও তাঁর বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী আর সংস্কৃতে তাঁর নিজ উদ্ভাবিত কতকগুলি সরল পদ্ধতিতে তিনি তরুণ শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন।

দেহের প্রতি গুরুদেবের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না সত্য, কিন্তু শরীর সম্বন্ধে তিনি সতর্ক থাকতেন। তিনি বলতেন, 'ভগবানের সুষ্ঠু প্রকাশ শারীরিক আর মানসিক সুস্থতার ভিতর দিয়েই।' কোন কিছুর আতিশয্য তিনি পছন্দ করতেন না। একবার এক শিষ্য খুব লম্বা এক উপবাস শুরু করেছিল। তাই না দেখে গুরুদেব হেসে বল্লেন, 'আহা, ওটাকে একমুঠো কেউ খেতে দাও না কেন?'

'শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের গুণাবলীর জীবন্ত যোগসূত্র হবার জন্য শিষ্যদের সর্বদাই উপদেশ দিতেন। বাইরের আচার ব্যবহারে তিনি নিজে একজন সক্রিয় পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন হলেও, অন্তরে তিনি প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদীই ছিলেন। প্রতীচ্যের প্রগতিশীল প্রয়োজনীয় আর স্বাস্থ্য-সম্মত অভ্যাসের আর প্রাচ্যের বহু শতাব্দীর গৌরবচ্ছটামণ্ডিত জ্ঞানভাস্বর ধর্মের আদর্শের তিনি প্রশংসা করতেন।'

গিরিজী প্রায়ই গম্ভীর হয়ে থাকলেও মুখ কখনও অন্ধকার করে থাকতেন না। বলতেন, 'ভগবানকে লাভ করতে গেলে মানুষের মুখ-বিকৃতির প্রয়োজন হয় না। স্মরণ রেখো যে, ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানেই সকল দুঃখের অগ্নিসংকার।'...'শক্তি সঞ্চয় করে যাও। বিশাল সমুদ্রের মত হও। ইন্দ্রিয়বোধের নদীপথে যা কিছু ভেসে আসছে নীরবে তোমার ভিতর একেবারে তলিয়ে যাবে।.. ...আত্মসংযমের শক্তিতে সিংহের মত

এ জগতে ঘুরে ফিরে বেড়াবে। দেখো যেন ইন্দ্রিয়ের প্রতি দুর্বলতার ব্যাঙগুলো তোমার চারধারে লাফালাফি করে বেড়ায় না।'

দিবসের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ অতি ধীরে ওঠে নামে। সীমাহীন মহাসমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মত দিন আসে রাত্রি যায়, অনিবার্য ছন্দের শৃঙ্খলে বাঁধা। সপ্তাহ শেষ হয়, মাস চলে যায়, দুটি বছরও অতিক্রান্ত হয় মুকুন্দের জীবনে, আবার আসে নূতন বছর। নূতন দিন।

স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে শ্রীরামপুর কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলো সে। গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীরই নির্দেশে। তিনি নবীন সাধক মুকুন্দকে একদিন বল্লেন, 'তোমার কলকাতার পড়া এখন শেষ হলো। এবার তুমি শ্রীরামপুরে থেকেই বাকী দু'বছর কলেজে পড়বে।' আর সেই বছরই প্রথম ইউনিভার্সিটি থেকে শ্রীরামপুর কলেজে বি. এ. ক্লাস খোলবার অনুমতি পেলো কলেজ কর্তৃপক্ষ। অভাবনীয় ঘটনা।

মুকুন্দও উৎফুল্ল চিত্তে বলে উঠলো, 'গুরুজী, আমার ওপর আপনার কি অসীম দয়া! কতদিন থেকে ভাবছি যে কলকাতা ছেড়ে কবে যে আপনার কাছে দিনরাত থাকতে পারবো!'

শ্রীরামপুর কলেজে প্রবেশ করেই গঙ্গার ধারে একটি বোর্ডিং হাউসে ঘর নিল মুকুন্দ। বাড়ীটির নাম ছিল 'পন্থী'। গিরিজীর আশ্রমের সন্নিকটে। মুকুন্দ প্রত্যহই গুরুদেবের আশ্রমে যাতায়াত করতে গিয়ে কলেজের ক্লাসে উপস্থিতির আর বিশেষ সময় পেতো না। ক্লাসে তার আবির্ভাবই ছেলেদের মধ্যে বেশী বিস্ময়ের উদ্রেক করতো। ধীরে ধীরে তার আচার আচরণে কলেজের বন্ধুদের কাছে সে পাগলা সন্ন্যাসী বলেই পরিচিত হয়ে উঠলো।

এই সময়ের জীবনের দৈনন্দিন কর্ম প্রসঙ্গে বলছেন যোগানন্দ, 'আমার দৈনন্দিন প্রথা ছিল সকালে সাড়ে ন'টার সময় বাইসাইকেলে চড়ে বেরিয়ে পড়া। একহাতে থাকত গুরুদেবের জন্য কিছু শ্রদ্ধার্ঘ্য—আমাদের 'পন্থী' ছাত্রাবাসের বাগানের গুটিকতক ফুল। মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করে গুরুজী দুপুরে খেতে আমায় ডাকতেন। সেদিনের কলেজের চিন্তা উড়িয়ে তৎক্ষণাৎ তা সানন্দে গ্রহণ করতুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শ্রীযুক্তেশ্বর

গিরিজীর সঙ্গে থেকে তাঁর অননুকরণীয় জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করে বা আশ্রম কর্তব্য সকল পালনে কিছু সাহায্য করে মাঝরাতের কাছাকাছি নিতান্তই অনিচ্ছুক মনে 'পন্থী'র দিকে ফিরে চলতুম। মাঝে মাঝে হয়ত বা সারারাতই কেটে গেছে গুরুসঙ্গলাভে। কথাবার্তার আনন্দে চিত্ত এত গভীরভাবে নিবিষ্ট হত যে, রাত্রের অন্ধকার কেটে গিয়ে কখন যে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে তা টেরই পেতুম না।'

এইভাবে দিনের পর দিন ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করে আশ্রমিক কর্ম করেও বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো 'পাগলা সন্ন্যাসী' মুকুন্দ। ১৯১৪ সালের জুন মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করলো সে। গুরুদেব প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন শিষ্যকে। পিতৃদেবও উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন, 'মুকুন্দ, তুমি তোমার গুরুর সঙ্গে এত সময় কাটাও যে, তুমি যে আদৌ পাশ করতে পারবে তা মোটেই ভাবতে পারিনি।' তারপর গ্রাজুয়েট পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। পুত্রও নতজানু হয়ে উভয়কেই প্রণাম করেছিলেন।

পিতৃদেব যখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে পুত্রের চাকুরীর জন্য ব্যবস্থা করছিলেন, সেই সময়ে পুত্রও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। জীবনে ঈশ্বর গৌণ বা অপ্রধান স্থান অধিকার করে থাকবে এ চিন্তাই ছিল তার কাছে অকল্পনীয়। একদিন আকুল হয়ে সে ছুটে গেলো যুক্তেশ্বর গিরিজীর নিকট। মনের কথা সবকিছু খুলে বললো সে। মৃদু হেসে বললেন গিরিজী, "হ্যাঁ ঠিকই তোমায় সন্ন্যাস দেব। আমার গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বলতেন, 'জীবনের বসন্তে যদি তুমি ভগবানকে ডেকে না আন, তবে তোমার জীবনের শীতে তিনি আসবেন কেন বল ?'"

আর একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠলো নবীন সাধক মুকুন্দের জীবনে। মনে তার সুবিপুলতার বিস্তার, মুখে তার অনন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ইংরাজী ১৯১৪ সালের জুলাই মাসের এক বৃহস্পতিবার দিন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের নিকট থেকে শ্রীরামপুর আশ্রম বাড়ীতে মুকুন্দ সন্ন্যাসীর দীক্ষা গ্রহণ করলো। নূতন নাম হলো 'যোগানন্দ'। গিরি মহারাজ বললেন, 'আজ থেকে তুমি সাংসারিক জীবনের নাম মুকুন্দলাল ঘোষ পরিত্যাগ করে স্বামী সম্প্রদায়ের গিরি উপাধি নিয়ে 'যোগানন্দ' নামে অভিহিত হবে।'

স্বামী যোগানন্দ গিরিই পরবর্তী জীবনে গুরুকর্তৃক 'পরমহংস যোগানন্দ' নামে অভিহিত হলেন। পরমহংস যোগানন্দ হলেন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। গিরিজী একখণ্ড সাদা সিল্ক গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত করলেন। সন্ন্যাসীর বসন। শুকিয়ে গেলে সেই সন্ন্যাস বস্ত্র দিয়ে নবীন সন্ন্যাসী যোগানন্দের সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে দিয়ে বল্লেন, 'একদিন তোমায় পশ্চিমে যেতে হবে, যেখানে সিল্কই লোকে বেশী পছন্দ করে। প্রচলিত সূতোর কাপড়ের বদলে নিদর্শনস্বরূপ তোমার জন্যে অমি এই সিল্কই বেছে নিয়েছি। সিল্ক শরীরের সূক্ষ্ম শক্তি-প্রবাহ রক্ষা করে।'

*　　*　　*

রাত্রির তমসা ভেদ করে ফুটে ওঠে উষার আলো। নবজীবন লাভ করেন তরুণ সন্ন্যাসী মুকুন্দলাল ঘোষ—স্বামী যোগানন্দ গিরি রূপে। তাঁর নিজ অন্তরের প্রতিটি স্পন্দনে স্পষ্ট অনুভব করলেন, আকাশলোকের আলোকে কোন ধর্মভেদ নেই। সে আলোক ত' পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ ও জীবের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে সমভাবে। তবুও মানুষ কেন নানা সম্প্রদায়গত গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে পূর্ণ বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে রাখছে? নিজের মনকে সঙ্কীর্ণ করে তুলছে? তাইতো সেই মহাসত্যের আলোকের ধারায় ধুইয়ে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের পদ্মকোরককে। আর এই মহাসত্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ভারতের সনাতন ধর্ম থেকে, বেদান্ত থেকে—যা কোন জাতিগত মতবাদ ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভারতীয় সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন উদারতা ও তার মহাসত্য উদাত্ত গম্ভীর স্বরে বিশ্বলোকের নিকট অতীতে যে আহ্বান বাণী প্রেরণ করেছিল, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'..............তারই বার্তা সমুদ্রপারের মানুষদের কাছে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন স্বামী যোগানন্দ।

গুরু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিও প্রেরণা দিতে লাগলেন শিষ্যপ্রবর যোগানন্দকে। ধীরে ধীরে তিনি শিষ্যকে প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে লাগলেন। সেই সৎ বস্তুর—মহাসত্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করাবার জন্য শিষ্যকে তিনি 'ক্রিয়াযোগ' শিক্ষা দিতে লাগলেন। যোগবিজ্ঞানের দিকে তাঁকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট

করলেন। মনঃসংযোগ আর ধ্যানের সরল ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যোগদাপ্রণালীর মাধ্যমে শরীর ও মনকে গঠন করা এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন —যার ফলে জীবনের অনেক কিছু জটিল সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করা সম্ভব হবে। কঠোর যোগসাধনার মধ্য দিয়ে স্বামী যোগানন্দের নৈতিক চরিত্র সুদৃঢ় হয়ে উঠলো, আত্মবিশ্বাসী হলেন এবং ক্রিয়াযোগের চাবিকাঠি দিয়েই যে মানুষ পূর্ণদেবত্ব লাভে সক্ষম হতে পারে এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। আর এই জীবনাদর্শ যে শুধুমাত্র প্রাচ্যের মানুষের পক্ষেই তা নয়, প্রতীচ্যের যোগসাধনেচ্ছুদের পক্ষেও পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণযোগ্য। পরবর্তী জীবনে স্বামী যোগানন্দ অতি গর্বের সঙ্গেই বলেছিলেন, 'জগতে ভারতের আর কোন দানই যদি না থাকত, তা হলে এই একমাত্র ক্রিয়াযোগই তার রাজোচিত দান বলে বিবেচিত হত।'

'ক্রিয়াযোগ' একটি সুপ্রাচীন বিজ্ঞান। যোগীরাজ লাহিড়ী মহাশয় তাঁর মহান্ গুরু বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে এই বস্তুটি পেয়েছিলেন। বাবাজী 'ক্রিয়াযোগ'-কে বহুযুগের বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে পুনরুদ্ধার করে এর প্রণালীর বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে এর সরল নামকরণ করেছিলেন 'ক্রিয়াযোগ'।

বাবাজী মহারাজ লাহিড়ী মশায়কে বলেছিলেন, "আজকে এই উনবিংশ শতাব্দীতে তোমার হাত দিয়ে আমি জগৎকে যে 'ক্রিয়াযোগ' দান করছি তা হচ্ছে সেই একই বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, যা শ্রীকৃষ্ণ হাজার হাজার বৎসর পূর্বে অর্জুনকে দিয়েছিলেন এবং যা পতঞ্জলি ও ভারতীয় বিশিষ্ট যোগীরা এবং যীশুখৃষ্ট ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যরা পরে অবগত হন।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীও ক্রিয়াযোগ প্রসঙ্গে শিষ্যকে বল্লেন, 'ক্রিয়াযোগ হচ্ছে এমন একটি উপায় যার দ্বারা মানবজাতির বিবর্তন খুব দ্রুত সাধিত হতে পারে। প্রাচীন যোগীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের রহস্য শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে এ হচ্ছে ভারতবর্ষের অপূর্ব ও অমর দান। প্রাণশক্তি যা সাধারণত হৃৎপিণ্ড পরিচালনায় ব্যয়িত হয়, তা অবিরাম শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্থির করবার প্রণালী দ্বারা উচ্চতর সাধনের জন্য মুক্ত করা আবশ্যক। ক্রিয়াযোগী

মানসিক প্রক্রিয়ায় প্রাণশক্তিকে তাঁর মেরুদণ্ডের ছয়টি চক্রের (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা) মধ্য দিয়ে আরোহণ ও অবরোহণ করান। এই ছয়টি চক্র বিশ্বমানবের প্রতীক দ্বাদশটি রাশির রাশিচক্রের সমান। মানুষের অনুভূতিসম্পন্ন মেরুদণ্ডের উপর চতুর্দিকে আধ মিনিট শক্তিকে আবর্তিত করলে, তার বিবর্তনের সূক্ষ্ম উন্নতি সাধিত হয়। আধ মিনিট এই ক্রিয়া এক বৎসরের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের সমান। শাস্ত্র অবিসংবাদিতরূপে এ সত্য নির্ধারিত করে গেছে যে, মানব মস্তিষ্ককে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যথোচিতভাবে উপযোগী করে তুলতে গেলে মানবের দশলক্ষ বৎসরের স্বাভাবিক আর নীরোগ বিবর্তনের প্রয়োজন। সাড়ে আট ঘণ্টায় এক হাজার বার 'ক্রিয়া' যোগের অভ্যাস করলে একদিনে যোগীর এক হাজার বছরের স্বাভাবিক বিবর্তনের সমান উন্নতি সাধিত হয়। অবশ্য উচ্চস্তরের যোগীরা 'ক্রিয়া' সাধনের আরও দ্রুততর আর সুগম পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। ক্রিয়াযোগের নির্ভুল সহজ সাধন প্রণালীর নিয়মিত আর ক্রমিক অনুশীলন দ্বারা মনুষ্য শরীরে দিন দিন আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধিত হয়। অবশেষে পরব্রহ্মের সগুণ ও সক্রিয় প্রকাশের ফলে সেই দেহ অসীম বিশ্বশক্তি ধারণের আধার হবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে মানুষের মধ্যে তার প্রাণশক্তিপ্রবাহ জগতের দিকে ধাবিত। এই শক্তিপ্রবাহ ইন্দ্রিয়-বিষয়-গ্রহণ-জনিত অপব্যবহারে ও অবক্ষয়ে নাশপ্রাপ্ত হয়। 'ক্রিয়া' সাধন দ্বারা উক্ত প্রবাহের গতি পরিবর্তিত হয়ে মানসিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত হয় এবং মেরুদণ্ডস্থিত সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির সহিত পুনর্মিলিত হয়। প্রাণশক্তির এরূপ সুদৃঢ়ীকরণে যোগীর দেহ এবং মস্তিষ্কের কোষগুলি আধ্যাত্মিক অমৃতে নবজীবন লাভ করে। শরীরের সঙ্গে আত্মার বন্ধনের শ্বাসগ্রন্থিচ্ছেদ করে 'ক্রিয়া' জীবনকে সুদীর্ঘ আর জ্ঞানকে অনন্তের দিকে প্রসারিত করে। যোগ প্রণালী মন আর জড়সংবদ্ধ ইন্দ্রিয়দের মধ্যে টানাটানি থামিয়ে দিয়ে সাধককে তার অনন্ত সাম্রাজ্য পুনরধিকারের জন্য মুক্তি এনে দেয়। তখন সে জানতে পারে যে তার স্বরূপ জড়শরীরে বা শ্বাস-প্রশ্বাসে আবদ্ধ নয়—সেটা মরণশীল মানবের প্রাকৃতিক শক্তির নিকট নতিস্বীকার—বায়ুর দাসত্বের প্রতীক। শরীর ও

মনের অধীশ্বর হয়ে ক্রিয়াযোগী অবশেষে তার অন্তিমশত্রু মৃত্যুর উপর জয়ী হয়।'

স্বামী যোগানন্দ পরবর্তীকালে আমেরিকা ও ইউরোপ বাসীদের নিকট ক্রিয়াযোগের এই তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে আলোচনা করেন। এবং বিশেষ জোর দিয়েই বলেন, "প্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে মনকে প্রত্যক্ষভাবে সংযত করবার জন্য 'ক্রিয়া'ই হচ্ছে আত্মজ্ঞানলাভের সর্বাপেক্ষা সহজ, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পথে মন্থরগতি, অনিশ্চিত গরুর গাড়ীর মত চলার ব্যবস্থার জায়গায় 'ক্রিয়া'কে ঠিকমত বলা যেতে পারে এরোপ্লেনের গতি।"

'উন্নত ক্রিয়াযোগীর জীবন তাঁর প্রাক্তন কর্মফলের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র তাঁর আত্মার নির্দেশ দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। সাধক এই প্রকারে সাধারণ জীবনের সদসৎ আত্মপ্রধান কর্মের কুটিল ও শম্বূকগতির বিবর্তন ধারা এড়িয়ে গিয়ে দ্রুতগতি লাভ করেন। এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ প্রণালী দ্বারা যোগী তাঁর দেহাত্মবোধের কারা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বব্যাপিত্বের গভীর মুক্তবায়ুর আস্বাদ গ্রহণ করেন।'

এই ক্রিয়াযোগ সাধনার মধ্য দিয়েই স্বামী যোগানন্দ তাঁর যোগানন্দ নামের সার্থকতা লাভ করেন। কৈশোরে ভগবানের সাযুজ্যলাভের জন্য যে ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়েছিলো দেহে মনে আত্মায়, তার আত্যন্তিক শান্তি লাভ হয়। সমাধিলাভের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি উপলব্ধি হয়। দেহে মনে আত্মায় অনুভব করেন এক পরম প্রশান্তি। ভূমানন্দে ভরে যায় দেহ মন। অবগাহন করতে থাকেন সচ্চিদানন্দ সাগরে। নিজের মধ্যে মহত্তম সত্তাকে অনুভব করে, পৃথিবীর মানুষকে শোনালেন সেই অমৃতত্বের কথা। আর সেই অমৃতের নিত্যধামে প্রবেশের পথও নির্দেশ করলেন—ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে। মানুষকে দিলেন অপরিসীম মর্যাদা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বর-সত্তা। উজ্জীবন ও উদ্ঘাটনের প্রতিশ্রুতি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সেই চির মানব সেই মহামানবের অস্তিত্ব। দীপ আলাদা শিখা এক, দীপের সীমাকে উল্লঙ্ঘন করেই তার দীপ্তি। মানুষের মধ্যে তিনিই মনুষ্যত্ব। মনের মাঝখানে তিনিই মনের মানুষ। তাঁরই জাগরণ।

তাঁরই উদ্‌ঘাটন। তাঁরই উজ্জীবন। বিচার নয় স্বীকার। প্রত্যাহার নয় প্রতিস্থাপন।

*　　*　　*

'—স্বর্গের সুধা কি তুমি সবটা একলাই খেতে চাও নাকি? যদি না দয়ার অবতার সদ্‌গুরুগণ অপরকে তাঁদের জ্ঞান বিতরণ করতে ইচ্ছুক হতেন, তা হলে তুমি বা আর কেউ কখন কি যোগের দ্বারা ভগবৎসঙ্গ লাভ করতে পারতে? ভগবান হচ্ছেন মধু, আর তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সব মধুচক্র। তাহলে দুটোরই প্রয়োজন আছে। অবশ্য পরমাত্মার সংস্পর্শবিহীন বাহ্যিক কোন আকার নিরর্থক, কিন্তু তুমিই বা অধ্যাত্ম অমৃতপূর্ণ কর্মমুখর, মধুচক্র সৃষ্টি করার উদ্যোগ করবে না কেন?' গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি বললেন শিষ্যপ্রবর স্বামী যোগানন্দকে দৃঢ়কণ্ঠে। এই উপদেশ এবং আদেশ গ্রহণের পর যোগানন্দ গিরি বাংলার এক পল্লীর শান্ত পরিবেশে ডিহিকায় স্থাপন করলেন 'যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়'। মাত্র সাতটি ছাত্রকে নিয়ে। বছরখানেক পরে ১৯১৮ সালে কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সাহায্যে রাঁচীতে স্থানান্তরিত করলেন এই বিদ্যালয়। প্রাথমিক আর উচ্চ বিদ্যালয় এই উভয়বিধ ধারা অনুযায়ী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষাদানের কার্যক্রম প্রবর্ত্ত করলেন। যোগ ধ্যান আর শারীরিক উন্নতি-সাধনের জন্য 'যোগদা' প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষাদান শুরু করলেন। শিক্ষা-দানের এই যোগদা প্রণালী স্বামী যোগানন্দ নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন। মুনিঋষিদের বিদ্যাদানের আদর্শ অনুসরণ করে ক্লাসের অধিকাংশ পড়ার ব্যবস্থা মুক্ত আকাশতলে সম্পন্ন করবার ব্যবস্থা করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামী যোগানন্দের যোগদা প্রণালীর শিক্ষা-পদ্ধতি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হলো এবং বিশেষ প্রশংসা লাভ করলো। দুই হাজার ছাত্রের নিকট থেকে আবেদনপত্র এলো। অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাঁচীর বিদ্যালয় সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বামী প্রণবানন্দ রাঁচী বিদ্যালয় প্রথম দর্শন করে বলেন, 'ভারী আনন্দ হচ্ছে যে বালকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শ এই বিদ্যালয়ে অনুসৃত হচ্ছে। আমার গুরুর আশীর্বাদ এর উপর বর্ষিত হোক।'

আবার রাত্রি প্রভাত। নব উষা।

ধীরে প্রভাত সূর্যের স্বর্ণকিরণ এসে পড়লো রাঁচীর বিদ্যালয়ে। সুবিস্তৃত ভূমির উপর। সরল প্রাণের ছাত্রদের মুখে চোখে। আর শিক্ষাদাতা গুরুদেব স্বামী যোগানন্দের মনের উপর। চেতনার সুগভীর গহ্বর হতে স্পষ্ট মূর্তি সব জেগে উঠতে লাগলো, একটি দুটি করে ঘটনার সুস্পষ্ট রেখা। তারই মধ্য হতে জেগে উঠলো সমুদ্রপারের একটি দেশ—আমেরিকা।..........'বসে বসে খুব গভীরভাবে চিন্তা করছি হঠাৎ আমার অন্তশ্চক্ষুর সামনে পশ্চিমবাসী লোকেদের কতকগুলো মুখের দৃশ্যপট যেন ভেসে উঠল। দেখেই মনে হলো—আরে এ যে আমেরিকা! আর এ লোকগুলো ত আমেরিকান দেখছি!'

এইভাবে অন্তরের নির্দেশ পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকা থেকে ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য আমন্ত্রণ এলো। অধিবেশন হবে বোস্টন শহরে (ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ রিলিজিয়াস্ লিবারেলস্ ইন্ আমেরিকা)।

তারপর গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ও পিতৃদেবের আশীর্বাদ ও প্রেরণা নিয়ে ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে 'সিটি অফ্ স্পার্টা' নামক জাহাজে সত্য সত্যই স্বামী যোগানন্দ যাত্রা করলেন আমেরিকার পথে। ৬ই অক্টোবর বোস্টন শহরে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে স্বামী যোগানন্দ জীবনে প্রথম ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করলেন এবং প্রথম দিনেই আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করে নিলেন। আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মন্তব্য প্রকাশ করলেন, "ভারতবর্ষের রাঁচী ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে স্বামী যোগানন্দ কংগ্রেসে তাঁর সমিতির অভিনন্দন নিয়ে এসেছেন। বিশুদ্ধ আর পরিষ্কার ইংরাজীতে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় তিনি ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেছেন, 'ধর্ম হচ্ছে সার্বজনীন। আমরা অবশ্য কোন বিশিষ্ট প্রথা বা বিশ্বাসকে সার্বজনীন রূপ দিতে পারি না, কিন্তু ধর্মের মূল তত্ত্বকে সার্বজনীন করে তোলা যেতে পারে—আর তা আমরা সকলকে অনুসরণ করতে আর মানতেও বলতে পারি।'" অবশেষে শুরু হোল স্বামী যোগানন্দের কর্মময় জীবন আমেরিকা মহাদেশে। শহরে শহরে বক্তৃতা

দান ও যোগ সম্বন্ধে ক্লাসে শিক্ষা দান। প্রতীচ্যে ক্রিয়াযোগের প্রচার। অবসর সময়ে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। কাব্যগ্রন্থ লিখলেন, 'সংস অফ দি সোল।' এই সময়ের কর্মময় জীবন প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন, 'বছরের পর বছর কেটে গেল। এই নূতন মহাদেশের প্রত্যেক অংশেই আমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালুম। শত শত ক্লাব, কলেজ, চার্চ আর নানা দলের সামনে আমায় অনেক কিছুই বলতে হল। ১৯২০-১৯৩০ দশকে সহস্র সহস্র আমেরিকাবাসী আমার যোগের ক্লাসে যোগদান করে। তাদের সকলের নামে 'হুইস্পার্স ফ্রম ইটারনিটি'—'অনন্তের আহ্বান' নামে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন প্রার্থনা ও কবিতার পুস্তক উৎসর্গ করলুম।'

অবশেষে স্বামী যোগানন্দ ইউরোপ মহাদেশ ও ইংলণ্ডও জয় করে ফেললেন। ১৯৩৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে, লস্ এঞ্জেলস্‌এ সেল্‌ফ্-রিয়্যালাইজেশন-ফেলোশিপ-কেন্দ্র স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। ধীরে ধীরে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে সেল্‌ফ্-রিয়্যালাইজেশন-ফেলোশিপ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলো। স্বামীজী তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত করলেন সি. রিচার্ড রাইট মহাশয়কে। তিনিও গুরুরূপে বরণ করেছিলেন স্বামী যোগানন্দকে।

এই সময়ে মার্কিন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ লুসার বারব্যাঙ্ক স্বামী যোগানন্দের যোগদা প্রণালী সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, 'আমি স্বামী যোগানন্দের যোগদা-প্রণালী পরীক্ষা করে দেখেছি, আর আমার মতে মানুষের দৈহিক, মানসিক আর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির শিক্ষা আর সামঞ্জস্য বিধানে এ আদর্শ। স্বামীজীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীব্যাপী আদর্শ জীবনযাপন প্রণালীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, সেখানে শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনেই আবদ্ধ থাকবে তা নয়—শরীর, ইচ্ছা, অনুভূতি এদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। মনঃসংযোগ আর ধ্যানের সরল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যোগদাপ্রণালী মাধ্যমে শরীর মন আর আত্মার উৎকর্ষ সাধনে জীবনের অনেক কিছু জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারবে, আর পৃথিবীতে শান্তি আর সদিচ্ছা নেমে আসবে। স্বামীজীর মতে প্রকৃত শিক্ষা হবে, সকল প্রকার দুর্জ্ঞেয়তা আর অব্যবহারিকতা হতে মুক্ত সহজ সাধারণ জ্ঞান, তা নাহলে এ আমার

অনুমোদন পেত না।..........সত্যিই প্রাচ্যের এত বড় জ্ঞানভাণ্ডার আছে যার বিষয়ে প্রতীচ্য অতি অল্পই অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছে।'

প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগের ফলে প্রকৃতি যে তার সযত্নরক্ষিত বহু গুপ্ত রহস্য তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল—তাতে করে লুথার বারব্যাঙ্ক লাভ করেছিলেন অপরিসীম আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা।

তিনি একদিন স্বামী যোগানন্দকে বলেছিলেন, 'মাঝে মাঝে আমি সেই অনন্ত শক্তির স্পর্শ খুব নিকটেই পাই। তাতে করে আমি আশে পাশের রুগ্ন লোকদের আর অসুস্থ গাছেদের সুস্থ করে তুলতে পেরেছি।' উদ্ভিদ জগতের আরও এক বিস্ময়কর গুপ্ত রহস্যের কথা বলেছিলেন স্বামীজীকে।

"উন্নত ধরণের উদ্ভিদ্ প্রজননের গুপ্তরহস্য হচ্ছে, অবিশ্যি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া—প্রেম। যখন আমি মনসাগাছকে কাঁটাশূন্য করবার পরীক্ষা চালাচ্ছিলুম, তখন আমি প্রায়ই তাদের আদর করে ভালবাসার কথা সব বলতুম। আমি তাদের বলতুম, 'তোমাদের কিছু ভয় নেই। আত্মরক্ষার জন্যে তোমাদের কাঁটার কি দরকার গো, আমি যে তোমাদের সব সময় রক্ষা করব বুঝলে?' এই রকম করে নানা কথা বলে আমি যেন তাদের সব ভয় ভাঙাতুম। অবশেষে দেখা গেল যে মরুভূমির সেই দারুণ কাঁটাওয়ালা ফণীমনসার গাছ হতে একেবারে কাঁটাশূন্য অতিপ্রয়োজনীয় এক বিশেষ শ্রেণীর গাছের উদ্ভব হয়েছে।"

এই সৌম্যমূর্তি বৈজ্ঞানিককে স্বামী যোগানন্দ 'আমেরিকার সাধু', 'গোলাপবাগের সাধু' আখ্যা দিয়েছিলেন।

* * *

অকস্মাৎ একদিন স্বামী যোগানন্দের মন উতলা হয়ে উঠলো ভারতমাতার জন্য। দেশের মাটির স্পর্শের জন্য। পিতৃদেব ভ্রাতা ভগ্নী রাঁচী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ও প্রাণপ্রিয় গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর জন্য। স্বামী যোগানন্দের ভাষায়, 'চক্ষের পলকে দশ হাজার মাইল অতিক্রম করে গুরুদেবের আহ্বান আমার অন্তরে এসে ধ্বনিত হলো—বিদ্যুৎস্ফুরণের মত। পনর বছর! হ্যাঁ, পনর বছরই ত বটে! দেখলুম এটা ১৯৩৫ সাল। এসেছিলুম ১৯২০ সালে। পনেরো

বছর ধরে আমি গুরুর শিক্ষা আমেরিকায় প্রচার করে এসেছি। এখন গুরু আমায় ডাক দিয়েছেন।' অবশেষে ১৯৩৫ সালের ৯ই জুন স্বামী যোগানন্দ 'ইউরোপা' নামক জাহাজে নিউইয়র্ক ত্যাগ করলেন। যাত্রা করলেন লণ্ডনের পথে। সঙ্গী হলেন সেক্রেটারী মিস্টার সি. রিচার্ড রাইট আর একজন মহিলা শিষ্যা মিস্ এটি ব্লেচ্। লণ্ডনে এসে ক্যাক্সটন হলে বিশাল জনতার সামনে বেদান্তের ধর্ম ও ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তারপর স্কটল্যাণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে, শহরে শহরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের তত্ত্ব প্রচার করে, এলেন গ্রীসে। এখান থেকে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হলেন প্যালেস্টাইনে, যে দেশের মাটির প্রতিটি ধূলিকণায় রেণু রেণু হয়ে মিশে রয়েছে যীশুখ্রীষ্টের মহিমা। তারপর মিশর পরিভ্রমণ করে 'রাজপুতানা' জাহাজে করে রেড-সী দিয়ে, আরব সাগর পার হয়ে বোম্বাই শহরে এসে উপস্থিত হলেন। ভারতবর্ষের তটভূমি স্পর্শ করে স্বামীজীর দেহ মন আত্মায় অনুভূত হলো এক অপূর্ব শিহরণ—উন্মাদনা। বহুদিনের প্রবাসী তৃষিত মন মাতৃভূমির স্পর্শে এক অপূর্ব পুলকরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে উঠলো। ভারতের পুণ্যবায়ুতে আবার বুক ভরে টেনে নিলেন নিঃশ্বাস। ১৯৩৫ সালের ২২শে আগস্ট। কলকাতায় ফিরবার পথে ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইতিপূর্বে ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী রাঁচী বিদ্যালয় পরিদর্শন করে উচ্চ মন্তব্য করেছিলেন। কলকাতায় আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ফিরে এলে সে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হলো। বৃদ্ধ পিতা আবেগে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, ভ্রাতা ভগ্নী বন্ধু বান্ধব ও ছাত্রের দল ঘিরে রইলো। আনন্দে সকলেই অভিভূত। নির্বাক। কারো চোখই শুষ্ক ছিল না। পরবর্তী সাক্ষাতের ঘটনা হলো, শ্রীরামপুর আশ্রমে গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর্ব। এই সাক্ষাৎ পর্ব প্রসঙ্গে সেক্রেটারী মিস্টার রাইট তাঁর ভ্রমণের দিনলিপিতে লিখেছেন, 'গভীর ভক্তিনতহৃদয়ে আমি যোগানন্দজীর পিছন পিছন গিয়ে আশ্রমের উঠানেতে প্রবেশ করলুম। হৃদয় দ্রুত আলোড়িত হচ্ছে। আমরা উভয়ে পুরানো সিমেণ্টের সিঁড়ি দিয়ে উপরে এসে উঠলুম—এই সেই সিঁড়ি যে পথে বহু সত্যান্বেষী বহুবারই যাত্রা করেছেন। উপরে উঠতে উঠতে মনের চাঞ্চল্য

ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো। আমাদের সামনে সিঁড়ির মাথায় নীরবে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি। প্রশান্ত বদন, সৌম্যমূর্তি প্রাচীন ঋষির দৃপ্ত মহিমায়। তাঁর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার অপরিসীম সৌভাগ্যলাভে আমার অন্তঃকরণ ভাবের প্রাবল্যে আলোড়িত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। আমার আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা হয়ে এলো যখন আমি দেখলুম যে যোগানন্দজী নতজানু হয়ে অবনতমস্তকে গুরুর চরণ-কমল হস্তদ্বারা স্পর্শ করে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাঁকে বন্দনা করলেন, তারপর মস্তক স্পর্শ করে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করলেন। উঠে দাঁড়াতেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁকে বক্ষের উভয় পার্শ্বে স্নেহভরে ধারণ করে আলিঙ্গন করলেন। প্রথমে কোন কথাই শুরু হোল না, কিন্তু মনের গভীর ভাব অন্তরের নীরব বাণীতেই পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হলো। তাঁদের আত্মার পুনর্মিলনের আনন্দের প্রগাঢ়তায় তাঁদের উভয়েরই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই নীরব বারান্দার মধ্যে এক স্নিগ্ধ কোমল মধুর ভাবের স্পন্দন—সূর্যও তখন হঠাৎ মেঘ থেকে বেরিয়ে পড়ে যেন জ্যোতির প্লাবনে ভাসিয়ে দিলে।'

এই সময়ে গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী স্বামী যোগানন্দকে 'পরমহংস' উপাধিতে ভূষিত করেন। এখন থেকে 'স্বামী যোগানন্দ' হলেন, 'পরমহংস যোগানন্দ'। পরমহংস যোগানন্দ সমগ্র দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে, ১৯৩৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী কুম্ভমেলায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতীচ্যবাসী ভক্ত শিষ্যের দল লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত মানুষের মেলা দর্শন করে উপলব্ধি করলেন, ভারতের প্রাণশক্তি রয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে। ত্যাগপূর্ণ জীবনের মধ্যে।

আবার একদিন! যেন মৃত্যুঘন ভয়ার্ত রাত্রির তমসা স্বামীজীর দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো,—এক দুঃসংবাদ অন্তর আকাশে সহসা ধ্বনিত হলো, গুরুদেব নেই। টেলিগ্রামও এসে উপস্থিত হয়, 'পুরী আশ্রমে এখনই চলে আসুন।' যুক্তেশ্বর গিরিজী তখন পুরী আশ্রমে ছিলেন। ধ্যানস্থ হলেন স্বামীজী। আবার অন্তরের বাণী স্নিগ্ধস্বরে ধ্বনিত হলো, 'ধৈর্য ধর, শান্ত হও, স্থির হও।' পরমহংস যোগানন্দ যখন পুরী আশ্রমে এসে উপস্থিত

হলেন তখন গুরুদেব মহাসমাধিতে নিমগ্ন হয়েছেন। ১৯৩৬ সালের ৯ই মার্চ সন্ধ্যা সাতটা। তখনও তাঁর মুখে চোখে ফুটে রয়েছে এক স্বর্গীয় পরমানন্দময় শান্তির আভাস।

অমৃতবাজার পত্রিকা লিখলেন, 'পুরীধামে শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ ৮১ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। স্বামী মহারাজ কাশীধামের যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার ও ব্যাখ্যাতা। স্বামী মহারাজ ভারতবর্ষে যোগদা সৎসঙ্গের কয়েকটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, আর ছিলেন যোগ-প্রচারের প্রধান উৎসাহদাতা। এই যোগপ্রচারকার্য তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী যোগানন্দ পশ্চিমে বহন করে নিয়ে যান। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আর তাঁর গভীর উপলব্ধি স্বামী যোগানন্দকে সমুদ্রযাত্রা করে আমেরিকায় গিয়ে ভারতের ধর্মগুরুদের বাণী প্রচারে উদ্বুদ্ধ করে।'

গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মহাপ্রয়াণের পর পরমহংস যোগানন্দ আবার ফিরে গেলেন আমেরিকায়। নিমগ্ন হলেন যোগসাধনায় এবং ক্রিয়াযোগের প্রচারকার্যে। শিক্ষার্থীদের মনে আবার নূতন করে আলোকপাত করলেন ক্রিয়াযোগের সুফল ও ঈশ্বরোপলব্ধি সম্বন্ধে। তিনি বললেন শিষ্য ভক্ত ও শিক্ষার্থীদের—'হিন্দুশাস্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে মানব এই পৃথিবীতে আকৃষ্ট হয়ে আসে, তার পরম্পরাগত প্রত্যেক জীবনে সকল পার্থিব অবস্থার মধ্যে যে ভগবানের অনন্তলীলার প্রকাশ, সে বিষয়ে পূর্ণ শিক্ষা লাভের জন্য। পূর্ব ও পশ্চিম উভয়েই এই মহাসত্য বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষালাভ করছে আর তাদের এইসব আবিষ্কার সানন্দে পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া উচিত। ভগবান তাঁর এ জগতের সন্তানদের দারিদ্র্য, রোগ, অজ্ঞান থেকে মুক্ত এক আদর্শ সভ্যতা পৃথিবীতে বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে দেখে যে নিশ্চয়ই খুশী হবেন এ কথা নিঃসন্দেহ। মানুষের তার দৈব সম্পদের বিষয়ে বিস্মরণ, তা হচ্ছে তার সকল রকম দুঃখদুর্দশার মূল কারণ।..............কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রই মূলতঃ এক, মানবকে তার ঊর্ধ্বগতির পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা যোগায়।'

'ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের জন্য সাড়ম্বর ঘোষণার কোন প্রয়োজন হয় না।

তাঁর পরিস্ফুট বাণী নির্মল অন্তরের গভীর নীরবতার মধ্যেই শোনা যায়। নিখিল বিশ্বমাঝে প্রতিধ্বনিত প্রণবঝঙ্কাররূপে নাদব্রহ্ম ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে মুহূর্তমধ্যে সুস্পষ্ট বাণীরূপে প্রকাশিত হন।' এই মহাপুরুষ পরমহংস যোগানন্দজী ১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশস্থ লস্ এঞ্জেলস্ শহরে ভারতীয় রাজদূত শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দেবার সময় অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে লীন হন। মৃত্যুবরণ নয়—তখনও যেন তিনি শান্ত হয়ে স্থিরচিত্তে শুনছেন মহাসঙ্গীতের কলতান, প্রণব-ঝঙ্কার—সেই অনাহত ধ্বনির মধ্য হতে। আর যেন বলছেন,

'হতাশ হয়োনা কভু অগ্রসর হয়ে চল
এস তুমি মোর পাশে আজ,
ছড়ায়ে রয়েছে জেনো দৈব সম্পদ্‌ভার
চলিবারে এ পথেরি মাঝ!'

'অবধূত ভুলুয়া বাবা'

অকস্মাৎ মূর্ছা ভাঙলো তরুণ তাপসের। তখন রাত্রির শেষ প্রহর। জাগ্রত আকাশের সুনন্দিত-হৃদয়ের অর্ঘ্যের মত উষার আলোর একটি স্তবক এসে পড়েছে শ্মশানভূমির বুকের উপর। চমক লাগে নবীন যুবকের দুই চোখে। তার নিষ্পলক দৃষ্টি যেন বিপুল এক বিস্ময়ের ভারে মন্থর হয়ে থাকে। সুদীর্ঘ জটাজুট, নগ্ন ভস্মময় দেহধারী, তেজঃপুঞ্জ নয়নযুক্ত এক মহাপুরুষ তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তারই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তার হৃদয়তন্ত্রী সেই মহাপুরুষের মধুর স্পর্শে যেন এক সুমধুর তানে উঠলো বেজে। তখন মনে হতে লাগলো এ জগৎ দুঃখময় নয়, আনন্দময়। এই বৃক্ষলতা জলস্থল আকাশ বাতাস জীবজন্তু সকলই যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ ও চৈতন্যময়। সে আনন্দের শেষ নেই, সীমা নেই। স্থির নিশ্চল নিস্পন্দ-ভাবে কিছুক্ষণ অতীত হলো।

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সন্ন্যাসীপ্রবর বললেন,—'বৎস ওঠো, অধীর হয়ো না। আমি তোমার মনের অবস্থা জানি। মাতৃভাবে তুমি যখন এত তন্ময় হতে পেরেছো, নিঃসন্দেহে তুমি মাতৃপূজার সুযোগ্য অধিকারী। তুমি শক্তি-রূপিণী বিশ্বজননীর পূজার আয়োজন কর। একদিন তুমি এই সংসারের শোক তাপ বিচ্ছেদ ও ভয়কে অতিক্রম করে চির-আনন্দ লাভে সমর্থ নিশ্চয়ই হতে পারবে।' হঠাৎ একদিন গ্রামের নির্জন শ্মশানে এসে মাতৃ-স্মৃতি জাগরিত হয় মাতৃহারা নবীন যুবকের। মাতৃশোকে অধীর হয়ে ওঠে ওর মন প্রাণ। শুষ্ক চক্ষু অদ্ভুত এক বেদনায় বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। বারে বারে মনে আসে মায়ের কথা। চোখের সামনে ফুটে ওঠে যেন মায়েরই প্রতিচ্ছায়া। স্নেহময়ী জননীর কণ্ঠের ব্যাকুল মায়ার স্বর শুনতে পেয়ে কিংবা তাঁর ছায়া দেখে ভয় পেয়েছিলো যুবা। মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল সেই জনহীন শ্মশানভূমির বুকে। আর কিছু জানে না সে। তারপর জ্ঞানলাভ হয় এই অপরিচিত সন্ন্যাসীপ্রবরের স্পর্শে। বিস্মিত ও হতবাক হয়ে মঙ্গলকামী মহাপুরুষের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, পরমুহূর্তেই সেই সৌম্যমূর্তির চরণে জীবনের সব প্রশ্ন নিবেদন করে দিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ

করেছিল সে। সেই সন্ন্যাসীর হাতছানিই তাকে ঘরছাড়া দেশছাড়া করে, তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়ে ভবিষ্যতের কঠোর ত্যাগ ও সাধনার জীবনলাভের পথকে সুগম করে তুলেছিলো। প্রেরণা দিয়েছিলো আধ্যাত্মিক জীবন লাভের। তরুণের মনে সেদিন যে আধ্যাত্মিক বীজ তিনি বপন করেছিলেন তাই একদিন মহামহীরুহে পরিণত হয়েছিল। দুই বৎসর সেই মহাপুরুষের সঙ্গে বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করে বহু সাধু মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করে স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন শক্তিপীঠ কামাখ্যায়। এইখানেই একদিন অলৌকিকভাবে বালিকাবেশিনী কালীমায়ের দর্শনলাভ করে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের মূল আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। মা কালীর প্রতি অন্তরের আকর্ষণ তাঁকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত করে তুলতো। সে উচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে মাতৃভজন, কীর্তন ও ভক্তিসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে ওঠে। মাতৃসাধক কবি রূপে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন লোকসমাজে।

এই নবীন যুবক তরুণ তাপসই হলেন অবধূত ভুলুয়া বাবা। ইংরাজী ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১২৬৯ সালের চৈত্রমাসে পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে ফরিদপুর জেলার ভূষণায় ঘোষপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীনীলমণি ঘোষ, মাতা মনোমোহিনী দেবী। ভক্তিমতী রমণী। গৃহদেবতা শালগ্রাম চক্র-জনার্দন। মনোমোহিনী দেবী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় জনার্দনের মণ্ডপে প্রণাম করেন। ছোট্ট শিশুও মাকে অনুকরণ করে। মা মণ্ডপে বসে জপ করেন। ছোট্ট শিশুও জপের ভাবে বসে আধো আধো ভাষায় জিগ্‌গেস করে,—মা আমি কি কলবো। মা বললেন, জয়কালী নাম জপ কর। চঞ্চল শিশু শান্ত হয়ে বসে চোখ বুজে জয়কালী নাম জপ করতে থাকে। কখনও আবার জয় জনার্দন, জয় বাবা বিশ্বনাথ নামও জপ করে। মুখে উচ্চারণ হয় না, তাইতো মা বলেন, মনে মনে জপ কর বাবা। এইভাবে ছোট্ট শিশু শৈশবকাল থেকেই ধ্যান করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আর কালী মা-ই হোল তার ইষ্ট।

নাম রূপের ধারণা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে সাধক বলেছেন, 'নাম জপ করা শিশুকাল থেকেই আমার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। আমার যথার্থ শিক্ষা-দীক্ষা-দায়িনী গুরু আমার স্নেহময়ী জননী।'

দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে যায়। বছরও ঘুরে আসে। শিশুর জ্ঞানসীমার প্রাচীরও প্রসারিত হতে থাকে। যে অজানা শক্তি তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে ছিল, ক্রমশ যেন তা সুবিপুল হয়ে উঠতে থাকে। ছোট্ট শিশুদেহের বদ্ধ কারায় যেন গর্জন করে উঠতে থাকে দুরন্ত সাগরতরঙ্গ।

শিশুর নামকরণ হয়েছে 'কালিদাস'। দিন, মাস, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়। ছোট্ট শিশুটি এখন আর শিশু নেই। বালক কালিদাস গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে। বালক বুদ্ধিমান, কিন্তু লেখাপড়ায় মন নেই। পণ্ডিতমশায়ের বেতের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে ফেরে। একদিন দুঃখিত মনে মাকে বললো, 'মা, আমার আর লেখাপড়া হবে না।' স্নেহময়ী জননীও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তুই কেবল মা কালীকে ডাক্, মা কালীর পূজা কর। তাতেই দেখবি মস্তবড় পণ্ডিত হবি।' জননীর কথায় মা কালীর প্রতি বালকের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হোল। শুরু হোল বালক কালিদাসের কালীপূজা। কালী যে তার ইষ্টদেবী। মণ্ডপ হোল গাছতলা, নৈবেদ্য হোল ধূলোমাটি, চন্দন পুকুরের কাদা, বিল্বপত্র হিজলের পাতা। বলির পাঁঠা হোল কচুর ডাঁটা, কলার ডগা। খড়্গ ছিল দা আর মন্ত্র হোল 'জয় মা কালী'। নিজেই পুরোহিত, নিজেই ঢাকী, নিজেই সবকিছু। মা'কে কেন্দ্র করেই বালক কালিদাসের জীবনের আদর্শ আশা আকাঙ্ক্ষা সবকিছু।

একদিকে ষোড়শোপচারে কালীপূজার আয়োজন—কালী সাধনা, অপর দিকে গৃহদেবতা শালগ্রাম-চক্রের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি নয়নগোচর করে ভাবানন্দে বিভোর হয় সে। একদিকে কালী সচ্চিৎ প্রেমানন্দময়ী মহাশক্তি, অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ—সেই পরম পুরুষ রসস্বরূপের আস্বাদন। রসতত্ত্বই যে বিশ্বের প্রাণতত্ত্ব। এই দুই ভাবের সমন্বয় বাল্যকাল থেকেই কালিদাসের মনের মধ্যে আসন বিস্তার করে বসে। সে ভেদ ও অভেদের বিরোধকে অতিক্রম করে আস্বাদন করে আনন্দময়কে। বিশ্বের মূলীভূত তত্ত্ব রস-স্বরূপকে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে। এক অদ্বয় ব্রহ্মেরই নিত্য আস্বাদনময় মূর্তিকে।

লেখাপড়ায় মন নেই, কিন্তু কেমন করে যেন লেখাপড়া হয়ে যায়। অমনোযোগী ছাত্র মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করলো। আশ্চর্যান্বিত হলেন পিতা-মাতা। বিস্মিত হলো গ্রামবাসীরা। বারো বছরের বালক

এবারে পড়তে এলো ফরিদপুর শহরে। ভর্তি হলো ফরিদপুর জেলা স্কুলে। ছাত্রটির উপর নজর পড়লো স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত ভুবনমোহন সেনগুপ্তের। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। সুতরাং কালীভক্ত কালিদাসের এখন যাতায়াত আরম্ভ হলো ব্রাহ্মসমাজে। এ সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে পরবর্তী কালে যোগীবর বলেছেন, 'ধর্মকথা, ধর্মোপদেশ যে ভাবেই হোক, আমার খুব ভাল লাগত। তাঁরা উপাসনা করতেন, আমি চোখ বুজে কালীরূপ দর্শন করতাম।'

দিন মাস বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলো। আবার এলো নূতন বছর। নূতন দিন। তরুণ ব্রহ্মোপাসক কালিদাস এখন বেশীর ভাগ সময়ই ধ্যানস্থ হয়ে থাকে। তার গৃহদেবতা শ্রীকৃষ্ণ, মুখে মন্ত্র 'জয় মা কালী', অপরদিকে ধ্যানমগ্ন ব্রাহ্মমন্দিরে। সাকার কালীকৃষ্ণ এখন নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের সংগে এক জটিল ভাব-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। কিন্তু দিশেহারা হলো না ভক্ত কালিদাস। শৈশব ও বাল্যের সেই সহজাতভাবে লব্ধ কালীকৃষ্ণে অভেদজ্ঞান সাকার-নিরাকারের প্রশ্নে এক সার্থক পরিণতি লাভ করলো। দেখলো সবকিছুতে ভগবান প্রতিমূর্ত। নিরাকার থেকে আবার এলো সাকারে। সত্যিকার সাকারে। নিরাকারে ছিল সমচেতনা, সাকারে হোল সমদৃষ্টি। জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত, ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছন্ন। ভালো-মন্দ এমন কিছু নেই যা তিনি ছাড়া। জীবজগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ হোল ভক্ত কালিদাসের। সে আপন ইষ্টদেবীকে মানসলোকের আরও বৃহত্তর ভাবরাজ্যে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলো। তার হৃদয়ে 'ব্রহ্ম' এবং 'মা' মিশে গিয়ে হলেন ব্রহ্মময়ী কালী। মুগ্ধ সন্তানের অভিভূত নয়ন-মনের সামনে ধীরে ধীরে ভেসে উঠলো বিশ্বব্যাপী মা-ভাবের উপাসনা। মাতৃভাবে বিভোর হয়ে রচনা করলো 'মাতৃভজন'—অসংখ্য সঙ্গীত। আবার কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম নিয়েও গান রচনা শুরু করলো সে। শুধু রচনা নয়, রাগ-রাগিণী-সম্মত সুরে গান গাইতেও পারতো সে। পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে বেশী পড়লো বিশ্বসার তন্ত্র গ্রন্থ, গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ মহাভারত। সর্বদাই উদাস অনাসক্ত ভাব। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গেয়ে উঠলো,

'কেউ বলে সে নিরাকার, কেউ বলে সাকার।
কেউ বলে সে ঘরের মানুষ, সকল মূলাধার ॥
কেউ বলে সে পরমজ্যোতি, কেউ বলে পরাপ্রকৃতি।
কেউ বলে তার বরণ আলো, কেউ বলে আঁধার ॥
কেউ বলে সে দয়াল হরি, কেউ বলে সে ভূভার-হারী।
কেউ বলে সে রয় এপারে, কেউ বলে ওপার ॥
কেউ বলে গড্ অল্‌মাইটী, কেউ বলে আল্লাই খাঁটী।
কেউ বলে তার নাম নিলে হয় ভব-সাগর পার ॥
ভুলুয়া গায় যে যা বলে, কোন কথাই নয় বিফলে,
হুখীর সাথী এই ভূতলে, সেই ত মা আমার ॥

* * *

—মরি হায়, কি অপরূপ এই কালীরূপ, আমি বড় ভালবাসি,
নাচে মা, এলো চুলে, হেলে হুলে বিলায়ে নীল কিরণরাশি ॥
চরণে, রণ নূপুর, বাজে মধুর অধরে ধরে না হাসি,
বরাভয় দিচ্ছে করে, সমাদরে, ভক্ত জনার ভয় বিনাশি ॥'

* * *

এমনই এক ভাবরাজ্যে সে যখন বিচরণ করছিল, তখনই তার জননী মনোমোহিনী দেবী দেহলীলা সম্বরণ করলেন। অকস্মাৎ জননীর মৃত্যু কালিদাসের মনোজগতে সৃষ্টি করলো এক তুমুল আলোড়নের। স্নেহময়ী জননীর মৃত্যুর সুতীব্র বেদনা তাকে মা কালীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে তুললো। বৈরাগ্যের আলো ভাসমান মেঘের মতন ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলে চলে যায় তার মনের আকাশের উপর দিয়ে। ফরিদপুর ছেড়ে চলে আসে সে রাণাঘাটে। রাণাঘাট স্কুলে ভর্তি হয়। এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র। আর এই রাণাঘাটেই অলৌকিক ভাবে সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরু লাভ হয়। সদ্‌গুরু স্বয়ং এসে আকুল সন্তানকে বুকে তুলে নিলেন। আর তার আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পথকে করে দিলেন সুগম। রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের বাড়ীর সামনে সেদিন মেলা বসেছে সাধুদের। প্রায় হুইশত সন্ন্যাসী হবে। শক্তিতীর্থ কামাখ্যার যাত্রী তাঁরা। নর্মদাতীরস্থ ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর সন্ন্যাসীদল। মণ্ডলীর প্রধান গুরু মহারাজ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ সরস্বতী। প্রধান শিষ্য হলেন শ্রীমৎ শ্যামানন্দ সরস্বতী।

দুই বন্ধুর সঙ্গে কালিদাস এসেছেন সাধুদর্শনে। পূর্ণানন্দ আর শ্যামানন্দকে দর্শন করেই কালিদাসের অন্তর নেচে উঠলো। প্রথম দর্শনেই পূর্ণানন্দজী কালিদাসকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, ‘তুম্ ত হামারি হ্যায়।’ শ্যামানন্দ মহারাজও কালিদাসের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, যেন তার অন্তরকে চিনে ফেলেছেন। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে ভক্ত কালিদাস তাঁদের স্বরচিত ভজন শোনাল। শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদ্বয় নয়, সমগ্র সন্ন্যাসীমণ্ডলী মুগ্ধচিত্তে শুনলেন ভক্ত কালিদাসের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত। চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে সে সঙ্গীতধ্বনির মধুর তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে চললো। তীব্র মধুর সুর যেন দিবসের আকাশে বাতাসে অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করে চলে। দিবসের প্রখর আলো স্নিগ্ধ মৃদু হয়ে আসে, বাতাস স্বচ্ছ অমলিন, নদীর বুকে নামে দিনশেষের ধূসর ছায়া। কালিদাসও ফিরে আসে তার আবাসস্থলে। উদাস অনাসক্ত মন নিয়ে, সুমধুর কল্পনার আনন্দস্মৃতি নিয়ে পরমানন্দের আভাস নিয়ে। তারপর একদিন নিঃশব্দে তরুণ তাপস কালিদাস বেরিয়ে পড়লো নর্মদাতীরের সাধুদের সঙ্গে রাণাঘাটের পাঠাশ্রয় ছেড়ে। বাংলা ১২৮৮ সালের (ইংরাজী ১৮৮১ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসে। অবশেষে একদিন এসে উপস্থিত হলেন শক্তিপীঠ কামাখ্যা তীর্থে। এই কামাখ্যাতেই কালিদাস গুরুরূপে বরণ করলেন শ্রীমৎ শ্যামানন্দ সরস্বতীকে। পরবর্তীকালে তরুণ তাপস কালিদাস অবধূত ভুলুয়া বাবা নামেই ভক্ত সমাজে সমধিক প্রসিদ্ধ হন। এই ‘ভুলুয়া বাবা’ নাম কবে কোন্ সময় থেকে প্রচারিত হয়েছিল তার ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। তবে সাধক কবির ভাষায়,

বাল্যকালেই কালীপূজায়, জন্মেছিল মোর অভ্যাস
আমার নাম শ্রীকালিদাস।

*　　　*　　　*

এবার বেছে নাম রেখেছিল মা, ‘ভুলুয়া’
তাই সব ভুলে রহিলাম
সব ভুলিলেও ক্ষোভ না রহিত
তোমায় যদি নাহি ভুলিতাম।

সন্ন্যাসীমণ্ডলীর সংগে তীর্থ পরিক্রমার সময় সকলেই মুগ্ধ হলেন তরুণ তাপস কালিদাসের ভক্তিভাব, নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে। কঠিন তত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সরল ব্যাখ্যা শুনে, মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত গুরু মহারাজ শ্যামানন্দ সরস্বতী ও পূর্ণানন্দজী ওকে সবকিছু লিখে রাখবার প্রেরণা ও নির্দেশ দিলেন। পূর্ণানন্দজী ওকে স্বভাবকবি জানতে পেরে পদ্য লিখতে অনুপ্রেরণা দিলেন। অবধূত কালিদাসও স্তব স্তোত্র ভজন উচ্ছ্বাস-কীর্তন লিখে রাখতে শুরু করলেন। এইভাবে চৌদ্দটি মাস মহানন্দে কোথা দিয়ে যেন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু আর দিন কাটতে চায় না। হঠাৎ মন ব্যাকুল হলো বৃদ্ধ পিতা আর মাতৃহীন নাবালক ভাই বোনদের জন্য। সে যে সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান! তার যে কর্তব্য রয়েছে সংসারে। আকুল আগ্রহে সত্যের উপাসনায় অবতীর্ণ হয়ে সে অনুভব করলো সংসারকে ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার কোন অর্থ হয় না। সংসারের মধ্যে থেকেই ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ঘরে বসেই হবে। তবে ঘরের জানালাটি উন্মুক্ত করে রাখতে হবে। তীর্থে মন্দিরে যাওয়া ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনা লাভের জন্য। সাধুসঙ্গ বিরাটের সংস্পর্শের আভাস পাওয়ার জন্য, অমল-কোমল অনুভূতির আস্বাদটি জাগবে বলে। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে বলেন, 'প্রথমে চাই সাধুসঙ্গ, ত. পর শাস্ত্রপাঠ, তারপর স্বকর্ম বিচার ও নামাশ্রয়।'

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গেয়ে ওঠে,

'ভবে সেই ত বাহাদুর
যে জন মায়ামুক্ত, যুক্ত হয়ে, ঘর বেঁধেছে মায়াপুর।'

* * *

তারপর একদিন সত্য সত্যই সন্ন্যাসীদের পরামর্শে বিষণ্নমনে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে এলেন নবীন সন্ন্যাসী কালিদাস। আবার বেরিয়ে পড়লেন লেখাপড়া সম্পূর্ণ করবার মানসে। এবারে পাঠাশ্রয় হলো যশোহর শহর। যশোহরের এক স্কুলে এনট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হলেন। সকলেই দেখলো অদ্ভুত এই ছাত্রটিকে। পায়ে জুতো নেই, গায়ে নেই জামা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। প্রশস্ত ললাট। আজানুলম্বিত বাহু, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, সমুন্নত দেহ। কথাবার্তা আচার আচরণে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে কোথায় যেন

একটা বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ঠিক স্কুলের একজন সামান্য ছাত্র বলে মেনে নিতে মন চায় না। ভুল করে সাধু মহারাজ বলেই মনে হয়। প্রচ্ছন্ন যোগী অবধূত সন্ন্যাসী কালিদাস এইভাবে আরও একটি বছর বন্ধু ও শিক্ষকদের সঙ্গে লীলা করে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়েই বেরিয়ে পড়লেন। দেশে ফিরে শ্মশানভূমিতে এসে অলৌকিকভাবে এক মহাপুরুষের দর্শনলাভ ও গৃহত্যাগ হলো। কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। সত্যসন্ধানী তরুণ তাপস কালিদাস মাঠ ঘাট প্রান্তর গিরিনদী আশ্রম মন্দির বাড়িঘর গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর ছাড়িয়ে পেছনে ফেলে চলেছেন যেন অনন্তের পথে, চির-আপনের সন্ধানে। পথেরও নেই শেষ, চলারও নেই বিরাম।

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ, কাশীর শ্রীত্রৈলিঙ্গ স্বামী, শ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতী, বৃন্দাবনের শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা, শ্রীহনুমান দাস বাবাজী, স্বামী অভীরানন্দ সরস্বতী, খাকী বাবা, এলাহাবাদের শ্রীমাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি ভারতের বহু প্রখ্যাত ও অজ্ঞাত মহাপুরুষের দর্শন, সঙ্গ ও স্নেহাশীর্বাদ লাভ করলেন। তন্ত্র ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ অনেক শিক্ষা ও অনেক জ্ঞান লাভ করলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত নগর মন্দির তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করে আবার একদিন ফিরে এলেন বাংলাদেশে, কুমারখালিতে, কাঙ্গাল হরিনাথকে দর্শন করতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অক্ষয় মৈত্রেয়, জলধর সেন, ফিকির চাঁদ ফকির ও শ্রীহট্টের সাধক শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কাঙ্গালের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হতেই, কাঙ্গাল চিনতে পারলেন প্রচ্ছন্ন যোগী পরিব্রাজক কালিদাসকে। সাদরে বসালেন আসরের মাঝখানটিতে। তারপর অনুরোধ করলেন ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে। অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের কথা শোনালেন অবধূত কালিদাস ভক্তমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। সকলেই মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করলেন নবীন সাধকের মুখনিঃসৃত অমৃতনিষ্যন্দী বাণী।

তারপর আবার একদিন কুমারখালিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চললেন সম্মুখের পথে সাধক কালিদাস। এবার সঙ্গ নিলেন প্রবীন সাধক শরচ্চন্দ্র। অবশেষে এসে উপস্থিত হলেন বহরমপুরে। সেখানেও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমবেত হলেন নবীন সাধকের মুখনিঃসৃত বাণী শুনবার জন্য। ওঁর মুখনিঃসৃত মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃভজন শুনে সকলেই মুগ্ধ হলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন নবীন

সাধকের স্কুল কলেজের শিক্ষার প্রশ্ন উঠলো। সাধক কালিদাসও অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, 'আমি এই বছর এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলাম, বোধ হয় ফেলই করেছি তাই আর ফল দেখি নাই।' সঙ্গে সঙ্গে গেজেট দেখে জানা গেল পাশ করেছেন। আবার সেইদিনই ছিল স্থানীয় কলেজে ভর্তির শেষ দিন। কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কালিদাসের পরিচয়ে এতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি নিজেই ভর্তি ফি দিয়ে ওঁকে কলেজে ভর্তি করে নিলেন।

কিন্তু পড়বে কে? বিশ্ববিদ্যালয়ের মামুলি লেখাপড়ায় মন বসলো না। তাই দেখা গেল এফ.-এ. ক্লাসের ছাত্র কালিদাস প্রত্যেকদিন ছুটির পর গঙ্গাতীরে বসে ভাবানন্দে বিভোর হয়ে স্বরচিত মাতৃসঙ্গীত করছেন।

* * *

তোমরা কি কেউ বলতে পার, কোথায় আমার মা।
আমি সারা পৃথিম খুঁজে, তাহার দেখা পেলাম না॥
সে বড় করুণাময়ী, আমি তার আদরের হই,
আমি, খেলতে খেলতে কোথায় এলাম, বুঝতে পারছি না॥
আমার মা যে দেশে আছে, সে দেশ ভরা ফলের গাছে,
এ দেশের লোক সে দেশে কি, কেউ যায় না আসে না॥
মা, চার হাতে কাজ করতে পারে, তিন নয়নে দেখতে পারে,
নাই তার বসন, চুং। বাঁধে না, বরণ তার শ্যামা॥
ভুলুয়া গায় চিনি তারে, আছে সে মোর মণ্ডপ ঘরে,
এখন, শিব তায় বুকে রাখে বলে তার নাম শিবাসনা॥

* * *

কত দেশ, কত সাগর, পাহাড়
তাঁহার লাগিয়া ঘুরিলাম।
কোথায় সে মোর কাঙ্গালের প্রভু,
কত জনে ডাকি শুধালাম॥
শুধাই যা, তাহা কেহ নাহি কহে,
কহে যাহা তাহা না বুঝিলাম।
আশার উপরে তবু আশা করি,
ঘুরিতেছি আমি অবিরাম।

জান যদি কেহ, দেও গো বলিয়া
কোথায় সে প্রভু প্রাণারাম।
ভুলুয়ার প্রাণ বাঁচাও বলিয়া,
দিন তার ঐ অবসান।

* * *

সপ্তাহ শেষ হয়, মাসের পর মাস চলে যায়। আবার আসে নূতন সপ্তাহ, নূতন দিন। আর একটি নূতন দিন! মনে হয় সুবিপুল তার বিস্তার, মুখে তার অনন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। হঠাৎ আলোক দোলায় দুলে উঠলো তাঁর অন্তর। দেখতে পেলেন হিমালয়ের হাতছানি। তপস্বী হিমালয়ের হাতছানি। ধ্যানমৌন মহিমময় হিমালয়। আর দেরী করেন নি প্রচ্ছন্ন যোগীবর। সবকিছু পিছনে ফেলে এগিয়ে চললেন হিমালয়ের পথে। সঙ্গী হলেন রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী। হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে পরিভ্রমণ করে, এসে উপস্থিত হলেন ভুটানে। ভুটানের মহাকাল দর্শন করে ফেরবার পথে জয়ন্ত নদের তীরে, জটাজুটশোভিত শুভ্রকান্তি এক ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ-লাভ করলেন। প্রণাম করতেই প্রসন্নবদনে মহাপুরুষ উভয়কেই আশীর্বাদ করলেন। তারপর আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্বকঠিন ভাবনাকে সরল করে সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল পরিক্রমা করে নিম্নভূমিতে এসে যোগীবর আর বহরমপুরে ফিরলেন না। ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন কুচবিহারে। কুচবিহারে এসে ছুটে চললেন মদনমোহনের মন্দিরে। ধূলিধূসরিত পায়ে আকুল অন্তরে প্রণাম করলেন জাগ্রত মদনমোহনকে। মদনমোহনকে নয়, গৃহদেবতা জনার্দন-চক্রকে। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে। মদনমোহন তখন মৃদু মৃদু হাসছেন আর দেখছেন তরুণ তাপস ভক্ত কালিদাসকে। ঠিক একই সময় প্রণাম করতে এসেছিলেন মদনমোহনকে কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক শ্রীমোহিনী-মোহন রায়। তিনি নবীন তাপস কালিদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেন এবং সাদরে আপ্যায়ন করে নিজগৃহে নিয়ে এলেন। সবকিছু শুনে কুচবিহার কলেজে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু কালিদাসের চঞ্চল মন বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ হলো না। ভোরবেলা অন্য ছেলেরা যখন পড়তে বসেছে

কালিদাস তখন নিরুদ্দিষ্ট। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তরুণ তাপস তখন ফুল তুলে বেড়াচ্ছেন মদনমোহন জীউয়ের পূজার পুষ্পপাত্র ভরে দেবার জন্য। কোথাও সংকীর্তন হলেই হোল খোল ঘাড়ে নিয়ে হাজির হ'তেন আর কৃষ্ণকীর্তনে মেতে উঠতেন। ওঁর স্বরচিত কীর্তন শুনে মুগ্ধ হতেন ভক্তবৃন্দ।

* * *

হরিনাম কি এতই মধুময়,
নামের তুলনা মিলিবার নয়॥
নামের অক্ষরে অক্ষরে যেন অমৃতের তরঙ্গ বয়।
হয় বল নাম মনে মনে, না হয় উচ্চ উচ্চারণে,
যেমন ইচ্ছা বল, এ নাম নিষ্ফলে যাইবার নয়॥
সুখে বল দুঃখে বল সম্পদে বিপদে বল,
সর্বত্র সমান শান্তি, নামে সদা বিতরয়॥
নামে রুচি জন্মে যাহার, এ বিশ্ব হয় মিত্র তাহার,
ভুলুয়া গায়, নামের জোরে, করে নরে মৃত্যু জয়॥

* * *

হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্।
জীবনে মরণে এবার হরি সহায় হরি বল॥
ভবে যার কেহ নাই, হরি তার মহাবল।
মহাপথে পথিকের, হরিণাম সম্বল॥
দূর হয় হরিনামে, বিপদের আঁখিজল।
হরিনাম যার মুখে, সেই জানে ফলাফল॥
সংসারের সন্তাপে হবি যদি সুশীতল।
ভুলুয়ারে বুকে ধর, শ্রীহরির পদতল॥

* * *

কৃষ্ণকীর্তনে মত্ত, ভাবানন্দে বিভোর মদনমোহনের সেবক ভক্ত কালিদাস এফ্-এ. পরীক্ষা দিলেন সত্য, কিন্তু পাশ করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে অধ্যাপক মোহিনী বাবু কুচবিহার ছেড়ে বহরমপুরে চলে গেছেন। তাইতো কালিদাস আশ্রয় নিয়েছেন ভক্তপ্রাণ উকিল শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের

গৃহে। ওঁর স্ত্রীও অপরিসীম স্নেহ করেন কালিদাসকে। আবার ওকে পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কালিদাস সে অনুরোধ রক্ষা না করে আবার নিরুদ্দেশ হলেন। এসে উপস্থিত হলেন রংপুরে। সেখানে এই সাধক ছাত্রটির উপর দৃষ্টি পড়লো মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্নের। ওঁর পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়ে নিজেরই টোলে ভর্তি করে নিলেন। যথাসময়ে কাব্যের পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন সাধক কালিদাস। অবশেষে মহামহোপাধ্যায়ের সুপারিশেই গোপালপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করলেন। বাসস্থান হলো জমিদার মণীন্দ্র রায়চৌধুরীর বাগান-বাড়ী। দিনে মাষ্টারী আর রাত্রিতে মাতৃ-সঙ্গীত রচনা ও মাতৃ-ভজন। কীর্তনের আসরে সঙ্গী হলেন রংপুরের এস-ডি-ও শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ধীরে ধীরে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন সাধক কালিদাস। বৃদ্ধ পিতা ও ভাই-বোনদের প্রতি নজর দিলেন। বিবাহসংস্কারও সম্পন্ন হোল। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হোল না। অল্পদিনের মধ্যে পত্নী সরোজিনী দেবী ইহলীলা সম্বরণ করলেন। এইজন্য বৃদ্ধ পিতৃদেব নীলমণিও মনের শান্তি হারিয়েছিলেন। একদিন নিজের অন্তিমকাল আসন্ন মনে করে উপার্জনক্ষম পুত্রের গলা জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করলেন দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার জন্য। আরও বললেন, 'তোমার সাধনার পথের বাধা হতে চাই না। তুমি সাধক হও। রামপ্রসাদ, কমলা-কান্তের মত গৃহী সাধক হও। তোমার মায়েরও এই ইচ্ছা ছিল।'

পিতার অন্তিম ইচ্ছা মাথা পেতে নিলেন কালিদাস। পিতৃদেবের ইহলীলা সম্বরণের পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন। পত্নী হলেন ভক্তিমতী কিরণময়ী দেবী। মধ্যমভ্রাতা ভুবনমোহন তখন উপার্জনক্ষম হয়েছেন। তারই উপর সংসারের দায়িত্ব দিয়ে আবার একদিন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন তাপস কালিদাস। স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিলেন। সংসার ও সাধনার জীবন একসঙ্গে গ্রহণ করে নূতন এক অনুভূতি লাভ করলেন। এ সংসারে আবদ্ধ জীবের আর্তি যে কতখানি তা হৃদয়ঙ্গম করলেন। সংসার-মায়ায় আচ্ছন্ন মানুষের অসহায়তা অন্তর দিয়ে করলেন উপলব্ধি এবং সংসারে থেকেই সংসার হতে মুক্তির পথ অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। গেয়ে উঠলেন,

মাতৃভাবের সাধক যে হয় চতুর সে নিশ্চয়,
সে পদ্মপত্রে নীরের মত সংসারে সংসারী হয়।

* * *

যতনে তারিণী-পদ হৃদয়ে রেখ
আর, 'তার মা তারিণী' বলে বদনে সঘনে ডেক।

* * *

তব নাম নিয়া যদি নয়নে না বহে নীর,
হৃদয়ে না জাগে প্রেমানন্দ
পুলকে পূরিত যদি নাহি হয় কলেবর,
রসনা না পিয়ে মকরন্দ ॥

* * *

সাধকের জীবনের আর একটি প্রভাত আলোকিত হয়ে উঠলো। প্রভাতসূর্যের স্বর্ণকিরণ এসে যেন পড়লো তাঁর মনোভূমির উপর। অজানা অদৃশ্য এক শক্তির হাতছানি তাঁকে টেনে নিয়ে এলো চন্দ্রনাথ তীর্থে। আবার সাক্ষাৎলাভ হলো ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর সন্ন্যাসীদের সংগে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ সরস্বতীজী। বুকে জড়িয়ে ধরলেন শিষ্যপ্রবরকে। তারপর বিধিমতে সন্ন্যাসীর দীক্ষায় দীক্ষিত করলেন। অবধূত আশ্রম প্রদান করলেন। অবধূত কালিদাস এখন থেকে কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করতে শুরু করলেন। মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী এবারে আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণে বহির্গত হলেন। শুধুমাত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিভ্রমণ নয়, ধর্মের নামে নীচতা হীনতা কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। প্রাণস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তিনি তীক্ষ্ণ বিচারশীল সমন্বয়ী দৃষ্টি দিয়ে মানুষ, সমাজ ও ধর্মকে দেখলেন এবং সেই সমন্বয়ী দৃষ্টিশক্তিকে সকল মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টায় হলেন ব্রতী। বিশ্বজননী কালীমাতাকে সম্মুখে রেখে, ধর্মবিমুখ ও ধর্মান্ধ মানুষকে শোনালেন ধর্মের মূলতত্ত্ব। মানুষকে বাদ দিয়ে ধর্ম নয়, মানুষের মঙ্গলের জন্য অগ্রগতির জন্যই ধর্ম। তাঁর 'ধর্ম ও অর্থ', 'ধর্ম ও কর্ম', 'ধর্ম ও ভাগবত' বক্তৃতাগুলি 'মেদিনীপুর হিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। তাঁর বক্তৃতার

প্রধান বিষয় থাকতো, 'নানা নামে উপাসনা করলেও হিন্দুজাতি একই পরমেশ্বরের উপাসনা করে।' এবং 'হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা'। বিশেষ করে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তিনি বক্তৃতা করতে লাগলেন। এজন্য তাঁকে বহুস্থানে নিগ্রহও সহ্য করতে হয়েছে। মুসলমানের মসজিদে গিয়ে বলতেন, "আমার গোবিন্দকেই এঁরা 'আল্লা' বলে উপাসনা করেন।" আবার গির্জায় গিয়ে বলতেন, 'পতিতপাবন যিশু তিনিই ত আমার ক্ষমার সিন্ধু নিতাই।' আবার বলতেন, 'সেই আদ্যাশক্তিই অনন্তমূর্তি ধরে অনন্ত দেশে অনন্ত ভাষায় পরিপূজিতা।'*

অবধূত ভুলুয়া বাবার একদিকে ছিল শাক্তোচিত বীরভাব, অপর দিকে ছিল বৈষ্ণবোচিত দৈন্য। দুই ভাবের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল তাঁর চরিত্রে।

তিনি বলতেন, 'দুর্বলের কোনও ধর্ম নেই। আগে হতে হবে উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক বলের অধিকারী। তারপর অনপেক্ষ হয়ে পা বাড়াবে সাধন মার্গে।' এই প্রসঙ্গে নিজের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করতেন ভক্তদের নিকট।

"আমি তখন প্রব্রজ্যার পথে বের হয়েছি। পথশ্রান্ত। ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। এসে ঢুকলাম এক পাহাড়ী গ্রামে। সেদিন ছিল হাটবার। পুরুষেরা বাইরে থাকায় মেয়েরা এগিয়ে এসে আশ্রয় দিল না। ক্লান্ত পদক্ষেপে ফিরে চললাম। গ্রামপ্রান্তে এসে দেখলাম, এক গৃহস্থ-বধূ কুঠার নিয়ে প্রকাণ্ড এক খণ্ড কাঠ চেরাই করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু চেষ্টা যে পরিমাণে সে করছে ফললাভ তদনুপাতে হচ্ছে না। ব্যাপারটি চোখে পড়া মাত্র সেখানেই নামিয়ে রাখলাম কাঁধের ঝোলা, মাথার পাগড়ি। তারপর অবগুণ্ঠিতা কুলবধূকে বললাম, 'সরে দাঁড়াও ত মা, দেখ আমি কি করি।' অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়িটি চিরে ফেলে কুড়ুল রেখে বিশ্রাম করতে লাগলাম। তখন আমার শরীর হতে অবিরল ধারে স্বেদ নির্গত হতে লাগলো। প্রীত হলো কুলবধূ। এমন সময় হাট সেরে একে একে গ্রামের পুরুষেরা ফিরছিল সেই পথে। তারা আমার কাণ্ড দেখে আর বধূটির মুখ থেকে সবকিছু শুনে মুগ্ধ চিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলো।

* 'অবধূত ভুলুয়া বাবা'—শিষ্য-ভক্ত লেখক শ্রীহরিদাস ঘোষের রচনা হতে গৃহীত।

আর কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি স্বরূপ ভাল আহার ও আশ্রয়ের সুবন্দোবস্ত করে ফেললো।" তারপর সমাগত ভক্তদের উদ্দেশে প্রাণভরা হাসি হেসে ভুলুয়া বাবা বললেন, 'বুঝলে বাবারা, সে রাত্রে সে গ্রামে একসঙ্গে আমার দশ বাড়ী নেমন্তন্ন।'

এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি রচনা করলেন গান,

সে কি ভক্ত হয়!
যে জন হয় না নিজে অনপেক্ষ, সকল কাজে দক্ষ নয়॥
খাওয়ার যাহার আছে প্রয়োজন,
যদি লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যেতে না ওঠে তার মন,
তার ঠাকুর সেবার অন্ন কোথায়, অন্নকষ্ট সব সময়।
সে কি ভক্ত হয়!

* * *

বিদেশে রাজাধিরাজের দরবারে প্রচুর সম্মানলাভ করে স্বগ্রামে ফিরেছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঘিরে আছেন। এমন সময় প্রতিবেশী কৃষক দরিদ্র ভক্ত ছমুদ্দু মিঞা 'সালাম' জানিয়ে সম্মুখে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন প্রতিবেশী কৃষকটিকে। মহাত্মা ভরে দিলেন দরিদ্রের হৃদয়.

একবার এক গ্রামের মন্দিরে অতিথি হয়েছেন ভুলুয়া বাবা। সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ওঁকে ঘিরে রেখেছেন। সাধুবাবার আগমন সংবাদ শুনে গ্রামের এক দরিদ্র চাষী তার খেত থেকে এক চুপড়ি আলু নিয়ে সাধু সেবার জন্য এসে উপস্থিত। সাধুবাবা তখন স্নানে গেছেন অদূরে এক জলাশয়ে। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, 'সাধুবাবা ওসব খান না। তুমি চুপড়ি নিয়ে যাও।' সরল দরিদ্র চাষী দুঃখিত মনে ফিরে চললো। সেই পথেই স্নান সেরে আসছিলেন ভুলুয়া বাবা। তিনি চাষীর মনের অবস্থা বুঝে, তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে চুপড়ি সমেত আলু গ্রহণ করে বললেন, 'বাঃ, খাসা জিনিস এনেছ বাবা, কতকাল এসব জিনিস খাইনি। এস এস বাবা।' বলেই কাছে বসিয়ে আদর আপ্যায়ন করলেন। সরল দরিদ্র চাষী মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলো সাধুবাবার ব্যবহারে। সাধুবাবার দৈন্য দেখে

গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিস্মিত ও হতবাক হলেন। হাত জোড় করে ওঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, 'বাবা, আমাদের দোষ নেবেন না, সাধু মহাত্মাদের সঙ্গে ঐখানেই-ত আমাদের পার্থক্য।' ভুলুয়া বাবা আর কি বলবেন, মৃদু হাসতে লাগলেন।

তিনি সর্বাধিক বেদনা বোধ করতেন ভগবানের দরবারে এসেও উচ্চ নীচ ভেদাভেদ দর্শন করে, হিন্দুজাতির মধ্যে অগণ্য সম্প্রদায় ও তাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে মল্লযুদ্ধ দেখে, আচার-অনুষ্ঠানের নামে দুর্নীতি ও কুসংস্কার দেখে। তিনি বল্লেন, 'হিন্দুর মধ্যে সকল ভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করতে হলে যদি সমগ্র জাতিকে বৈষ্ণব হতে হয় তবে তাই হোক। চূর্ণীকৃত শিলাখণ্ড একত্রিত হোক, আবার কঠিন প্রস্তরে পরিণত হোক। বলীয়ান হোক্।" সাধক কবি গেয়ে উঠলেন,

এখনো যদি উঠবি তোরা শক্তি ধর।
শক্তিতত্ত্ব অবলম্বি, অবতারের পূজা কর॥
শক্তি পূজতে শক্তিমানের পূজা পরচার,
লোকাতীত শক্তি হলে তার নাম অবতার।
কেন শক্তি ছাড়ি, ব্যক্তি ধরি, লড়াই করিস পরস্পর॥
ইতর তর্ক রাম বড় কি বড় হনুমান
যিনি রুদ্রাবতার হনু, তিনিই প্রভু রাম।
তোরা হিংসা-নিন্দা ভুলি এখন এক পথে হ' অগ্রসর॥

*　　　*　　　*

রচনা করলেন শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী গ্রন্থ। সাধক সমাজ এবারে ভুলুয়া বাবাকে শাক্ত জগতের এক শক্তিমান সাধক বলে ঘোষণা করলেন। গ্রন্থ মাধ্যমে নীতিকথাগুলো প্রাণস্পর্শী ভাষায় বললেন সাধক ভুলুয়া বাবা।

শত্রুর পাদুকা বহি কার ভাই যায়?
যার ভাই ভাই ছাড়ে পর প্রত্যাশায়।
বিনা দণ্ডে কোন্ প্রাণী দংশে ধরাতলে?
পর-কর্ণে যাহারা পরের কথা বলে।

কোন্ স্নেহময় পিতা শত্রুসম হয় ?
সন্তান-সুশিক্ষা তরে উদ্যোগী যে নয়।
এ সংসারে সুযোগের দস্যু কোন্ জন ?
বিবাহে শ্বশুর-গৃহ যে করে লুণ্ঠন।
কোন্ প্রাণীদেহে বর্তে দুই মলদ্বার ?
একমুখে দুই কথা অভ্যাস যাহার।'

* * *

আবার রচনা করলেন পদাবলী 'শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী'। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। কীর্তনীয়া পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত রামকমল ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীব্রজমাধুরীর 'কাহে এহি চঞ্চলা হওবি শ্রীরাজনন্দিনী' পদটি শ্রবণ করে বললেন, 'সমগ্র মহাজন পদাবলীর মধ্যে স্বাধীনভাবে তুলনা করলে এ রকম পদ অল্পই পাওয়া যায়।' শ্মশানদাস বাবাজী ও স্বামী অভীরানন্দ মহারাজ ত ভুলুয়া বাবাকে কোলে করে চুম্বন করে বল্লেন, 'এ ত মুখ নয়, এ যে শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণকমলের পবিত্র রজ। সে রজ না হলে কি এ-হতে এমন ললিত মধুর লীলাকীর্তন অঙ্কুরিত হতে পারে?' সমগ্র বঙ্গভূমির বৈষ্ণব সমাজে কালীসাধক ভুলুয়া বাবা পরমবৈষ্ণব বলে প্রচারিত হলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রত্যাগত ভুলুয়া বাবাকে দর্শন করে বিশ্বরূপ গোস্বামী বল্লেন, 'এইবারই আপনাকে ঠিক বৈষ্ণব বাবাজীদের মত দেখতে হয়েছে।'

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯১৪ খৃঃ) অবধূত ভুলুয়া বাবা ঠাকুর হরিদাসের সাধনভূমি বেনাপোলে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় বৈষ্ণব ভোলানাথ গোঁসাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে, সম্মিলিত চেষ্টায় হরিদাস ঠাকুরের সাধনভূমিকে জাগ্রত করে তোলেন। বেনাপোলের পাটবাড়ীতে মন্দির নির্মাণ ও শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের জীবনীও রচনা করলেন।

আবার সাধক কমলাকান্তের জীবনী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বর্দ্ধমানে এসে উপস্থিত হলেন। ভুলুয়া বাবার পরিচয় পেয়ে মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপ

বাহাদুর সসম্মানে নিজ প্রাসাদে নিয়ে এলেন এবং জীবনী সংগ্রহের ও থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। মাসাধিককাল পরিশ্রম করে তিনি তন্ত্রাচার্য কমলাকান্তের জীবনী রচনা করলেন। সে রচনা বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে পঠিতও হয়েছিল।

আবার একদিন সবকিছুকে পিছনে ফেলে চলমান জলধারার মত ভুলুয়া বাবা ভেসে চললেন দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে। পথ দীর্ঘ দুর্গম উপলবন্ধুর। সমতল বঙ্গভূমিকে পিছনে ফেলে যাত্রা করলেন পশুপতিনাথকে দর্শন করতে নেপাল রাজ্যে। শ্রীশ্রীপশুপতিনাথ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হলো তাঁর অন্তর। তখন বাংলা তেরশো ছাব্বিশ সাল। ইংরাজী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ। একরকম নিঃসম্বল অবস্থায় ব্যাকুল অন্তরে ছুটে চললেন নেপাল অভিমুখে। অবশেষে একদিন এসে পৌছুলেন নেপালে। দর্শন করলেন পশুপতিনাথকে। শান্ত হলো আর তৃপ্ত হলো অন্তর। ভক্ত শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ সরলরঞ্জন দাশগুপ্তের মধ্যস্থতায় পরিচিত হলেন নেপালের প্রধান সেনাপতি রুদ্র সাম্‌সের জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে। তিনি ভুলুয়া বাবার মুখনিঃসৃত শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব ও হিন্দুদর্শনের মূলতত্ত্বকথা শুনে মুগ্ধ হলেন এবং নেপালরাজের সম্মানিত অতিথি হিসাবে গ্রহণ করলেন অবধূত ভুলুয়া বাবাকে। ভুলুয়া বাবা নেপালের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও শ্রীশ্রীপশুতিনাথ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও রচনা করলেন। তারপর একদিন রাজ-অতিথি রূপে তাঞ্জামে চড়ে সেই পথ দিয়েই ফিরে এলেন, যে পথে মাত্র একমাস পূর্বে ক্ষুধায় কাতর নিঃসম্বল দরিদ্র তীর্থযাত্রীর মত বাবা পশুপতিনাথ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি ছুটে এসেছিলেন।

স্বগৃহে ফিরেও দিন কাটাতেন নিরলস গৃহস্থের মত। এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। কখনও পুকুরের ঘাট বাঁধেন, গরুর জাবনা কাটেন, বাগান কুপিয়ে শস্যাদির বীজ ছড়ান, নয়তো অক্লান্তভাবে লিখে চলেন ব্রহ্মময়ী মায়ের লীলাতত্ত্ব। আবার কখনও আম-কাঁঠালের ছায়ায় একখানি জলচৌকি পেতে বসে গান ধরেন,—

ঐ দুখ মনে রল গো মা।
মহাবিদ্যা মা থাকিতে অবিদ্যা আমার গেল না॥

মুক্তিরূপা হও মা তুমি, আমি সই বন্ধন যাতনা।
কেন হাতের খড়্গে বন্ধন কাটি আমায় মুক্ত করিলে না॥

*　　　　*　　　　*

এখানে আসার, কথা ত ছিল না,
তবু কেন হেথা আসিলাম।
কোন্ প্রয়োজনে, কে আনিল হেথা,
তাহাও ত নাহি বুঝিলাম।
মোর মত দীন অধমের প্রভু
আছে একজন শুনিলাম।
আশায় আশায় তাই বুক বাঁধি,
তায় দেখিবারে ছুটিলাম॥

*　　　　*　　　　*

দীক্ষা ত বীজবপন মাত্র। জমি উর্বরা হলে মাটিতে পড়ামাত্র বীজ লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে। বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। তাই মানুষের চিত্তভূমিকে উর্বরা করে তোলাই সর্বপ্রধান কাজ। চিত্তশুদ্ধি হলেই চিত্তভূমি উর্বরা হয়। যার চিত্তশুদ্ধি নেই তার কোন ধর্মই নেই। যাঁর চিত্তশুদ্ধি আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান ও শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হয় কি ভাবে? ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা। কেবল যোগ বা তপস্যা করলেই ইন্দ্রিয়সংযম হয় না। কর্মক্ষেত্রে সংসারধর্মেও ইন্দ্রিয়সংযম হয়। তাইতো লোক-শিক্ষক শিক্ষা-গুরু অবধূত ভুলুয়া বাবা সাধনার অনুকূল করে মানুষের চিত্ত ও চরিত্র গঠনের কাজটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নিজেকেও তিনি কোনদিন কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখেন নি। গলায় তিনি রুদ্রাক্ষ ও তুলসী ধারণ করতেন। এইভাবে বিপরীত দুই আদর্শকে একই হৃদয়ে সুসমঞ্জস করে নিয়েছেন। তাইতো দেখা যায় অন্য গুরুর কাছে দীক্ষিত ব্যক্তিও তাঁর আসনের চারপাশে এসে ভিড় করেছে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ লাভের আশায়। ভুলুয়া বাবার মন্ত্রশিষ্যের চেয়ে ভক্তের সংখ্যাই ছিল বেশী। আর এঁরাই ওঁর সাংসারিক জীবনের অভাবে চরম মুহূর্তে নানাভাবে সাহায্য করতেন। পাবনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রে

ধর্মপ্রাণ ভক্তপ্রবর শ্রীচুণীলাল মুখোপাধ্যায় সহস্রাধিক অর্থ ব্যয়ে সাধকের পল্লীগৃহ উত্তমরূপে নির্মাণ করে দেন। মৌরীগ্রামের ভক্ত শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী এবং শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী ভুলুয়া বাবাকে আজীবন সেবা শুশ্রূষা করেন। বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীই শিষ্য-ভক্ত মহলে 'মৌরীর মা' বলে পরিচিত হয়েছিলেন। উপার্জনশীল ভ্রাতা ভুবনমোহনের অকালমৃত্যুতে সংসার প্রতিপালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে যখন পড়লো যোগীবরের উপর, তখন এই ভক্তমণ্ডলীই তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। অর্থচেষ্টায় ইষ্টের পথ পরিত্যগ করে দাসত্বের পথ বরণ করা তখন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবসন্ন অন্তরে সাধক কবি গেয়ে উঠলেন,

'আমার বল তুমি মা, ভরসা তুমি মা, তোমা বই আর কিছু জানিনে।
তোমা ভিন্ন ভবে কবে কি সম্ভবে জেনে তাই আর অন্য ভাবিনে॥'

* * *

অন্তরে যা গোপন আছে তা তুমি জান আর আমি জানি,
আর জানেন শিব দেবাদিদেব যাঁয় পদে রেখেছ তুমি।
অভাবপূর্ণ এ সংসারে, অর্থের আশায় সবাই ঘোরে,
আমি পেয়েছি এক পরশ পাথর গোপনে রেখেছি আনি॥
এখন ধনীর মত বেড়াই নেচে, লোকে ভাবে কি পেয়েছে,
কেহ ভাবে কূল না পেয়ে, কেবল করে কানাকানি॥
মোহমুক্ত মানুষ যারা, কিছু ঠিক পেয়েছে তারা,
তাই ত আমার ঘরের কথা, কয়ে বেড়ায় শুনাশুনি॥
ভুলুয়া গোপনে বলে, কাজ কি যেয়ে কোলাহলে,
পেয়েছ ধন রেখো গোপন, শ্যামা মায়ের পা দুখানি॥'

* * *

নিঃসন্তান সরোজিনীর মত দ্বিতীয়া স্ত্রী কিরণময়ীর মনেও দুঃখ বড় কম ছিল না এমন ভ্রমণশীল উদাস সন্ন্যাসী স্বামীটিকে নিয়ে। তবে কিরণময়ীর ক্ষেত্রে ক্লেশ সহনীয় হয়ে উঠেছিল তাঁর তিনটি শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে। কিন্তু কালীমায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই অকস্মাৎ একদিন ১৩৩৮ সালের ২০শে

আশ্বিন ভক্ত ভগবতীচরণ পালের গৃহে চুঁচুড়াতে ইহলীলা সম্বরণ করলেন কিরণময়ী দেবী। সহধর্মিণীকে হারিয়ে বৃদ্ধ বয়সে সাধক কবি সংসার-সাগরের এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবর্তের মধ্যে যেন নিক্ষিপ্ত হলেন। কিন্তু কালীর কৃপা কালিদাসের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ছিল চিরদিন। শরণাগত সন্তানের উপর মা কালী দায়িত্বের বোঝাও যেমন চাপিয়েছেন, বোঝার বাহকও পাঠিয়ে দিয়েছেন। অকস্মাৎ একদিন সহসা স্বপ্নাদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে এক সঙ্গতিপন্না মহিলা ভক্ত এসে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন ভুলুয়া বাবার নিকট। ভুলুয়া বাবাও তাঁকে 'মা' বলে আশ্রয় দিলেন। দিনে দিনে মহিলা ভক্তটির অতুলনীয় ত্যাগ, সেবা, দীনতা ও আত্মাহুতির মহিমা দর্শন করে ভক্তমণ্ডলী অভিভূত হয়ে বললেন, এসবই কালী মায়ের কৃপা। তাঁরই প্রেরিতা কৃপা-কিঙ্করী ছাড়া কিছুই নয়। বাল্যাবধি সরল অকপট হৃদয়ে মা-ভাবের উপাসনায় তিনি এমন এক সহজ সন্তান ভাবের অধিকারী হয়েছিলেন যে, তাঁর কর্মময় জীবনের ছোট বড় সকল কাজের মধ্যে, গম্ভীর ব্যক্তিত্ব ও বীরোচিত তেজস্বিতার মধ্যেও সর্বদাই পরিস্ফুট হয়ে উঠতো এক আত্মভোলা চঞ্চল শিশুসত্তা। বিশ্বজননীর কোলে বিরাট শিশুর যেন বিচিত্র খেলাধূলা।

সাধক কবি গেয়ে উঠলেন,

'শ্যামা মা যার সঙ্গের সাথী সে কি শমন ডরায় তোরে।
সে কালী নামের ডঙ্কা মেরে নাচেরে আনন্দ ভরে।'

* * *

'জগদ্ধাত্রী তুমি যখন জগৎ যখন তোমার পায়,
দুঃখ যা দিবে সইতেই হবে দুঃখ বলি আর কি দুঃখ তায়
যতক্ষণ বল আছে বুকে, ততক্ষণই সইব দুখে,
দুখের ভারে মরব যখন তখন দুঃখ আর দিবি কায়॥'

* * *

মাসের পর মাস। বছরের পর বছর চলে যায়। আবার আসে নূত দিন, নূতন মাস, নূতন বছর। প্রতি দিবসের মতই আসে সাধকের জীব আর একটি নূতন দিন! সাধকের জীবনসূর্যও ধীরে ধীরে এসে দাঁড়া

অস্তাচলের পথে। একান্ত শরণাগত ভক্তের একমাত্র মায়ের কোল ছাড়া মায়ের কাছে আর কিছুরই দাবি ছিল না। সাধক কবি গেয়ে উঠলেন,

দিন ত ফুরায়ে গেল তারা
সান্ধ্য গগনে দেখা দিল সন্ধ্যা তারা।

জীবনব্যাপী মাতৃ-বন্দনার এখন সায়ংকালীন সন্ধ্যারতি। কোলের ছেলে আবার যে মায়ের কোলে ফিরে যাবেন। তাইতো হঠাৎ কোথা থেকে আসে ঘুম—গভীর, সুমধুর ঘুম। কলকাতায়-বিডন স্ট্রীটের এক ভক্তগৃহে ১৩৪৭ সালের ১৩ই চৈত্র (ইং ১৯৪১ খৃঃ ২৭শে মার্চ) সকাল ৭-২০ মিনিটে, শ্যামাপদ-নীলকমলে তিনি চিরবিশ্রাম লাভ করতে চলে গেলেন। অবধূত ভুলুয়া বাবা চিরদিনের জন্য মহাসমাধিতে হলেন নিমগ্ন। উনআশি বছর বয়সে। তখনও যেন সাধক কবির কণ্ঠ হতে ভেসে আসছে,

এখনো যদি উঠবি তোরা শক্তিপূজা ধর,
শক্তিতত্ত্ব অবলম্বি, অ তারের পূজা কর।

* * *

যে যা বলে ডাকে, সে ডাক শুনে একজন,
ধন্য সে, যে ভেদ-শূন্য, প্রেমে পূর্ণ মন।
ভুলুয়া গায় শক্তি পূজি শক্ত করেক্ কলেবর॥

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

যন্ত্রণায় আরক্ত দুই চক্ষুর জল গোপন করে রাত্রির শেষ প্রহরে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে ছুটে চলে আসে বালক। ভাগীরথী-কূলের নিরালায়। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে ভাগীরথীর জললহরীর দিকে। আর ভাবে মনে, এই উত্তাল ভাগীরথীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কুক্কুর-দংশনের অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে করবে সে মুক্তিলাভ। অশান্ত হয়ে ওঠে মন। আর একবার তার বিচলিত চোখের দৃষ্টি তুলে, ভাগীরথীর জল আর অন্ধকারের দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে নদীজলে বিসর্জিত প্রতিমার মত ডুবে যেতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে অদূরে স্নানরত এক সন্ন্যাসীর হৃদয় হলো বিদীর্ণ। চীৎকার করে দৃঢ় স্বরে বললেন,—ক্ষান্ত হও বালক। অকস্মাৎ বাধা পেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। নিকটে এসে সৌম্যদর্শন সেই সন্ন্যাসী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন,—বৎস! এ তুমি কি করতে যাচ্ছিলে? আত্মহত্যা যে মহাপাপ। তোমার মত নিষ্পাপ বালকের আবার কিসের দুঃখ?

অসহায়ের মত করুণভাবে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। পরমূহূর্তেই মন্ত্রচালিতের মত উঠে আসে তীরে। মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে মহাপুরুষের পায়ে। চোখের জলে সিক্ত হয়ে ওঠে সেই সৌম্যদর্শন যোগীবরের চরণকমল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করে বালক কুকুরে কামড়ানোর সুতীব্র যন্ত্রণার কথা। চিকিৎসার্থে এসেছে সে আত্মীয়-গৃহে। কিন্তু চিকিৎসাতেও কোন ফল হোল না। তাইতো এ যন্ত্রণার হাত থেকে পেতে চায় সে মুক্তি।

সন্ন্যাসী সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে বালককে আশ্বাস দেন। তারপর বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদু হেসে বল্লেন,—বৎস! এই তোমার দুঃখ? এরই জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছিলে? চিন্তা ক'রো না। এখনই সেরে যাবে তোমার জ্বালা-যন্ত্রণা।

যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের পূতস্পর্শে বিভূতি সঞ্চারিত হলো বালকের সর্ব অঙ্গে। দেহে। মনে। জীবনে। সত্য সত্যই সন্ন্যাসীর মঙ্গলহস্তের

স্পর্শে কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই বালক কুকুরে কামড়ানোর বিষ-যন্ত্রণার হাত থেকে পেলো মুক্তি। জ্বালা-যন্ত্রণার কোন অনুভূতিই রইলো না তার অন্তরে। পরিবর্তে দেহ মনে অনুভব করতে লাগলো অপার সুখ ও অজানা এক আনন্দের শিহরণ। আনন্দ·····আনন্দ······ওগো মহানন্দ···আনন্দ অপার। . তার হৃদয়তন্ত্রী কার মধুর স্পর্শে যেন এক অতি সুমধুর তানে উঠলো বেজে। অভিভূত বালক, অপার বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় আকুল দুই চোখের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলো সেই সৌম্যমূর্তির মুখের দিকে। তারপর মহাপুরুষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আত্মীয়গৃহে ফিরে এলো সে।

অজানা এক আকর্ষণে আকুল হোল বালকের প্রাণ। মনোজগতে সৃষ্টি হোল আলোড়নের। দেহ মন প্রাণ হোল আচ্ছন্ন পরমানন্দের আভাসে। যোগীবরের সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা তাকে যেন পেয়ে বসলো। পরের দিন অপরাহ্ণে আবার ছুটে এলো সে ভাগীরথীর তটে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায়।

বিস্মিত হয়ে দেখলো অভাবনীয় এক দৃশ্য। সৌম্যদর্শন সেই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে পুনঃ পুনঃ ডুব দিচ্ছেন আর জলরাশি ওঁর গাত্র বেষ্টন করে স্তম্ভাকারে ওপরে হচ্ছে উত্থিত। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। এইভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে সে জানে না। জানতে পারলো তখনই, যখন সূর্যদেব অস্তাচলগামী হলেন। ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। সন্ন্যাসী ঠাকুর আহ্নিকে বসলেন। ভাগীরথীর তটে। অলৌকিক দৃশ্য। আচমন করবার জন্য নেই কোন জলপাত্র। গঙ্গার জল প্রয়োজন হওয়ায় হাত প্রসারিত করে দিচ্ছেন আর কূল ছাপিয়ে জল এসে যোগীবরের হাতের উপর উপছে পড়ছে। যতবারই প্রয়োজন হচ্ছে ততবারই গঙ্গাবারি এসে তাঁর হাতে দিচ্ছে ধরা। অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। আর নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না সে। ছুটে এসে আছড়ে পড়লো মহাপুরুষের চরণে। ব্যাকুল হয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বল্লো,—বাবা, আপনিই আমার জীবন বাঁচিয়েছেন, আপনিই আমার গুরু। আপনার চরণে আমায় স্থান দিন। আমি আর ঘরে ফিরে যাবো না।

যোগীবর বালককে কাছে টেনে নিয়ে প্রীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললেন,—ওরে, সময়ে সব হবে। সদ্‌গুরু মিলে যাবে। বিচলিত হোস্ না।

কিন্তু বালকও নাছোড়বান্দা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলে ওঠে, ঠাকুর! কৃপা করো, কৃপা করো আমাকে।

মহাপুরুষ বালকের বিচলিত মনকে শান্ত করবার জন্য কানে বীজমন্ত্র দিয়ে বললেন,—যা, বীজমন্ত্র দিয়ে দিলাম। জপ কর্‌গে। অধীর হোস্ নে। সময়ে সব হবে।

মহাযোগী প্রদত্ত বীজমন্ত্রের প্রভাবে বালকের হৃদয় ও মন হলো শান্ত। বালকের বিস্ময়াপ্লুত অন্তরের সকল কৌতূহলকে শান্ত করে দিয়ে অকস্মাৎ একদিন অন্তর্হিত হলেন সেই সৌম্যমূর্তি মহাপুরুষ। আর বালকও হুগলীর আত্মীয়গৃহ থেকে ফিরে এলো নিজ গ্রামে—নিজ গৃহে। ভিন্ন এক মন নিয়ে। উদাস অনাসক্ত ভাব। ঘুরে বেড়ায় শ্মশানে মশানে। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে রচনা করে কবিতা, গান। মাঝে মাঝে তার মন আকুল হয়ে ওঠে কিসের না জানি এক আকর্ষণে! বুঝেও বোঝে না। ধরেও ধরতে পারে না। অপরিচিত—কিন্তু যেন মনে হয় চির-আপনের হাতছানি! কৃষ্ণের বাঁশীর যেন সেই মর্মান্তিক সুর। যে সুরে আছে ঘর ভাঙ্গার, কুল ভাঙ্গার আহ্বান। এক অলৌকিক পরমানন্দের আভাস। দেহ মন হয়ে যায় অবশ অসাড়। ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ে। এ যে অসীমের অনুভূতি! মর্মে মর্মে অনুভব করে নব-চৈতন্যের প্রাণশক্তি।

এই বালকই হলেন বণ্ডুল গ্রামের ভোলানাথ। ভোলানাথ সাধু। আর ভবিষ্যতের 'বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস'।

সেদিন এইভাবে ভাগীরথী তটের নিরালায় ভবিষ্যতের যোগীরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের সাধক জীবনের বীজ বপন করেছিলেন সেই সৌম্যমূর্তি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীনীমানন্দ পরমহংস। বাংলা ১২৬২ সনের ১৯শে ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ এই শিবকল্প মহাপুরুষ আবির্ভূত হন পৃথিবীর মাটিতে। মানবলোকে। গ্রামের নাম বণ্ডুল। বর্দ্ধমান সহর থেকে ১৪ মাইল দূর। পিতা শ্রীঅখিল চট্টোপাধ্যায়। মাতা রাজরাজেশ্বরী দেবী। পিতা ছিলেন ধর্মপ্রাণ সৎ প্রকৃতির মানুষ। মাতা ছিলেন বুদ্ধিমতী ও ভক্তিমতী রমণী। পিতা নাম রাখলেন ভোলানাথ। আর মা আদর করে ডাকতেন 'ভুরি' বলে।

আনন্দময় ছোট্ট সংসার। নবজাত এই শিশুটিকে ঘিরেই যেন বসে যায় আনন্দের হাট। বড় ভাই ভূতনাথেরও আনন্দের সীমা নেই চপলমতি ছোট ভাইটিকে নিয়ে। আনন্দ···আনন্দ···আর আনন্দ। গৃহের এই আনন্দময় পরিবেশে শীঘ্রই কিন্তু নেমে এলো এক দুর্দৈব। কৃষ্ণমেঘের কালোছায়া পতিত হলো ছোট্ট এই পরিবারটির উপর। অকস্মাৎ পিতৃদেব করলেন ইহলীলা সংবরণ। জন্মের ছয়মাসের মধ্যেই পিতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হলো শিশু ভোলানাথ। ব্যথাতুরা জননীর নয়নের মণি আর খুল্লতাতের স্নেহের ধন হলো সে। রাজরাজেশ্বরী দেবীর তখন অসহায় অবস্থা। সেই মহাদুর্দিনে এই ছোট্ট পরিবারটির সমস্ত দায়িত্ব স্বইচ্ছায় গ্রহণ করলেন শিশুর খুল্লতাত চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। চন্দ্রনাথ ভোলানাথের পিতার সহোদর ছিলেন না। সত্যসন্ধ ধর্মপ্রাণ চন্দ্রনাথের হৃদয় হলো বিগলিত পবিত্র শিশুর মুখপদ্ম দর্শন করে। চন্দ্রনাথের ছেলে মেয়ে সকলেরই আদরের দুলাল হলো শিশু ভোলানাথ। নবজাতক নির্মল হাসির মধ্য দিয়ে সমস্ত গৃহকে করে তোলে পরিপূর্ণ। নিঃসঙ্গ মাতার প্রতিটি মুহূর্তকে করে তোলে কর্মময়। পলকে মধুময় করে তোলে তাঁর জীবন।

দিনে দিনে শিশু বড় হয়ে ওঠে। সপ্তাহ শেষ হয়। মাসও চলে যায়। আবার আসে নূতন সপ্তাহ। প্রতি দিবসের মতনই আসে শিশুর নিকট আর একটি নূতন দিন। মনে হয় সুবিপুল তার বিস্তার। মুখে তার অনন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। যে অজানা শক্তি তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ যেন তা সুবিপুল হয়ে ওঠে। তার ছোট্ট শিশু-দেহের বদ্ধ-কারায় যেন গর্জন করে উঠতে থাকে দুরন্ত সাগর-তরঙ্গ। সীমাহীন শিশুর সত্তা,·······যা কিছু আছে ব্রহ্মাণ্ডে সবই যেন আছে তার ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে।

মাসের পর মাস চলে যায়। বছরের পর বছর। প্রতিবেশীদের আনন্দ-ধনরূপে সে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে। বাল্যের লীলাভূমি হোল গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির আর শ্মশানভূমি সন্নিহিত বটতলা।

বাল্যকাল হতেই ভোলানাথের অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। বাংলা আর সংস্কৃত ভাষা অতি অল্প বয়সেই আয়ত্ত করে ফেললো সে। অন্তরের

অনির্বচনীয় আনন্দ-বেদনাকে রূপায়িত করতে লাগলো সঙ্গীতে। কবিতায়। বালক ভোলানাথের অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে খুল্লতাত চন্দ্রনাথ তাকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু ভোলানাথ ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণে শুধু অনিচ্ছা প্রকাশ নয়, বিরোধিতাও করল। অবশেষে গ্রামের পাঠ সমাপন করে বর্দ্ধমান শহরে এসে সংস্কৃত শিক্ষায় করলো মনোনিবেশ। কিন্তু শিক্ষা সম্পূর্ণ হলো না। দুর্জ্ঞেয় ঐশী বিধানে। অকস্মাৎ কুকুরের দংশনের জন্য চিকিৎসার্থে চলে এলো সে হুগলীতে। আত্মীয়গৃহে। চন্দননগরের সন্নিকটে। সে সময় চন্দননগরের গোঁদলপাড়া ছিল কুকুর-শৃগালের দংশনের প্রধান চিকিৎসা-ক্ষেত্র। চিকিৎসা হোল। কিন্তু যন্ত্রণার হোল না উপশম। সুতীব্র যন্ত্রণায় অস্থির সর্বদা। দেহে মনে শান্তি নেই বালক ভোলানাথের। এ উপসর্গ তো ছিল না! কোথা থেকে এলো? কেন এলো? কেন তাকে কুকুরে কামড়ালো? চিকিৎসায় কোন ফল হোল না। এ যন্ত্রণার হাত থেকে কেন পরিত্রাণ পাচ্ছে না সে? ভগবান কি তার উপর বিরূপ? নিজেকে প্রশ্ন করে করে কোন উত্তর পেলো না ভোলানাথ। অবশেষে স্থির করলো ভাগীরথীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এ যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে সে। পরমুহূর্তেই এই অভাবনীয় ঘটনার হলো সম্মুখীন। অলৌকিক ভাবে যোগাযোগ হোল এক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গে। ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ভিতর দিয়ে সুরু হলো তার আধ্যাত্মিক চেতনার। লৌকিক জীবনের অশুভ ঘটনাই তার অলৌকিক জীবনের শুভ ঘটনার করলো সূত্রপাত। রোগমুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলো মায়ের স্নেহের ধন—ভুরি। ভোলানাথ। ভোলা মন নিয়ে। তখনও অসীমের অনুভূতি তার অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মর্মে মর্মে অনুভব করে নবজীবনের স্পন্দন। পুলক শিহরণ জাগে তার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে—শিরার উপশিরায়। বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলে যেন নব চৈতন্যের প্রাণশক্তি। দেহে মনে প্রাণে।

আবার শুরু হোল সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ। বর্দ্ধমানে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হলো। বছর ঘুরে এলো। এখনও সে বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে ভাবে মনে, কে এই মহাপুরুষ? হৃদয়াকাশে সেই মূর্তিই

দেখতে লাগলো। ভুলতে আর পারে না। যতই ভাবে সেই সন্ন্যাসীর কথা, এক অনির্বচনীয় আনন্দে অন্তর তার হয় পূর্ণ।

এইভাবে কিছুদিন যায়।

হঠাৎ ঢাকা শহর থেকে এলেন এক মুসলমান ভদ্রলোক বর্দ্ধমান শহরে। অদ্ভুত এক সাধুব কথা বললেন তাঁর বন্ধুর কাছে। থাকেন রমনার জঙ্গলে। বুড়িগঙ্গায় যখন তিনি স্নান করেন তখন স্তম্ভাকারে জলরাশি উত্থিত হয় তাঁর মস্তকোপরি। কথাটা অকস্মাৎ কর্ণগোচর হোল ভোলানাথের। তার হৃদয় নেচে উঠলো সাধুকে দর্শনের জন্য। নিজের মনকে খাঁটি করে রাখলো—ইনিই সেই মহাপুরুষ যিনি বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন তার কানে। ব্যাকুল হোল অন্তর গুরুদর্শনাকাঙ্ক্ষায়। যোগাযোগ করলো সে মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে। অনুরোধ করলো তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। নাছোড়বান্দা বালক ভোলানাথ। অবশেষে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন ঢাকায় ফিরে যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এখন মায়ের সম্মতি পেলেই কার্যসিদ্ধি হবে। মনে মনে ভাবলো সে। সুতরাং মায়ের অনুমতির জন্য বগুলে এলো মাতৃভক্ত বালক ভোলানাথ। ভোলানাথের কোষ্ঠীতে ছিল পরমায়ু মাত্র বাইশ বৎসর। কনিষ্ঠ পুত্রের আকুলতা দেখে আর পরমায়ুর কথা চিন্তা করে সবদিক ভেবে মা ছেলেকে ঢাকা যেতে দিলেন অনুমতি। সাধক জীবন গ্রহণের ব্যাপারে আর আপত্তি করলেন না। জ্যেষ্ঠপুত্র ভূতনাথ তখন বর্দ্ধমানেই কম্পাউণ্ডারী করছেন।

ভোলানাথ শিক্ষাজীবনকে অসমাপ্ত রেখে সত্যসত্যই একদিন যাত্রা করলো ঢাকার পথে। তার যাত্রাপথের সঙ্গী হোল আরও একজন বালক। গ্রাম্যবন্ধু হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর ভবিষ্যৎ সাধক জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

রমনায় এসে সাধুকে দর্শন করেই চিনতে পারলো ভোলানাথ। ইনিই সেই মহাপুরুষ। আনন্দ-বিহ্বল হলো সে।

—কেন এসেছো? আবার ওকে সঙ্গে করে কেন? জিজ্ঞেস করলেন মহাপুরুষ ভোলানাথকে। রমনার অরণ্যের নিভৃতে। নিষ্পাপ দুই বালক যোগীবরের পদধূলি মাথায় নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

—আমি আনিনি। ও নিজের আগ্রহেই এসেছে। প্রত্যুত্তরে বললো ভোলানাথ। তার হৃদয় তখন দিব্যানন্দে ভরে উঠেছে। ইষ্টদেব যে তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অনির্বচনীয় আনন্দে দেহমন আচ্ছন্ন হলো।

এবারে মধুর হাস্যে যোগীবর বললেন সস্নেহে,—তা বেশ করেছো। যেন ওদের জন্যই তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন। জড়িয়ে ধরলেন দুজনকে। যেন কত আপন। কত জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ রয়েছে ওদের সঙ্গে। পথশ্রান্ত ক্লান্ত বালকদ্বয়ের হাতে তুলে দিলেন ফল প্রসাদ। মিটলো ওদের ক্ষুধা আর তৃষ্ণা।

তারপর আর কিছু জানে না। বলতে পারে না ভোলানাথ। দুজনেরই চোখ বেঁধে হাত ধরলেন স্বামী নীমানন্দ পরমহংস।

যাত্রা হোল সুরু।

পথ ঘাট প্রান্তর বনভূমি পেরিয়ে। দূর দূরান্তরের পথে। যখন চোখ খোলা হোল, জানতে পারলো ওরা এসেছে বিন্ধ্যাচলে। আবার যাত্রা হোল সুরু, উত্তরাখণ্ডের পথে। তিব্বত অভিমুখে। পথ দুর্গম বিপৎসঙ্কুল। চলার আর শেষ নেই। নদী পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, উপত্যকা ছাড়িয়ে দূর থেকে দূরে চলেছে তিনজনে। চারিদিকে কেবল গিরিশৃঙ্গমালায় মহৎ মৌন ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী।

অবশেষে ওরা এসে পৌঁছলো পশ্চিম তিব্বতের জ্ঞানগঞ্জ আশ্রমে। আশ্রম নয় যেন মহা মহা যোগীদের মহা মিলনক্ষেত্র। অসংখ্য ব্রহ্মচারী দণ্ডী ও পরমহংস সাধুদের আড্ডা বসেছে যেন। ওখান থেকে চলে এলো ওরা উত্তর তিব্বতের মনোহর তীর্থে। এখানেই ওঁর গুরু ব্রহ্মর্ষি মহাতপার আসন। সন্ন্যাস জীবনের নাম শ্রীশ্রীঅচলানন্দ পরমহংস। ব্রহ্মর্ষি মহাতপা দক্ষিণ হাত দিয়ে ভোলানাথের মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন আর কানে দিলেন মন্ত্র। মহামন্ত্র। ক্রিয়া হলো গুরু মন্ত্রের শক্তির। অভাবনীয় অনির্বচনীয় ব্যাপার। সবকিছুই যেন ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। অতি দ্রুত আর অলৌকিক ভাবে সবকিছু যেন গেল ঘটে। এখন আর বালক ভোলানাথ নয়। ব্রহ্মচারী ভোলানাথ। সন্ন্যাস নাম হলো বিশুদ্ধানন্দ। ' দীক্ষা গ্রহণের পর মহাতপার শিষ্য পরমহংস শ্রীশ্রীভৃগুরাম স্বামী নিলেন ভার যোগশিক্ষার। শ্রীশ্যামানন্দ পরমহংস

নিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার দায়িত্ব। ভোলানাথ ভৃগুরাম স্বামীকে বলতেন, 'দাদা গুরুদেব'। জ্ঞানগঞ্জ আশ্রমের নিয়মানুসারে বারো বৎসব ব্রহ্মচর্য পালন। চার বৎসর থাকতে হবে দণ্ডী সন্ন্যাসী আর বাকী চার বৎসর থাকতে হবে সন্ন্যাসীর আচারে। তারপর হবেন তীর্থস্বামী পদে উন্নীত। এইভাবে জ্ঞানগঞ্জে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে চললো বিশুদ্ধানন্দের সাধনার জীবন। সাধকজীবনের এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী অবস্থায় বিশুদ্ধানন্দ অবশ্য বণ্ডুলে মা'কে এসে দর্শন দিয়েও গেছেন।

অকপটতা আর সত্যনিষ্ঠা ছিল স্বামী বিশুদ্ধানন্দের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানগঞ্জে তখন কঠোর সাধনায় ব্রতী ব্রহ্মচারী ভোলানাথ। দেহের সকল সুখতৃষ্ণাকে পরাভূত করার জন্য তাঁর আগ্রহ ও প্রয়াসের ছিল না কোনও ত্রুটি। সেখানে বাইরের মায়াময় জীবনের কোন কামনা বাসনা ও তৃষ্ণা পৌঁছতে পারতো না। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন সেই বনময় ভূমিরই নিভৃতে জলকুণ্ডে দেখতে পেলেন জলপুষ্পের অর্ধস্ফুট কলিকার মত স্নানরতা এক অপরূপা কুমারী মেয়েকে। চমকে ওঠেন ব্রহ্মচারী বিশুদ্ধানন্দ। তাঁর নিজেরই সংকল্পের কঠিন বন্ধন থেকে যেন স্খলিত হয়ে পড়ে তাঁর মন। দৃষ্টি বিচলিত করে তোলে। চিত্তের বিক্ষেপ ঘটায়। দুই চোখ বন্ধ করে তাঁর মনের সকল ভাবনাকে এক দিব্য বিভূতি লাভের আশায় ব্যাকুল করে তোলবার করেন চেষ্টা। ব্যর্থ হন। অবশেষে ছুটে চলে এলেন দাদা গুরুদেবের কাছে। কিছুই গোপন করলেন না। সত্য প্রকাশ করলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, হয় আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন, নয় আমায় তাড়িয়ে দিন।

দাদা গুরুদেব ভৃগুরামস্বামী সবকিছু শুনে মৃদু হেসে বললেন,—তোমার কোন অনুশোচনার প্রয়োজন নেই। আশীর্বাদ করছি আর হবে না। পর মুহূর্তে তরুণ তাপসকে বিশেষ একটি মন্ত্র জপ করতে বললেন। একটি নূতন আসনও দিলেন। আবার সুরু হোল বিশুদ্ধানন্দের কঠিন তপস্যার জীবন। ধীরে ধীরে যোগ ও তন্ত্রসাধনার শক্তিতে হয়ে উঠলেন শক্তিমান। তন্ত্রশক্তি ও যোগসাধনার অপূর্ব সমন্বয় হলো তাঁর সাধন জীবনে। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর সাধনা করে তপস্বী জীবনের কঠিন পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ।

তীর্থস্বামী পদে হলেন উন্নীত। অবশ্য তখনও হননি পরমহংস। কিন্তু অসামান্য শক্তির বিকাশ হলো তাঁর মনে। অন্তর্লোকে। যৌগিক ক্রিয়ায় করলেন সিদ্ধিলাভ।

অকস্মাৎ তীর্থস্বামী বিশুদ্ধানন্দের উপর গুরুদেবের আদেশ হোল গৃহস্থাশ্রম পালনের।

হতবাক হয়ে শুধু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন বিশুদ্ধানন্দ, গুরুদেবের চোখের দিকে। এ কেমন আদেশ গুরুদেবের ! মনে মনে ভাবেন।

শিষ্যের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আর তার মনোগত ভাবনার কথা জানতে পেরে গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, গৃহস্থ হলেও তোমার আধ্যাত্মিক সাধনার কিছু ক্ষতি হবে না। বরং আরও উচ্চতর সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত।

—সংসার নির্বাহ কেমন করে করবো ? জিগ গেস করলেন বিশুদ্ধানন্দ।

—সংসার নির্বাহের জন্য বৈদ্যবৃত্তি গ্রহণ করবে। যোগ-জ্যোতিষ দ্বারা লোকের কোষ্ঠী বিচারাদি করে সমুচিত কবচাদি দেবে। তোমার অভাব হবে না। এ ছাড়া যখন যে অবস্থায় তোমার যা করতে হবে তার সমুচিত আদেশ পাবে। বললেন গুরু। তীর্থস্বামী বিশুদ্ধানন্দের মন তবুও যেন দুলতে লাগলো সংশয়ের দোলায় !

আর একটি নূতন দিন বিশুদ্ধানন্দের জীবনে হয়ে উঠলো আলোকিত। মুখে যেন তার অনন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ঘর-পালানো ছেলে আবার ফিরে এলেন গৃহে। বণ্ডুল গ্রামে। বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। মানুষের ভগবান মানুষকে ছেড়ে কি থাকতে পারেন ! দীর্ঘ কাল পর কনিষ্ঠ পুত্রকে কাছে পেয়ে স্নেহময়ী জননীর মাতৃস্নেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে উঠলো উৎসারিত। আনন্দাশ্রু হতে লাগলো নির্গত। খুল্লতাত চন্দ্রনাথের ছেলে-মেয়েদের হৃদয়ও নেচে উঠলো ভোলানাথকে কাছে পেয়ে। আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হয়ে চললো সমস্ত পরিবারটির মধ্য দিয়ে। পুত্রের মুখে গুরুদেবের আদেশের কথা শুনে আর দেরী করেননি জননী রাজরাজেশ্বরী। বিবাহের দিনও করে ফেললেন স্থির।

তারপর একটি সন্ধ্যা।

উৎসব জাগলো শত শত দীপের আলোকে। বাঁশির মধুর সুরে। ধূপের

সৌরভে আর পুষ্পসজ্জার সমারোহে। ১৮৯২ সালের এক শুভলগ্নে বর্দ্ধমান জেলারই মন্তেশ্বর গ্রামের কালীচরণ সরকারের কন্যা কৃষ্ণভামিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হলো তীর্থস্বামী বিশুদ্ধানন্দের। বিবাহ উৎসবেও অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হোল সৃষ্টি।

বিবাহের পরও নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগলো স্বামীজীর জীবনে। দ্বিরাগমনে শ্বশুরালয় মন্তেশ্বর গ্রামে এসেছেন। দিনে দুই তিনবার স্নানের অভ্যাস। তাইতো অপরাহ্নে চলেছেন স্নানে। সঙ্গে আছে একটি ছেলে। সম্মুখেই একটি পুষ্করিণীতে নামলেন। পুষ্করিণীটি ছিল কচুরীপানায় ভর্তি। ডুব দিয়ে উঠে আসতেই হঠাৎ তীব্র জ্বালা অনুভব করতে লাগলেন বুকে। ক্ষতও দেখা গেল। শ্যালকটিকে ডেকে বললেন, '—আমাকে সাপে কামড়িয়েছে। জাত সাপ। যন্ত্রণা বোধ করছি। তবে চিন্তার কারণ দেখি না। তুমি একথা প্রকাশ ক'রো না।' বিস্মিত ও অভিভূত শ্যালক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো। পরমুহূর্তেই আদেশের ভঙ্গীতে স্বামীজী অদূরের শিবমন্দিরটিকে দেখিয়ে বললেন,—আমি ঐ শিবমন্দিরে ক্রিয়া করতে ঢুকলাম। বের হয়ে না আসা পর্যন্ত কেউ যেন দরজা খুলতে চেষ্টা না করে।

ভগ্নীপতির নির্দেশ পরিবারের সকলকে জানালো সে। রাত্রি অতিবাহিত হলো। অবশেষে চৌদ্দ ঘণ্টা যোগক্রিয়া করে সর্পবিষের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন স্বামীজী। পরদিন শিবমন্দির থেকে যখন বের হয়ে এলেন তখন সচ্চিদানন্দের অনুভূতির দিব্য প্রভায় তাঁর মুখমণ্ডল অপরূপ শোভায় হয়ে উঠেছে উদ্ভাসিত। জামাতার সেই সৌম্যমধুর মূর্তি শ্বশুরালয়ের সকলেরই হৃদয়কে করে ফেললো আচ্ছন্ন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন, এ জামাতা সাধারণ মানুষ নন। অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন এক সিদ্ধপুরুষ। ভগবৎশক্তির মূর্ত প্রকাশ।

নবপরিণীতা বধূ কৃষ্ণভামিনী দেবী স্বামীর সান্নিধ্যে এসে দেখলেন, তিনি এক অলৌকিক ভাবে যোগাসনে আছেন বসে। গাত্র থেকে পদ্মসৌরভ হচ্ছে নির্গত। দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যেন পদ্মগন্ধ। নিঃসীম আকাশের মত নির্লিপ্ত তিনি। উদাসীন। কিন্তু বাইরে থেকে বুঝবার

উপায় নেই। কঠোর যোগী, কিন্তু বালক বালিকা কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে মগ্ন। তাঁর বিভূতিরও নেই সীমা পরিসীমা। অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণভামিনী দেবী উপলব্ধি করলেন তাঁর স্বামী ভগবৎ ঐশ্বর্য নিয়ে জীবের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন এই পৃথিবীর মাটিতে। মানব লোকে।

বিবাহের পর সত্যসত্যই বৈদ্যবৃত্তি গ্রহণ করলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। ডাক্তারী লীলার ক্ষেত্র হোল বর্দ্ধমান জেলার গুষ্করা গ্রাম। ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত চললো এই লীলাখেলা। স্থানীয় জমিদার ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র চোঙ্গদার ও হরিশচন্দ্র চোঙ্গদার স্বামীজীর থাকবার করে দিলেন সুবন্দোবস্ত। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর চিকিৎসার সুনাম দূর-দূরান্তের গ্রামেও পড়লো ছড়িয়ে। অসামান্য শক্তিসম্পন্ন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক বিভূতিসঞ্চারে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছিল সেদিনের গ্রামের মানুষেরা। আবার আচার্যরূপে গুরুরূপে মুমুক্ষু নরনারীকেও দিতে লাগলেন আশ্রয়। তাইতো গ্রামের মানুষেরা তাঁকে ডাক্তারবাবু বলতো না, বলতো 'ভোলানাথ সাধু'। গুরুর আদেশেই তিনি শিষ্য করতে আরম্ভ করেন। তাইতো সাধারণ মানুষকে যোগপথে আকৃষ্ট করবার জন্য করতেন নানারকম খেলা প্রদর্শন। সূর্যবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্রিয়া-কর্ম করতেন। সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা একবার ডাক্তার ডেনহাম-হোয়াইট সাহেবকে আংটিতে ধারণ করবার জন্য হীরক প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন উপহার। আসামের বিলাসীপাড়ার জমিদার ভক্তপ্রবর রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সম্মুখে কেবলমাত্র দৃষ্টি দিয়ে একখানি সাদা রুমালকে সিংহবাহিনীর মূর্তিসহ চারিকোণে নানা পুষ্পের চিত্রযুক্ত রুমালে করেছিলেন পরিণত। এই অলৌকিক বিভূতিলীলার জন্যই সমগ্র বাংলাদেশে বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস নাম সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে হতে লাগলো ধ্বনিত! শত শত মানুষের মেলায় মুখর হয়ে উঠলো গুষ্করা গ্রাম। বিশুদ্ধানন্দের বাহ্যজীবন ঐ বিচিত্র বিভূতিলীলাবহুল ব্যতীত আর কিছুই নয়। অন্তর্জীবনে তিনি ছিলেন মহাযোগী। মহাসাধক। গুষ্করা গ্রাম শুধুমাত্র তাঁর লীলাক্ষেত্রই ছিল না। ছিল সাধনভূমিও। মধ্য-রাত্রিতে স্নান করে যোগে বসতেন। মহানিশায়

করতেন যোগসাধনা। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ নয়, মহাযোগী তপস্বীদেরও আগমন হতো গুষ্করা গ্রামে বিশুদ্ধানন্দের দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। আসতেন খাঁকি বাবা। রতন ক্ষেপা। আর দীর্ঘনগরের সাধক জগদানন্দ ও তাঁর শিষ্য শিবানন্দ স্বামী। এঁরা বিশুদ্ধানন্দ বলতেন না। বলতেন ভোলা ক্ষেপা। ভক্তপ্রবর জমিদার গিরিশচন্দ্র বলতেন, ইনি হলেন একটি শালগ্রাম। জ্ঞানগঞ্জের মহা মহা যোগীরাও আসতেন, তবে ওঁরা আসতেন, সূক্ষ্মদেহে।

সেবার এসেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। বর্দ্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট। গুষ্করা গ্রামে স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে দেখতে। শুধু দেখতে নয় পরীক্ষাও করতে। সে যুগের ম্যাজিস্ট্রেট, ক্ষমতায় সম্মানে অদ্বিতীয়। সমস্ত গ্রামের মানুষ হয়ে উঠলো চঞ্চল। কি জানি কি হয়। চঞ্চল হোল জমিদার হরিশ্চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র। বার বার বলছেন স্বামীজীকে—বাবা, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বোধ হয় এসে পড়লেন। কিন্তু স্বামীজী অচল অটল। তাঁর মধ্যে কোন চাঞ্চল্যই গেল না দেখা। মৃদু হেসে বললেন,—ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন তাতে আমার কিরে বাবা! তোদের ম্যাজিস্ট্রেট আমার কে?

অবশেষে বর্দ্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট রমেশ দত্ত এসেই বিশুদ্ধানন্দের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।

—আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাই। আপনার নাকি যোগ-বিভূতি প্রচুর।

—তা কিছুটা রয়েছে বই কি। হেসে হেসে বললেন স্বামীজী। তারপর রমেশ দত্তকে অপ্রতিভ করে দিয়ে বললেন,—বাবা, তুমি তো পাঁচখানি গিনি তোমার গিন্নির কাছে গোপনে রেখে ভাবছো আমি তোমার গোপন কথাটা বলতে পারি কিনা। আমার অলৌকিক শক্তিটা পরখ করবে। দরকার হলে সাধুর ভণ্ডামিটা ভাঙবে। তা সেটা ভাঙতে পারবে কি?

রমেশ দত্ত লজ্জিত হলেন। চিন্তাশীল জ্ঞানী মানুষ রমেশ দত্ত তেজস্বী সাধকের কঠোর বাক্যকে সহজ ভাবেই করলেন গ্রহণ। অপ্রসন্নতার ছায়াপাত তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠতে দেখা গেল না। তারপর ওঁরই অনুরোধে স্বামীজী সূর্যবিজ্ঞান ও বায়ুবিজ্ঞানের ক্রিয়াকাণ্ডও দেখালেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হলো শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্তের।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দের বিভূতিলীলা দেখতে গুষ্করা গ্রামে এসেছিলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী, ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত, আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তো অভিভূত হলেন স্বামীজীর সূর্যবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও দেহতত্ত্বের নানা ক্রিয়াকাণ্ড দেখে। ডাঃ সরকারকে বললেন বিশুদ্ধানন্দ,—মানবদেহের সাধারণ কয়টি দ্বার ছাড়া আরও অগণিত দ্বার আছে। এমন কি প্রত্যেকটি লোমকূপই একটি দ্বার। লৌকিক চোখ দিয়ে ধরা পড়ে না। তারপর নিজ দেহের লোমকূপ দিয়ে বড় বড় স্ফটিকের দানা প্রবিষ্ট করালেন। আবার হাত দিয়ে ঘষবার সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আসতে লাগলো। এক খণ্ড ঘৃতসিক্ত বস্ত্র মুখ দিয়ে দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়ে নাভিদেশ দিয়ে টেনে বের করে ফেললেন। সকলের সামনে। এই অদ্ভুত বিভূতিলীলা দেখে অপ্রতিভ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বললেন,—আমাদের দেহতত্ত্ববিদ্যা যে কত অসম্পূর্ণ তা আপনি ভালভাবেই দেখালেন।

বিভূতি প্রদর্শন সম্বন্ধে স্বামীজী বলতেন,—'ওরে এসব দেখাই কেন জানিস্? শিক্ষিত অথচ নাস্তিক লোকদের ধর্মপথে আনবার জন্যই আমার এই বিভূতি দর্শন। ওরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বড় দুঃখ হয়। তোমাদের মধ্যেই তো সব আছে। সংস্কার দ্বারা আবরণ দিয়েছে। ময়লা পড়েছে। সেই আবরণ মুক্ত করতে হবে। ময়লা পরিষ্কার করতে হবে।

* * *

বাইরের শক্তি তোমার মনকে ভাল করে দিতে পারে বটে, কিন্তু তাতে তোমার উপকার স্থায়ী হবে না। নিজের চেষ্টায় নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।'

একবার কাশীতে আনন্দময়ী মা স্বামীজীর বিভূতি প্রদর্শন সম্বন্ধে বলেছিলেন,—বাবা, তুমি এসব কি দেখাও? এর চেয়ে তোমার ভিতর যে বস্তু আছে, তা এদের দাও না কেন?

প্রত্যুত্তরে দুঃখ করে স্বামীজী বলেছিলেন,—নেয় কে?

আনন্দময়ী মা তখন বিশুদ্ধানন্দের প্রিয় শিষ্য গোপীনাথ কবিরাজকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,—বাবাজী, বাবা কিন্তু তোমাদের এই সকল খেলা

দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। তোমরা এসব দেখে ভুলে থেকো না যেন। বাবার মধ্যে যে সব বস্তু আছে তা শীগ্‌গীর তোমরা আদায় করে নাও।

—তুমি তো দেখছি স্বপ্নেই মন্ত্র পেয়েছো। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী গিরীন মুখোপাধ্যায়কে। গিরীন বাবুর তখনও সংশয় রয়েছে মনে। তাই কিছুই বলছেন না। ভাবছেন আরও একটু দেখি। গিরীন বাবু স্বপ্নে একটি গুহ্যমন্ত্র পেয়েছেন। আবার একটি দেবমূর্তিও দর্শন করেন। স্বপ্নের অনুরূপ মূর্তিটি কর্মকার দিয়ে প্রস্তুতও করিয়েছেন। এবং ধাতুবিগ্রহটি রেখেছেন নিজ গৃহের এক গুপ্ত স্থানে। অনুসন্ধান করছেন উপযুক্ত গুরু। যিনি ওঁর প্রাপ্ত মন্ত্রের অর্থ উদ্‌ঘাটন করবেন আর বিগ্রহের কথা বলতে পারবেন তাঁকেই স্বীকার করবেন গুরু বলে। বহু সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গেছেন, কিন্তু কেউই ওঁর মনের কথা পারেন নি ব্যক্ত করতে। আজ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ শুধু মন্ত্রের কথাই নয়, বিগ্রহটি যে ঘরে যেস্থানে গোপনে রেখেছেন তার সবকিছুই স্পষ্ট করে বলে দিলেন। অভিভূত গিরীন বাবু স্বামীজীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন। স্বামীজী মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। গিরীন বাবু ভবিষ্যৎ জীবনে বিশুদ্ধানন্দের প্রিয় শিষ্য হয়েছিলেন।

স্বামীজী ১৯০৩ সাল থেকে যোগজ্যোতিষ ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১০ সালে হলেন পরমহংস। তীর্থস্বামী বিশুদ্ধানন্দ হলেন,—'বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস'। সবকিছুই অবশ্য জ্ঞানগঞ্জের নির্দেশে। ১৯১১ সালে বৈদ্যবৃত্তিও ত্যাগ করলেন। গুস্করা ছেড়ে চলে এলেন বর্দ্ধমান শহরে। রাণীগঞ্জ বাজারের নিকট একটি গৃহে শিষ্যবৃন্দসহ বাস করতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যেই রেলস্টেশনের সন্নিকটে বিশুদ্ধাশ্রম হলো প্রতিষ্ঠিত। সে সময় বণ্ডুল ও গুস্করাতেও আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রতি শিবরাত্রিতে মহাসমারোহের সঙ্গে হয় পূজা অনুষ্ঠান। আবার একদিন সহধর্মিণী কৃষ্ণভামিনীর জীবনে ঘটলো এক অলৌকিক ঘটনা। তখন বণ্ডুলে ৺হরহরি বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামীজীও বণ্ডুলে এসেছেন।

কৃষ্ণভামিনীর ছিল পান খাওয়ার অভ্যাস। পানের পিক ফেলেছেন

মন্দিরসংলগ্ন প্রাচীরের গায়। কিন্তু সে পিক গিয়ে লাগলো মন্দিরের গায়। লাল রংয়ের দাগ হয়ে গেল মন্দিরগাত্রে। জল দিয়ে ধুয়ে দিলেন কিন্তু অস্পষ্ট লাল দাগ রয়েই গেল। খেয়াল করলেন না।

রাত্রি তখন গভীর। কৃষ্ণভামিনী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তখন পুত্র দুর্গাদাস, বিষ্ণুপদ ও কন্যা বিশ্বেশ্বরী জন্মগ্রহণ করেছেন। বিশুদ্ধানন্দ যোগাসীন মন্দিরাভ্যন্তরে।

হঠাৎ কিসের শব্দে কৃষ্ণভামিনীর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমজড়ানো চোখে দেখলেন ঘরের মধ্যে বিরাটকায় এক ভয়ঙ্কর মানুষ। রুক্ষ মূর্তি। চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে ক্রোধে। হাতে মোটা লাঠি। মাটিতে ঠুকছে আর শাসাচ্ছে। অভাবনীয় দৃশ্য। ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। পাশের ঘরে শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। কিন্তু চীৎকার করবার সাহসও হারিয়ে ফেলেছেন। গলা শুষ্ক। কণ্ঠ রুদ্ধ। শুধু হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততালে চলছে। উপায়ান্তর না দেখে স্বামীকে স্মরণ করলেন। 'বিশুদ্ধানন্দ' নাম জপ করতে লাগলেন। অকস্মাৎ অলৌকিক ভাবে আবির্ভুত হলেন বিশুদ্ধানন্দ। অন্তর্ধান হলো বিরাটকায় ভয়ঙ্কর পুরুষ। বিশুদ্ধানন্দ স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন। কৃষ্ণভামিনীর চোখে আবার নেমে এলো শান্তির ঘুম। ভয়ের ভাবই রইলো না। এত ব্যাপার ঘটে গেল, বাড়ীর কেউ জানতে পারলো না। অলৌকিক ভাবে সবকিছু ঘটে গেল।

পরদিন বিশুদ্ধানন্দ স্ত্রীর মুখ থেকে সবকিছু শুনে বললেন শিবের ভৈরব এসেছিল গো। মন্দিরগাত্র কখনও অপরিষ্কার রাখবে না। মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন কৃষ্ণভামিনী স্বামীর অলৌকিক বিভূতিদর্শন করে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দের জীবনটাই যে অলৌকিক ব্যাপার। এই লৌকিক-অলৌকিকের সমন্বয় অন্য কোন সাধকের জীবনে এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে যায় না দেখা। তাইতো তাঁর যোগদর্শন প্রচলিত যোগদর্শন থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির বলেই মনে হয়।

প্রথমদিকে গ্রামের মোদকরা স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাহাতা গ্রামের শৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মল্লিক, অসিতাচরণ ঘোষ মল্লিক,

বর্দ্ধমানের শ্রীহরিদাস পাল, প্রতাপনারায়ণ সিংহ, কাটোয়ার মুন্সেফ দুর্গাকান্ত রায়, পুলিশ ইন্সপেক্টর উপেন্দ্র চৌধুরী, পুলিশ অফিসার রায়বাহাদুর গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবজজ. হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, এনজিনিয়ার রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণীনাথ প্রামাণিক, কমলাবালা দেবী, বীণাপাণি দেবী, গৌরীচরণ রায়, উমাতারা দাসী, রাজবালা দেবী, মুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ, যোগেশ বসু, বিশ্বেশ্বর দত্ত, ডাঃ সুরেশচন্দ্র দেব প্রভৃতি আরও অনেকে, বিশেষ করে পুলিশ বিভাগের কর্মচারী ও অফিসাররা স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন সংখ্যায় অধিক। সেজন্য সে সময় অনেকে রহস্য করে স্বামীজীকে বিশুদ্ধানন্দ বলতো না। বলতো 'ডাকাতে কালী'। ডাকাতরা যেমন কালীপূজা ক'রে ডাকাতি করতে বের হয়। পুলিশরাও তেমনি স্বামীজীকে পূজা করে চোর ডাকাত ধরতে বের হন।

দিনে দিনে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের সাধনার যশঃসৌরভ বাংলাদেশ ছাড়িয়ে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পড়লো ছড়িয়ে। আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে, উড়িষ্যার শ্রীক্ষেত্রে, উত্তর ও মধ্যভারতের কাশী মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বারে, দক্ষিণভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে।

ঝালদার রাজা উদ্ধবচন্দ্র সিংহ ঝালদায় নিজ ব্যয়ে বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম করলেন প্রতিষ্ঠা। স্বামীজী ঝালদার সন্নিহিত পাহাড়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে ঐ স্থানের পূর্বেই ছিল কিছু সম্বন্ধ।

১৯১১ সনে স্বামীজী শিষ্য ও ভক্তবৃন্দসহ চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যা দর্শনে হন বহির্গত। এখন থেকে স্বামীজী আর কোথাও স্থির হয়ে বসছেন না। এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। কখনও আবার গভীর রাত্রিতে ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গান করেন স্বরচিত সঙ্গীত।

আমার সাধ মিটেছে গো শ্যামা
যা ছিল সব আশা করিলি নিরাশা
আশা-বাসা-নাশা হয় মনোরমা।
মা তোর পদে রাখলে মতি ঘটে পরমাদ,
ওরূপ চিন্তনে চির অবসাদ

তুমি সাধে সাধ বাদ
বিষয়ে বিষাদ
জানি গো পাষাণি তোমারি করুণা।

*　　　*

এমন কঠিন মেয়াদে
তারা কদিন রাখবি সংসার গারদে।
মেয়াদ হুকুম দিয়ে পাঠালি যে দিনে
কতদিন নিয়ম নাই আমার মনে,
আর ত বাঁচিনে
খালাস হ'ব কোন দিনে
মা তাই বলে দে।

*　　　*　　　*

কি করিলাম আমি হায়
পেয়ে জগৎমাতা না কহিলাম কথা
হায় হায় দু'খে বুঝি প্রাণ যায়
দেখা দিয়ে মাগো যাও কেন চলে ?
কণ্ঠ রোধ করলে অধম সন্তান বলে
এ কার ছলনা বল না বল না,
শুধাই তাই তোমায়।

*　　　*　　　*

পরবর্তীকালে বিশুদ্ধানন্দের কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত সম্বন্ধে বলেন, ভক্তপ্রবর উপেন্দ্র চৌধুরী,..........'তিনি প্রায় প্রতিরাত্রেই (গভীর রাত্রে) আপন মনে এমনি গান করতেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। সেরূপ মধুর কণ্ঠের গান আমি আর শুনি নাই। অদ্যাবধি কোথাও গান শুনিতে গেলে আর গান ভাল লাগে না। এখনও সেই প্রকার সুমিষ্ট গান শুনাইবার জন্য অনেকবার বলিয়াছি। কিন্তু বাবা বলেন, আর হয় না, উপেন্দ্র সেদিন আর নাই।'

'বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গে' শ্রীমতী লীলাবতী গুপ্তা বলছেন,—বাবা, সেতার ও

পাখোয়াজও বাজাইতেন। সে সঙ্গীতের ঝঙ্কারও ছিল অপূর্ব ভাবময়। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন ভক্ত গৌরীচরণ রায়কে,—'আমি পাখোয়াজ বাজাইতে জানি। জ্ঞানগঞ্জে ধ্রুপদের নানাতালে বেদগান হইত, আমি পাখোয়াজ বাজাইতাম।'

বিশুদ্ধানন্দের রচিত সঙ্গীতগুলি ভক্ত দুর্গাকান্ত রায় প্রকাশ করেন 'গীত-রত্নাবলী' নামক গ্রন্থাকারে।

স্বামীজী বলেন, সব রসই ত এক মূল হতে আসে। রস শুদ্ধ করে নিলে তার দ্বারাই যাওয়া যায় রসস্বরূপের কাছে।

দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণে বের হলেন স্বামীজী। বিশ্বপিতা যেন বিশ্বকল্যাণে ব্রতী হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চললেন ছুটে। কর্মজাল বিস্তার করলেন সমগ্র ভারতবর্ষে। ১৯১৫ সালে রামেশ্বর সেতুবন্ধের পথে পা বাড়ালেন। মণীন্দ্র গাঙ্গুলি, হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্য ভক্তবৃন্দ হলেন সঙ্গী। রামেশ্বর তীর্থে এসে এক সমস্যা হোল। বাঙ্গালীরা মৎস্যভোজী বলে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। শিষ্যবৃন্দ হলেন চিন্তিত। স্বামীজী শিষ্যভক্তবৃন্দের মনোদুঃখ জানতে পেরে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপর নিজের বেশ করলেন পরিবর্তন। গরদের কাষায় বসন পরে মাথায় উত্তরীয় বাঁধলেন। আর হাতে নিলেন কমণ্ডলু। যাত্রা হোল সুরু মন্দির অভিমুখে। স্বামীজীর বিভূতিলীলার হোল প্রকাশ। মন্দিরে প্রবেশের কোন বাধারই হোল না সৃষ্টি। সিদ্ধমহাপুরুষের সৌম্যমূর্তি নয়ন-গোচর করে অভিভূত দ্বারী দ্বারপথের চন্দন কাঠের অর্গল নীরবে দিল সরিয়ে। স্বামীজী ভিতরে গিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে শিবের স্নানাদি কার্য করলেন সাধন। অবশেষে ফিরবার পথে চিদাম্বরমে আকাশলিঙ্গ, ত্রিচিতে, শ্রীরঙ্গমে, অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণু মূর্তি আর মাদুরায় মীনাক্ষী দেবীকে দর্শন করে বিশুদ্ধানন্দ এলেন ভারতখ্যাত প্রাচীন তীর্থভূমি দক্ষিণভারতের বারাণসী ধাম মহিমময়ী কাঞ্চীতে। কাঞ্চীপুরী—কাঞ্চীপুরম। সহস্র-মন্দিরময়ী সুবর্ণপুরী, শিল্প সংস্কৃতি ও ধর্মদর্শনের সনাতন লীলাক্ষেত্র। এক সময়ে শ্রীশঙ্করাচার্য ও বৌদ্ধভিক্ষু বোধিধর্ম, দিঙনাগ, ধর্মপাল প্রমুখ

খ্যাতিমান দার্শনিক ও পণ্ডিত এখানে বাস করে ধর্ম ও শিক্ষার প্রসারে করেছিলেন মনোনিবেশ। আর বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরামানুজম্ এই স্থানেরই বিষ্ণু মন্দিরে বরদানের দেবতা 'বরদ-রাজে'র চরণতলে ধ্যানানন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। বৌদ্ধ-জৈন-শৈব আর বৈষ্ণব চার ধর্মই প্রাধান্য লাভ করেছে এই কাঞ্চীপুরমে। সেই বহু মনীষার বহু সম্প্রদায়ের বহু সাধু-সন্তের চরণপূত প্রাচীন কাঞ্চীপুরমে পদার্পণ করলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস। ভক্তবৃন্দসহ উঠলেন যমুনাবাঈ ধর্মশালায়। সেখানেও বিভূতির প্রকাশ হোল। বহু লোক সমাগম হয়েছে, কিন্তু কলে জল নেই। নিদারুণ জলাভাব। স্বামীজীর অলৌকিক শক্তি প্রভাবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জলাভাব দূর হোল। ধর্মশালার মানুষেরা বিস্মিত ও অভিভূত হোল স্বামীজীর বিভূতিলীলা দর্শন করে। পর বৎসর ১৯১৬ সালে স্বামীজী বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দসহ যাত্রা করলেন উত্তর ভারতের তীর্থাভিমুখে। তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মথুরা, বৃন্দাবনধাম, হরিদ্বার। হরিদ্বারে এসে ভক্তপ্রবর (অ্যাডভোকেট) শ্রীযুক্ত সতীশ মুখোপাধ্যায় টেলিগ্রাম পেলেন—স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ। মরণাপন্ন। পিতৃগৃহে। স্ত্রী কালিদাসী দেবী হলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। চিন্তিত সতীশবাবু স্বামীজীর চরণ আশ্রয় করলেন। স্বামীজী আশ্বাস দিয়ে বল্লেন ভক্ত শিষ্য সতীশ মুখোপাধ্যায়কে নিশ্চিন্ত হতে। তারপর তীর্থপরিক্রমা করে ফিরে এলেন বারাণসী ধামে। এবং অলৌকিক ভাবে জীবন রক্ষা করলেন কালিদাসী দেবীর। সংবাদ এলো স্ত্রী সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু স্বামীজী হয়ে পড়লেন অসুস্থ। ভক্তরা জানলো, স্বামীজী কালিদাসী দেবীর রোগ নিজ দেহে গ্রহণ করেছেন। স্বামাজী কিন্তু কিছুই বললেন না, শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

এই সতীশ মুখোপাধ্যায়ই কাশীতে হনুমান ঘাটের নিকটে একটি বাড়ী ক্রয় করে, বিশুদ্ধানন্দ কুটির আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। আর কাশীর মালদহিয়া অঞ্চলে শিষ্যদের টাকায় প্রতিষ্ঠিত হোল 'বিশুদ্ধানন্দ কানন' আশ্রম।

কাশীর আশ্রমের বিভূতিলীলা প্রসঙ্গে ভক্ত অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত বলছেন, —'একদিন সকাল বেলা কাশীর আশ্রমে গিয়ে দেখি বাবা আশ্রমের ফুল-

বাগানটির চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অতি প্রত্যূষে তিনি মোটর গাড়ীতে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে এসে আশ্রমের ফুলবাগানটি প্রদক্ষিণ করতেন। এটাই ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। ঐ বাগানে কতগুলি মোরগফুলের গাছ ছিল। ফুলগুলি ফুটে বাগানখানি যেন আলোকিত করে রেখেছিল। ঐ মনোরম দৃশ্য দেখে আমাদের মধ্যে একজন বললেন, ফুলগুলি দেখতে তো বেশ, কিন্তু গন্ধ নেই।

—কি বললে, আশ্রমের ফুলের গন্ধ নেই? এই বলে বাবা একটি মোরগফুল তুলে সেটিকে একবার মাত্র চক্রাকারে আবর্তিত করে আমাদের হাতে দিয়ে বললেন,—দেখ দেখি গন্ধ আছে কিনা? আমরা আঘ্রাণ নিয়ে দেখলাম ঐ ফুল থেকে অপূর্ব গন্ধ নির্গত হচ্ছে।'

স্বামী বিশুদ্ধানন্দের দেহ থেকেও* পদ্মগন্ধ নির্গত হতো। সূক্ষ্মদেহে দিব্য পদ্মসৌরভ বিস্তার করে বিশুদ্ধানন্দ দূর দূরান্তের ভক্তদের সামনে হতেন আবির্ভূত। তাইতো কাশীর ভক্ত শিষ্য আপামর জনসাধারণের নিকট তিনি 'গন্ধবাবা' বলে হয়েছিলেন পরিচিত। গন্ধবাবা বিশুদ্ধানন্দ।

---

* বুদ্ধদেবের দেহ গন্ধময় ছিল। তিনি যে কুঠিতে থাকতেন তা' 'গন্ধকুঠি' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে

নিরন্তর নাসায় পাশে কৃষ্ণ পরিমল
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল।

গোবিন্দলীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বর্ণনা আছে। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ হতে নিঃসৃত যে পুণ্যগন্ধ প্রাপ্ত হন তা কস্তুরী, কর্পূর, নীলোৎপল, চন্দন, অগুরু, তুলসী-মঞ্জরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের সম্মিলিত গন্ধের অনুরূপ।

শ্রীরাধার দেহ থেকে নিয়ত পদ্মগন্ধ বের হতো। তিনি ছিলেন পদ্মিনী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগীর 'শুভগন্ধের' কথা পাওয়া যায়। যোগের আরম্ভাবস্থাতেই দেহশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিব্যগন্ধের উদয় হয়। গোবিন্দদাসের বিবরণ থেকে জানা যায় মহাপ্রভুর দেহ হতে বিশেষ বিশেষ সময়ে পদ্মগন্ধ নির্গত হতো।

ললিতা-সহস্র-নাম স্তোত্রে ভগবতী ত্রিপুরসুন্দরীকে 'দিব্যগন্ধাঢ্যা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হলে দেহে সদ্‌গন্ধ আবির্ভূত হয়।

—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ।

এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন ভক্তপ্রবর ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে,—'অনেকে মনে করে আমি বোধ হয় খুব আতর ভক্ষণ করে থাকি। নচেৎ আমার ভিতর থেকে এরূপ সুগন্ধ কিরূপে বহির্গত হওয়া সম্ভব হয়।

আমি দুর্গন্ধ ভালবাসি না। সহ্য করতে পারি না। সেইজন্য স্বতঃস্ফূর্ত সুগন্ধ দিয়ে দুর্গন্ধ নষ্ট করি। এবং নিজেকে সর্বদা সুগন্ধে বেষ্টিত রাখি। এই গন্ধলাভের জন্য যোগ করতে হয় না, যোগসিদ্ধ হলে এই গন্ধলাভের অধিকারী হওয়া যায়।'

ভক্তপ্রবর এই ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই নিজ ব্যয়ে পুরীধামে 'বিশুদ্ধানন্দ ধাম' আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা ১৩২৬ সনের বৈশাখ মাসে (ইংরাজী ১৯১৯ সালে)। শ্রীক্ষেত্রেও বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ভক্তসনে লীলা করেছেন মাসের পর মাস ধরে। বিশুদ্ধানন্দ শুধুমাত্র শুষ্ক কঠিন যোগীই ছিলেন না, রসিক পুরুষও ছিলেন। বিশুদ্ধানন্দের অন্যতম জীবনীকার অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এই পুরীধামেই। পরবর্তীকালে তিনি বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—'আমি দেখিয়াছি এই মহাযোগী যদিও অনেক সময় শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়াও নীরবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন এবং শিষ্যদিগকে নীরবে সৎচিন্তা করিবার সুযোগ দিতেন তথাপি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে প্রচুর হাস্যরস ও অন্যান্য রস অবতারণ ও বিতরণ করিতেন। তিনি ছিলেন ষড়রসে রসিক।'

বিশুদ্ধানন্দ-স্মৃতি প্রসঙ্গে ভক্ত শিষ্য শ্রীগিরিধারী লাল ব্যাস বলেছেন, 'শ্রীশ্রীগুরুদেবের ন্যায় শক্তিশালী ও করুণাপূর্ণ মহাত্মার সন্ধান অন্যত্র কোথাও পাই নাই। বাবার স্বভাব একটি পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকের ন্যায় ছিল। তাঁর সরল এবং স্নেহপূর্ণ হাস্য আমার স্মৃতিতে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। জানি না মৃত্যুও সেই স্মৃতিচিহ্ন লুপ্ত করতে পারবে কিনা। শ্রীশ্রীগুরুদেব বাৎসল্য ও করুণার জীবন্ত মূর্তি ছিলেন। যিনি তা প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন একমাত্র তিনিই তার স্বরূপ অনুভব করতে পারবেন।'

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসকে প্রথম দর্শন করে প্রিয় শিষ্য পরমজ্ঞানী ভক্তপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন,—'১৯১৭ সনে ডিসেম্বর মাসে কাশীতে আমি শ্রীগুরুদেবের প্রথম দর্শনলাভ করি। তিনি যে অসাধারণ যোগী এবং

অলৌকিক যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন মহাপুরুষ তাহা লোকমুখে শুনিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল তিব্বতে বাস করিয়া সিদ্ধগুরুর শিক্ষার গুণে তিনি যোগের এমনসব প্রক্রিয়া ও বিভূতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন যাহা সাধারণত ভারতবর্ষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বাবাজীকে দর্শন করিবামাত্র কি জানি কেন আমার অতিপরিচিত নিজ জন বলিয়া মনে হইতেছিল। ভারতীয় সিদ্ধ পুরুষ ও দার্শনিক মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রগণ্য মহামহেশ্বর অভিনবগুপ্তপাদের কূর্চোজ্জ্বল শান্ত মূর্তির স্মৃতি—যে পবিত্র মূর্তি তৎশিষ্যগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে,—বাবাজীর দর্শনমাত্র আমার চিত্তে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়াই বাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পালঙ্কের সম্মুখে বামদিকে উপবেশন করিলাম। তিনি একটি পালঙ্কে বিশাল ব্যাঘ্রচর্মের উপর বসিয়া ছিলেন। দেখিলাম সৌম্যমূর্তি সুদর্শন যোগীয়া রঙের ক্ষৌম (রেশম) বসন পরিহিত এক মহাপুরুষ উপবিষ্ট। ইনিই সেই মহাযোগী যাঁহার চরণদর্শন-লালসায় আমি উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার বয়স তখন ষাট বৎসরের উপর হইলেও তাঁহাকে দেখিতে ৫৫।৫৬ বৎসর মনে হইতেছিল। মুখে শ্বেত কৃষ্ণ শ্মশ্রু প্রজ্ঞা ও করুণার চিহ্নস্বরূপ, আকর্ণবিশ্রান্ত বিশাল নয়নযুগল, আজানুলম্বিত বাহু, লম্বোদর কণ্ঠ হইতে বিলম্বিত শুভ্র যজ্ঞোপবীত, নিরন্তর দিব্যগন্ধ নিঃসরণশীল সুঠামতনু দর্শন মাত্রই অসাড়ে ঐ পাবন চরণ-কমলে মস্তক নত হইয়া পড়িল।.........ধারণা হইতেছিল ইনি দিব্যপুরুষ যোগীরাজ করুণাময়, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

স্বামী বিশুদ্ধানন্দের অপার কৃপা বর্ষিত হয়েছিল ভক্তপ্রবর গোপীনাথের উপর। ওঁর ভবিষ্যৎ জীবনধারার উপর অনেকখানি প্রভাব ছিল বিশুদ্ধানন্দের। ১৯১৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বারাণসী ধামের হনুমান ঘাটের আশ্রমে দীক্ষাপ্রাপ্ত হলেন ভবিষ্যতের মহামহোপাধ্যায় ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজ।

স্বামীজী বলতেন, 'যদি তত্ত্বালোচনা শুনতে চাও তবে গোপীনাথের কাছে যাও, আর যদি কিছু প্রত্যক্ষ করতে চাও তবে আমার কাছে এস।'

'আমাকে যোগ সম্বন্ধে কিছু বলুন।' জিগ্গেস করলেন গোপীনাথ কবিরাজ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকে।

বিশুদ্ধানন্দ হেসে হেসে বললেন,—'তোমাদের শাস্ত্রে যোগ সম্বন্ধে কি বলে?'

'এ সম্বন্ধে বহু কথা আছে। তবে মোটামুটি বলা যায় যে চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। এই নিরোধ এমন হওয়া চাই যে তখন দ্রষ্টা পুরুষ নিজ স্বরূপে অবস্থিত থাকে ও বুদ্ধির তরঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। অর্থাৎ বৃত্তিস্বারূপ্য থেকে মুক্ত হয়। এটি চিত্তের বৃত্তিহীন অবস্থা। কিন্তু জড়ত্ব নয়। কারণ সাক্ষী জাগরূক থাকে। তা না থাকলে তা' যোগের অন্তরায় হোত। এজন্য শাস্ত্রমতে বিদেহ ও প্রকৃতিলীনগণের চিত্তবৃত্তি না থাকলেও, তাদের যোগী বলা হয় না।' বললেন গোপীনাথ।

'দেখ, মূল বস্তুটি কি? মহাশক্তি। তার সঙ্গে যদি কারো স্থায়ী বা নিত্যযোগ সিদ্ধ হয় বা থাকে তাকে যোগী বলা চলে। ধর যেমন অগ্নি। যে লৌহখণ্ড অগ্নিতে দীর্ঘকাল নিক্ষিপ্ত থাকার ফলে অগ্নির রক্তিমা ও দাহিকাদি শক্তি ধারণ করে, সে অগ্নির সহিত যুক্ত। লোহা লোহাই আছে অথচ অগ্নির সঙ্গে সংযোগ বশতঃ সে অগ্নিভাবাপন্ন ও দাহিকাশক্তিসম্পন্ন হয়। সেইরূপ জীবাত্মা সেই মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে তাতে অনন্ত শক্তির দ্বার খুলে যায়। সে যোগী হয়। এই শক্তির বিকাশ জীবধর্ম নয়। এটি মহাশক্তির অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্পদ। যোগবশতঃ জীবে প্রকাশিত হয়। ইহাই যোগৈশ্বর্য।' সহজ করে বললেন বিশুদ্ধানন্দ স্বামী।

'লোহা কিছুক্ষণ বাইরে থাকলে আর লাল থাকে না। দহনশীল থাকে না। এমন কি নরমও থাকে না। তখন ত যোগ থাকে না। পক্ষান্তরে নিবিড়তম যোগের ফলে লৌহখণ্ড একেবারে মিলিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।' প্রশ্ন তুললেন গোপীনাথ।

'হাঁ, তা সত্য। ঐ সম্পদটি নিত্য ও অচ্ছেদ্য হলে তবেই যোগ বলা চলে। নতুবা নয়। অগ্নিসম্পদ সদাকালীন হলে লোহার মধ্যে অগ্নিধর্ম সর্বদা বিদ্যমান থাকে। অগ্নি যদি লোহাকে গ্রাস করে ফেলে তখন লোহার নিজ সত্তা কোথায়? এটা যোগ নয়। অবশ্য এই অবস্থাও আছে। তদ্রূপ লোহাকে যদি অগ্নি স্বীকারই না করে তাহলেও সম্বন্ধের অভাব বশতঃ যোগ হোল না। ইহা মায়াধীন দশা বা সংসার ভাব। যোগ বুঝতে হলে দুইটি

প্রান্ত ত্যাগ করে মধ্যের স্থিতি ধরতে হবে। অর্থাৎ অগ্নির সান্নিধ্য এত অধিক হতে পারে যে লোহা আর লোহাভাব রাখতে পারে না। অগ্নিতে লীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে লোহার অগ্নিসান্নিধ্য বিষয়ে ব্যবধান এত অধিক হতে পারে যে অগ্নির কোন ধর্মই তাতে সঞ্চারিত হয় না, লোহা সাধারণ লোহা থাকে। এই দুইটি প্রান্তভাব। যোগের প্রকর্ষে অভেদ, নিকর্ষে ভেদ। মধ্যাবস্থাই প্রকৃত যোগ। নতুবা মহাশক্তির সঙ্গে যোগ ত সকলেরই সর্বদাই রয়েছে। তাতে কাউকেও যোগী বলা চলে না।' মৃদু হেসে স্বামীজী বললেন।

—এমনও তো হতে পারে যে লোহা অগ্নি হয়ে গেলেও লোহাই থাকে। তার স্বরূপ লুপ্ত হয় না। অথচ সে অগ্নিসহ অভিন্ন। সে অগ্নি হয়েও অগ্নি নয়। আবার অগ্নি না হয়েও অগ্নি।

—খুব সত্যকথা। এটাই প্রকৃত যোগীর অবস্থা। জাগতিক যোগীর এটাই আদর্শ। প্রকৃত যোগ অভেদকে প্রাপ্ত হয়েও ভেদকে রক্ষা করে, আবার ভেদে থেকেও অভেদের গৌরবে মহীয়ান। তা না হলে আস্বাদন থাকে না। আপাততঃ এটাই জেনে রাখ। এর ভিতরে গুহ্য কথা আছে। কর্মপথে চললে তা বুঝতে পারবে।

—এরূপ যোগী কে?

—তিনিই ঈশ্বর। তিনি মহাযোগী। যোগীশ্বর। তিনি যোগীমাত্রেরই আদর্শ। উপাস্য।

—তিনি ও মহাশক্তি কি অভিন্ন নন? মহাশক্তি ও ঈশ্বরকে একই মহাসত্তার দুটি নাম বলা যায় না কি?

—বলতে পার। তা' বহু দূরের কথা। এখন ধরতে পারবে না। ঈশ্বর উপাসক। মহাশক্তি উপাস্য। ঈশ্বর হলেই মহাশক্তিকে উপাসনা করতে হয়। এই জন্য যোগীর পথ ঈশ্বরের পথ। যোগী চেষ্টা করে ঈশ্বর হওয়ার জন্য। এজন্য মহাযোগীর ঈশ্বরই যোগপথের আদর্শ। যোগী ঈশ্বরত্ব পেলেও তার নিজ স্বরূপ লুপ্ত হয় না। ঈশ্বরও নিত্য যোগী বলে নিরন্তর মহাশক্তির উপাসনা করছেন। ফলে তাঁর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করছেন। তবু ঈশ্বর রূপ তাঁর নিজ স্বরূপ লুপ্ত হচ্ছে না।

—অর্থাৎ লুপ্ত হচ্ছে। একত্বের বোধ হচ্ছে অথচ লুপ্ত হচ্ছে না। একত্ব সত্ত্বেও উপাসক ঈশ্বরভাব বিদ্যমান থাকছে। ইহাই কি আপনার তাৎপর্য? ইহাকে একপ্রকার ভেদাভেদ তত্ত্ব বলা যায়।

—হ্যাঁ, কতকটা সেইরকম। তবে ইহার পরাবস্থা আছে। সেখানে অদ্বৈত ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু বলা চলে না। তবে মহাশক্তির দিক থেকে বলা যায় তাঁরই এক রূপ নিত্য তাঁকে ভজনা করছে। মহাশক্তিধর জননী, ঈশ্বর তাঁর অগ্রজ সন্তান।

—জীবও তাঁরই সন্তান। অনুজ সন্তানবোধ হয়তো বলা চলে।

—নিশ্চয়ই। তিনিই তো একমাত্র মা। জীব তাঁকে চেনে না। ঈশ্বর তাঁকে চেনেন। ঈশ্বর জীবকে চিনাইয়া দেন।

—তবে ত ঈশ্বরই গুরু। বিশ্বগুরু। বললেন গোপীনাথ।

—তাতে আর ভুল কি? ঈশ্বর ভিন্ন মাকে চেনে কে? চিনায়ই বা কে?

—মা কে?

—মা আত্মা—স্বয়ম্। তোমার আত্মা, আমার আত্মা, বিশ্বের আত্মা। ঈশ্বরের আত্মা এক অদ্বিতীয় পরম আত্মা। ঈশ্বর জানেন মা তাঁহা হতে অভিন্ন। মা হতে তিনি অভিন্ন। কিন্তু জীবে সে বোধ নেই। মাকে জানেন বলেই তাঁর নাম ভগবান।

—ঈশ্বরের নিজের পৃথক নিজশক্তি কি নেই? প্রশ্ন করলেন গোপীনাথ।

—একই মহাশক্তি আছেন। তিনিই অখণ্ড শক্তি। সকলের শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, মূলে তিনিই সব। যেখানে যে শক্তি দেখ সকলেরই মূল তাঁতে। সবশক্তিই তাঁর আভাস মাত্র। যে আধারে যতটুকু প্রকাশ পায় ততটুকুরই আভাস দৃষ্ট হয়।

সরল ভাষায় সহজ করে বললেন বিশুদ্ধানন্দ। গোপীনাথও মনের মত উত্তরটি পেয়ে নীরব হলেন।

এইভাবে মাঝে মাঝেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা চলতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

এই প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর অমূল্য দত্তগুপ্ত বলছেন,—'গোপীনাথের সঙ্গে কথা হচ্ছে। বাবা বললেন, মানুষ কখনও ভগবান হতে পারে না। গোপীনাথ

তুমি কি বল? সোঽহম্ কথাটাও দ্বৈত-বোধক, সে ও আমি। দুই-ই তো রয়ে গেল।

গোপীনাথ বললেন,—তাতো যথার্থই।

তারপর গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রকৃতি বিকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হোল। একটি বর্ণও আমার বোধগম্য হোল না। অবাক হয়ে গুরু-শিষ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে উপস্থিত কারো কারো মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিন্তু সর্বত্রই লক্ষিত হোল প্রজ্ঞাহীন কুঞ্চিত দৃষ্টি, রহস্য উদ্ঘাটনের অবিসংবাদিত ব্যর্থতা।'

* * *

নারী জাতির প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তিনি বলতেন, ...'প্রকৃতিকে যে যেভাবে নেবে তার ফল সেই রকম পাবে। নারীর মধ্যে কোনও দোষ নেই। প্রকৃতি ত সুধার আধার। মদের বোতল কি কখনও মাতাল হয়? জগতে সকলেই ত সংসারের মধ্যে থেকে সকল কাজ করে এসেছে। সংসারে সব জিনিসের মধ্যে (প্রলোভনের মধ্যে) থেকে নিজের উন্নতির চেষ্টা করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

* * *

কর্ম না করলে কিছু হবে না বাপু। কর্ম করা চাই। বচনে কিছু হয় না। ক্রিয়া—উপযুক্ত আসন করে জপ। ইহাই কর্ম। কর্ম হতে জ্ঞান, জ্ঞান হতে ভক্তি এবং ভক্তি হতে প্রেম। কর্মই প্রধান। কর্মভ্যো নমঃ।'

বিভূতিলীলা দেখতে চাইলেই স্বামীজী কুমারী পূজা করতে বলতেন। একসঙ্গে পঞ্চাশ একশত কুমারীর পূজার আয়োজন করা হোত। কাশীর আশ্রম কুমারী পূজার আনন্দে মুখর হয়ে উঠতো। বিশুদ্ধানন্দও বিমল আনন্দ অনুভব করতেন। এই প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট ভক্ত স্বামীজীকে জিগগেস করেন, বিভূতি দেখালে কুমারী পূজা করতে হয় কেন বাবা? প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বললেন, এসব দেখালে যে আমার অপরাধ হয়।

—বাবা, আপনার আবার অপরাধ?

—অপরাধ বই কি। যারা বিশুদ্ধ বস্তু দেখতে অধিকারী নয়, আমি তাদের উহা দেখাচ্ছি। এটাই আমার অপরাধ। হাতীর বোঝা ছাগলের

ঘাড়ে চাপালে অপরাধ বই আর কি। তাছাড়া যারা এই সব বিভূতি দেখে তাদেরও অনিষ্ট হয়। এই সমস্ত দূর করবার জন্য আমি সমস্তই ভগবতীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেই। তিনি সব কাটিয়ে দেন।

সাধনবিমুখতা ও উৎসাহশূন্যতার দিকে ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গল্পের অবতারণা করলেন স্বামীজী।

'এক বৃদ্ধা বিধবা ছিল। তার ছিল অগাধ ধনসম্পত্তি। সে ঐসব নিয়েই দিবারাত্র থাকতো মত্ত। বিষয়চিন্তায় চোখের ঘুমও নিল বিদায়। নিদ্রার অভাবে দিনে দিনে সে কৃশ ও রুক্ষ মেজাজের হয়ে উঠলো। তার ব্যবহারে আত্মীয় পরিজন আশ্রিত সকলেই হোল অতিষ্ঠ। ডাক্তারের চিকিৎসাতেও কিছু হোল না। অবশেষে একজন আত্মীয় একটি জপের মালা দিয়ে বললো, তুমি সকাল সন্ধ্যা ভগবানের নাম করে এই মালা জপ করো। শান্তি পাবে। দেহ মন সুস্থ হবে। ঐ আত্মীয়ের কথামতো বৃদ্ধা একদিন সন্ধ্যাবেলা মালা জপতে বসলো। আশ্চর্যের বিষয়, ধীরে ধীরে সে নিদ্রায় ঢলে পড়লো। এমনই মজা, এরপর যখনই সে নিদ্রার অভাব অনুভব করতো তখনই চীৎকার করে বলতো,—'ওরে আমার ঘুমের মালাটা নিয়ে আয় তো!' জপের মালা নয়, ঘুমের মালা! কি অপূর্ব উদাহরণ। কত বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, কি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ!

স্বামীজী হাসতে লাগলেন, উপস্থিত ভক্তবৃন্দও হাসতে লাগলো।

কাশীর আশ্রমের আধপাগলা শিষ্য ব্রহ্মপদকে নিয়ে স্বামীজীর হাস্য পরিহাসের সীমা নেই। ব্রহ্মপদ আশ্রমেব বিগ্রহাদির সেবা পূজা করেন। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হ'য়ে স্বামীজী বলছেন,

ব্রহ্মপদ দই খেতে ভয় পায়। কারণ দই নাকি ওর সহ্য হয় না। এক দিন লোভের বশে দই খেয়ে ফেললো। ভয় হোল তার যদি অসুখ হয়। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল খেয়ে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো। ব্রহ্মপদের ঐ অবস্থা দেখে আশ্রমের পরমেশ্বর জিগ্‌গেস করলো, আপনি ওরকম করছেন কেন? আপনার আবার কি হলো?

প্রত্যুত্তরে গম্ভীরভাবে ব্রহ্মপদ বললো,—আমি পেটের দই ঘোল

বানাচ্ছি। ব্রহ্মপদের কীর্তির কথা আশ্রমের সকলেই জানলো। আমারও কানে এলো। ব্রহ্মপদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গল্পটি বলে স্বামীজী নিজেও হাসলেন, ভক্তবৃন্দকেও হাসালেন। বিশুদ্ধানন্দ শুধু কঠোর যোগীই ছিলেন না, ছিলেন রসিকশেখর। তাঁর হাস্যরস যেমন ছিল শিষ্যদের মনোরঞ্জনার্থে তেমনিই আবার ক্রোধও ছিল তাদেরই কল্যাণার্থে।

১৯১৯ সাল ছিল বিশুদ্ধানন্দের লৌকিক জীবনের মহাদুঃসময়। জানুয়ারী মাসে বাংলা ২২শে পৌষ মাতৃদেবী রাজরাজেশ্বরী দেবী ইহধাম পরিত্যাগ করলেন। তারপর দশদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় পুত্র বিষ্ণুপদ ও একমাত্র কন্যা বিশ্বেশ্বরীও ইহলীলা সম্বরণ করলেন।

ইতিপূর্বে স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী দেবীও ইহধাম পরিত্যাগ করেছেন। স্বামীজী এতবড় দুঃসংবাদেও ধীর, স্থির, নির্বিকার। অবশ্য সংবাদ পেয়ে কাশী থেকে ছুটে গিয়েছিলেন বণ্ডুলে এবং পারলৌকিক কার্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করলেন নিজ হাতে। পুরীধামে গিয়ে সমুদ্রতীরে মায়ের পিণ্ডদান করেন। কঠোর বৈরাগ্য ও তপস্যার জীবন হলেও স্ত্রী পুত্র কন্যা ও মায়ের প্রতি স্বামীজী কখনও কর্তব্যহীন হন নি। কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে উপযুক্ত পাত্র দেখে বিবাহও দিয়েছিলেন। বাহ্য ব্যবহারটি ছিল তাঁর ঠিক সাধারণ মানুষেরই মত। ঠিক যেন সরল প্রকৃতির একটি শিশু। ভগবানের মূর্ত প্রকাশ ছিলেন তিনি। তাঁর দেহ মন আত্মা। নিত্যকার প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়েই ছিল তাঁর অধ্যাত্মসাধনা। প্রতিটি দুঃখী তাপী প্রপীড়িত মানুষের জন্য ছিল তাঁর অন্তর সজাগ। তিনি ছিলেন মানবদরদী মহামানব। মানুষের সঙ্গে ভগবানের যখন মিলন ঘটে তখনই ভগবানের হয় পূর্ণ প্রকাশ। মানুষের মধ্য দিয়ে মানুষের রূপ ধরে ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। প্রপীড়িত মানুষ ভগবানকে কাছে পেয়ে পায় আনন্দ। পায় শক্তি শান্তি। তিনি মানুষের কাছে কিছু প্রত্যাশা করে এই ধূলার ধরণীতে অবতীর্ণ হন না। সংসারে পাপ এবং পাপী আছে জেনেই তিনি আসেন এই পৃথিবীতে। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার আনন্দ। মানুষের চলার পথের মধ্যেই যে তাঁর আনন্দ। তিনি যে আনন্দস্বরূপ। বিশুদ্ধ-আনন্দ। বিশুদ্ধানন্দ।

তাইতো কবি বলেছেন,

তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছো নীচে,
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
পূর্ণ প্রকাশিছে।

* * *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ আবার ভেসে চললেন দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে। ১৯২৭ সনের ১৭ই জুন কলকাতা থেকে কামাখ্যার পথে পা বাড়ালেন। পথের সঙ্গী হলেন প্রিয় শিষ্য গোপীনাথ কবিরাজ, যোগেশ বসু ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ। ১৮ই জুন আমিনগাঁও ও পাণ্ডু হয়ে পৌঁছুলেন কামাখ্যা ধামে। তিনদিন কামাখ্যা তীর্থে বাস করে ২২শে জুন যাত্রা করলেন গৌহাটির পথে। গৌহাটি বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন করে ২৩শে জুন আবার কলকাতার পথে রওনা। কলকাতায় কিছুদিন অবস্থান করে আবার যাত্রা করলেন কাশীধামের পথে। কলকাতায় স্বামীজী বাস করতেন রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাসায় ও কুণ্ডুরোডের আশ্রমে।

কাশীর আশ্রমে মাঝে মাঝেই ভাবানন্দে বিভোর হয়ে স্বামীজী গভীর রাত্রিতে গান করতেন

ও মন মুদে আঁখি জগৎ যে কি,
সকলই ফাঁকি এ ভব সংসার।
আমি আমার কেবা ভবে আছে যেবা
ছাড় সব কর হরিপদ সার।
ভাই বন্ধু স্মৃত আর পরিবার—
ভেবে দেখ মন কেই বা তোমার,

যবে হবে সবাকার এ দেহ তোমার
ভব পারে তোরে কে করে দেবে পার।
ভোলার মন, ভোলে অনিত্য বৈভবে
মিছে কেন তুমি মর ঘুরে ভবে ?
ভবারাধ্য ধন ভাবরে ভক্তিভাবে
ভব কারাগারে আসিবি না আর।

* * *

যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে
তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে।

* * *

'সে কি গানের মাধুরী! মুগ্ধ চিত্তে বাবার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করতাম।' বলছেন ভক্তপ্রবর মুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ। তিনি কাশীর আশ্রমে স্বামীজীর সঙ্গে তিন বৎসর বাস করেন।

আবার কখনও কখনও ভক্ত সুগায়ক মাখন ভট্টাচার্য স্বামীজীর রচিত সঙ্গীত স্বামীজীকে গেয়ে শোনাতেন।

স্বামীজীর মাতৃভক্তি একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। কাশীর বিজ্ঞান মন্দিরের হল ঘরে যখনই তিনি প্রবেশ করতেন তখনই দেওয়াল গাত্রে রক্ষিত মায়ের প্রতিমূর্তিকে প্রণাম না করে কখনও আসন গ্রহণ করতেন না। তিনি সর্বদাই বলতেন, 'জগতে যদি কোন নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকে তবে তা' মায়ের। অন্য সকলের ভালবাসার মধ্যে অল্পাধিক স্বার্থগন্ধ আছে। কিন্তু মায়ের স্নেহ একেবারেই বিশুদ্ধ········।

ছোটবেলা থেকেই আমি আমার মাকে ভক্তি করতাম। দেব-দেবীকে আমি বড় গ্রাহ্য করতাম না। কারণ সব ছিল আমার মা। যখনই যা করতে বলতেন আমি তা' নির্বিচারে পালন করতাম।'

* * *

বিশুদ্ধানন্দের অবস্থানে কাশীর 'বিশুদ্ধানন্দ কানন' আশ্রমটি আনন্দধামে হলো রূপান্তরিত। অসংখ্য ভক্ত সমাগম হতে লাগলো। গড়ে উঠলো ভক্তমণ্ডলী। পরমানন্দ অনুভব করতে লাগলো শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ। আনন্দ-

স্বরূপের সাহচর্যে এসে তাদের মন প্রাণ যেন বলে উঠলো 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।'

এই বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমেই ১৩৩২ সনে হলো শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ১৩৩৪ সনে সম্পন্ন হলো প্রথম দুর্গোৎসব। ১৩৩৫ সনে ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে অষ্টধাতুময়ী শ্রীদুর্গা প্রতিমা হলো প্রতিষ্ঠিত। তারপর এক শুভদিনে শ্রীশ্রী৺ গোপাল জিউকেও বর্দ্ধমান আশ্রম থেকে নিয়ে আসা হলো। রক্ষিত হলো গৌরীপট্টের বাম দিকে। সুরু হোল অনুষ্ঠান। উৎসব। জন্মাষ্টমী। দুর্গোৎসব। শিবরাত্রি। মহামহোৎসবের আনন্দে 'বিশুদ্ধানন্দ কানন' আশ্রম উঠলো মেতে। সেই বহু সাধুসন্তের চরণপূত শিবের লীলাভূমি প্রাচীন বারাণসীধাম বিশুদ্ধানন্দের অবস্থানে আবার যেন নূতন প্রাণে হয়ে উঠলো সঞ্জীবিত। ভক্ত প্রাণে বিমল আনন্দের ঢেউ হয়ে চললো প্রবাহিত। কাননকুন্তলা পৃথিবী। শ্যামলশস্যাঢ্য প্রান্তর। দলিতাঞ্জন ঘন নীল মেঘপুঞ্জ। কত গাছ কত ফুল কত রঙ কত পাখী কত ডাক কত জল কত সুর—একটি অনবদ্য ছন্দ। অবিচ্যুত শৃঙ্খলা। তারই মাঝে বিশুদ্ধানন্দ হলেন একটি প্রেমপ্রসন্ন রসপ্রকাশ। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস। এক বিশেষ ভঙ্গিতে অপূর্ব ভাষায় বিশুদ্ধানন্দ বলছেন ভক্তদের,—হ্যাঁ গো, যাদের সঙ্গে এতদিন ধরে ঘরকন্না করছো, তারা কি সহজে ছাড়তে চায়? সৎকর্মে বাধাবিঘ্ন তো আছেই। প্রথম প্রথম অনেক গোলমাল আসে, অনেক বিঘ্ন আসে। কিন্তু যখন দেখবে তুমি কিছুতেই টলছো না তখন তারা তোমাকে বিরক্ত করবে না।

যে কর্মই কর না কেন, তাতে যদি সিদ্ধিলাভ করতে চাও তার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে করে যাবে। তখন এদিক ওদিক দেখবে না। তাতে অবহেলা করবে না। একনিষ্ঠ হয়ে যে কাজ করে যাবে, দেখবে তাতে সুফল পাবেই। তার গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। ব্রহ্মা বিষ্ণুও নয়। মানুষের অসাধ্য কি আছে? তোমার মধ্যে যে কি শক্তি আছে তা তুমি জান না। চাই দৃঢ়তা। হওয়া চাই একনিষ্ঠ।

এইভাবে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী শত শত ধনী দরিদ্র উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য ভক্ত নিয়ে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরে স্বামীজীকে করতে হয়েছে নিত্য

লীলা। শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিহীন কঠোর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদের সঙ্গে করেছেন অতি বিচিত্র রকমের বিভূতিলীলা। তাদের যোগপথে আকৃষ্ট করতে, তাতে আস্থা ও বিশ্বাস নিয়োজিত রাখবার জন্যই ছিল এই বিচিত্র বিভূতি-লীলা খেলা।

সুদীর্ঘকাল লীলা অভিনয়ের পর স্বামী বিশুদ্ধানন্দের বাহ্যজীবনের উপর ধীরে ধীরে নেমে এলো যবনিকা। ১৩৪৪ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ পুরীধাম থেকে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে এলেন কলকাতায়। ভবানীপুর আশ্রমে। হোমিওপ্যাথিক এলোপ্যাথিক কবিরাজী কোন চিকিৎসাতেই কিছু হোল না। দেখলেন ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন ভক্তবৃন্দ। কিন্তু রোগের হোল না উপশম। বিষাদের করাল ছায়া সকলকে আচ্ছন্ন করলো গভীরভাবে।

অবশেষে সত্য সত্যই সেই ভীষণ দিনটি এসে উপস্থিত হলো। ১৩৪৪ সালের ২৭শে আষাঢ়। রবিবার। সুন্দর প্রভাত। শুরু হয়েছে পাখিদের কলকাকলি। আকাশে কিন্তু নির্মল নীলিমা নেই। জলভরা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ।

ধীরে ধীরে স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সুরের সঙ্গীত হলো উত্থিত। সঙ্গীত নয়—সুমিষ্ট সুরধ্বনি।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

—শিষ্যদেরও আদেশ করলেন, বলগো, রাম রাম হরে হরে……তখন সকলের মিলিত মৃদু মন্দ সুরে ঐ নাম গানের চললো আবৃত্তি। গীতমুখর হয়ে উঠলো আশ্রমগৃহ। মধুর রসের মহাসমুদ্রে অবগাহন করতে লাগলেন শিষ্যবৃন্দসহ যোগীবর স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। কীর্তনানন্দে হলেন বিভোর। দুই গণ্ড ভাসিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুবিন্দু। একি অদ্ভুত ব্যাপার! ভক্তিরসাত্মক কীর্তন করতে স্বামীজীকে পূর্বে কেউ দেখেনি। যোগ ও তন্ত্র সাধনার শক্তিতে শক্তিমান, ঋদ্ধি ও সিদ্ধির কঠোর সাধক এই মহাযোগী ভক্তিসঙ্গীতের লালিত্যের কখনও ধার ধারতেন না। মহাযোগীর জীবনে এ বিস্ময়কর ব্যতিক্রম! মর্ত্যলীলার শেষের দিনটিতে তারক ব্রহ্ম নামরসে

হয়ে রইলেন আচ্ছন্ন। যাবার দিনটিতে তিনি যেন বোঝাতে চাইলেন—লক্ষ্য এক, মত পথ ভিন্ন ভিন্ন। সকাল গেল, দুপুর গেল, অপরাহ্নের আলোও হয়ে এলো ম্লান। ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত পরীক্ষা করে বললেন, 'চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বাইরে চলে গেছেন।' আশ্রমগৃহ নিস্তব্ধ। অভ্যাসমত দক্ষিণ শিয়রে শুয়ে আছেন স্বামীজী। অতি শান্ত সৌম্যমূর্তি ঠিক নিদ্রিতের মত। মুখে নেই কোন বিকার চিহ্ন। চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত। অবশেষে বেলা ৫-৫৩ মিঃ মহাসমাধিতে হলেন নিমগ্ন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। মর্মন্তুদ বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হলো শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের। ভক্ত কবি গেয়ে উঠলেন,

দেহে যবে ছিলে কত বাসিয়াছ ভাল,
অভয় দিয়েছ ভয়ে, আঁধারেতে আলো।
দেহ ছাড়ি' কাছে কাছে আছ এই জানি,
সময়ে এগিয়ে দিও চরণ দুখানি।

অরবিন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ

ইউরোপে তখন মাৎসিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে দিগ্‌-দিগন্ত প্রকম্পিত করে ইতালির যুবসম্প্রদায়কে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন নবজাগরণের। তাঁরই নেতৃত্বে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ইতালি ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলো। সমগ্র ইউরোপের বাতাসে তখন ছিল স্বাধীনতার গানের উষ্ণতা। তখনও ভারত ছিল প্রসুপ্ত। তার গৃহ-প্রাঙ্গণে ওঠেনি শুভ শঙ্খনাদ। পরাধীনতার শৃঙ্খল-বন্ধনের বেদনার তীব্রতা তখনও সে পারেনি অনুভব করতে। অকস্মাৎ একদিন ঘটলো অগ্ন্যুৎপাত। ইতালির মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগলো বাঙলার মাটিতে। লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। সন ১৯০৫। বঙ্গদেশকে দুভাগ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সারা বঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে বিদেশী প্রহরণের দুঃসহ আঘাতের বেদনা হলো অনুভূত। দিকে দিকে দেশাত্মবোধের দুর্নিবার জয়যাত্রা হোল সুরু। বাঙলার আকাশে বাতাসে তুমুল আন্দোলনের দুর্জয় উন্মাদনা। বরোদার শান্তিময় জীবনের মাঝে বাংলার এক জ্ঞানতপস্বীর কানে তাঁর জন্মভূমির আহ্বান এসে পৌঁছলো। তপস্যা নিমেষে গেল টুটে। মাতৃভূমির আর্তনাদ শুনে তিনি জ্ঞানযজ্ঞের বেদী থেকে এলেন নেমে। জ্ঞানলক্ষ্মীর সাধকরূপে নয়, তেজোময় মন্ত্রদাতারূপে। তখন ১৯০৬ সাল। দ্বাদশ বৎসরের তপঃ-শক্তিতে অসীম বীর্যবান জ্যোতির্ময় পুরুষ বাঙলার সাতকোটি নর-নারীর মাঝে এসে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বন্দে মাতরম্'। বাঙ্গালী তার তন্দ্রালস ত্যাগ করে তাদের জাতীয়তা রক্ষা করতে সৈনিকের মত দাঁড়ালো। তারা বীর, একথা তারা সেদিন অকস্মাৎ তাদের অণুতে পরমাণুতে অনুভব করলো। বাঙলার প্রতি প্রান্তরে, পর্বতের শিখরে, অরণ্যের অন্তরে, সমুদ্রের কল্লোলে প্রতিধ্বনিত হলো জাতির সেই মহামন্ত্র—'বন্দেমাতরম্'। বাঙলার নব-জাগরণে, নব-বিপ্লবে কেঁপে উঠলো সুদৃঢ় বৃটিশ রাজশক্তির রাজসিংহাসন। সুরু হোল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যাত্রা।

বরোদার সেই অখ্যাতনামা জ্যোতির্ময় পুরুষই হলেন অরবিন্দ ঘোষ। ভবিষ্যতের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ।

যে সনাতন জাতীয়তার বেদীমূলে স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তার উপর অরবিন্দ জাতিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আত্মদানের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে দিলেন। আর সেই প্রেরণায় বাঙলার ছেলেরা নিঃশঙ্ক দুঃসাহসিকতায় মেতে উঠে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য ধ্বংসের নিশান উড়িয়ে রক্তাক্ত পথে অগ্রসর হলো। বিপ্লববাদের অধ্যাপক-গুরু হলেন অরবিন্দ ঘোষ। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যুবকবৃন্দের হৃদয়মন্দিরে এ নাম অতি দ্রুত আসন বিস্তার করে বসলো। অরবিন্দ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বিশ্বের জন্য ভারতের ঐক্য ও মুক্তির প্রয়োজন।

'Our aim will therefore be to help in building up India for the sake of humanity. This is the spirit of Nationalism which we profess and follow.'

১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতা মহানগরীতে* জন্ম নিলেন ভবিষ্যতের শ্রীঅরবিন্দ ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের তৃতীয় পুত্ররূপে। মা হলেন স্বর্ণলতা দেবী। ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। নবযুগের নব জাতীয়তার অন্যতম ঋষি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তাঁর ব্রাহ্মধর্ম ছিল হিন্দুধর্মেরই রূপান্তর। তিনি পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতেন না সত্য, কিন্তু তিনিই ছিলেন প্রকৃত হিন্দু। শেষ জীবনে 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে একখানি গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে উপনিষদ অনুবাদ করবার ভার দেন। সে যুগে ইংরাজী শিক্ষার সমাগমে উদারতার নাম নিয়ে দেশে যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়, রাজনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্য হতেই সেই উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে দেশপ্রীতির উন্মেষের জন্য আন্দোলন করেন। বঙ্গভূমিতে স্বদেশী আন্দোলনের যে সূত্রপাত হয় সেই আন্দোলনকে রাজনারায়ণের অভয়বাণী অনেকখানি অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

৮ নং সেক্সপীয়ার সরণীর গৃহ শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ ॥
গাও ভারতের যশোগান
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান।

* * *

কেন ডর ভীরু ? কর সাহস আশ্রয়
যত ধর্ম তত জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক ভারতের জয়
গাও ভারতের জয় ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যাঁরা সকল দিক দিয়ে সমগ্র জাতিকে নূতন প্রেরণায় উদ্বোধিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ অন্যতম। তিনি একাধারে ধার্মিক, সমাজসংস্কারক ও নির্ভীক দেশপ্রেমিক ছিলেন। এই 'ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির' সুগভীর ঋষিদৃষ্টি শ্রীঅরবিন্দ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। রাজনারায়ণের সঙ্গে অরবিন্দের একটি নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সংযোগ ছিল।

আর পিতৃদেব সে যুগের বিলেতফেরৎ ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ বহিরাবরণে পুরোদস্তুর সাহেব হলেও, তাঁর অন্তরে ভারতীয় সনাতন ভাবধারা ফল্গুধারার মত প্রবহমাণ ছিল। সিভিল সার্জনের পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও অপর রাজপুরুষদের মতো সাধারণ মানুষের প্রতি অবহেলা তাঁর ছিল না। দরিদ্রনারায়ণকে সেবা করার মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। রংপুর ও খুলনা শহরে সাধারণ দীন দুঃখী মানুষের মধ্যে তিনি দেবমানব রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। তবে দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা, করুণা, স্নেহ থাকলেও দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সামাজিক প্রথা ও লোকাচারের প্রতি তাঁর

কোনপ্রকার আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল না। কুসংস্কারকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাইতো দেখা যায় এবার্ডিন থেকে এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করে যখন তিনি দেশে ফিরলেন, তখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোন্নগর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, সমাজ-নেতারা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করবার বিধান দিলেন। তিনি অবশ্য গ্রামের মানুষদের বিধিনিষেধকে অবজ্ঞা করেই বিলেতে ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণধন কুসংস্কারের কাছে মাথা নীচু করেননি। দৃঢ়চেতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষ অন্যায়ের সঙ্গে আপোস রফা করে গ্রামে বাস করতে চাইলেন না। অবলীলাক্রমে প্রাচীন ঘোষ-বংশীয়দের আদি নিবাস কোন্নগর ত্যাগ করে চলে এলেন কলকাতা শহরে।

পিতৃদেব সম্বন্ধে বারীন ঘোষ 'আমার আত্মকথায়' বলছেন—'বাবার চেহারা আমার এখনও মনে আছে। শ্যামবর্ণ। বড় বড় ভাসা চোখ। মাইকেল মধুসূদনের মত মুখাকৃতি। নাতিদীর্ঘ ঋজু দৃঢ়পেশী শরীর। নূতন গুড়ের মত মিষ্টি স্বভাব। সদা প্রসন্ন মূর্তি। অথচ একরোখা শক্তিমান পুরুষ। ডাক্তারীতে তাঁর যশ ছিল প্রচুর। ঠাকুর দেবতার কাছে মানতের মত বহু রোগী তাঁর কাছে এসে জীবন ও পরমায়ু ভিক্ষা করতো। টাকা তিনি উপার্জন করতেন প্রচুর। আর ব্যয়ও করতেন অপরিমিত ভাবে। তাঁর দয়া ও মমতার কাহিনী খুলনায় এখনও কিম্বদন্তীর মত মানুষের মুখে মুখে রয়েছে।'

পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের স্বভাবের মাধুর্য, দৃঢ়চিত্ততা, হৃদয়াবেগ ও দরিদ্রের প্রতি একান্ত সহানুভূতি প্রভৃতি গুণরাজি অরবিন্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাইতো দেখা যায় রক্তে তাঁর ত্যাগের পরাক্রম, অন্তরে অনির্বাণ জ্ঞানশিখা।

অরবিন্দ-জননী স্বর্ণলতা দেবী স্বামীর চিন্তাধারা ও মানসিকতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে পারেন নি। স্বামীর সাহচর্যে মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে, দেখতে দেখতে ক্রমশঃ বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন। মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেন না। ধীরে ধীরে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণগুলি প্রবল হয়ে উঠলো। সন্তানদের মানুষ করে তুলবার ভার বহন করবার সামর্থ্যও ফেললেন হারিয়ে। ফলে অববিন্দের জন্মের পর থেকে মায়ের সঙ্গে কোন সম্পর্কই

থাকল না। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ হতে লাগলেন ইংরেজ আয়ার কাছে। শৈশবলীলার পাঁচটি বছর এইভাবেই হলো অতিক্রান্ত। পঞ্চমবর্ষে অরবিন্দ দার্জিলিংয়ের সেণ্ট পলস্ স্কুলে অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হলেন। সেই বয়সেই ইংরেজ অধ্যাপকগণ তাঁর প্রতিভার আভাস পান। এইভাবে শৈশবকাল হতেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পূর্ণ আবেষ্টনে ও আবহাওয়ার মধ্যে অরবিন্দের জীবন অতিক্রান্ত হতে থাকে। সেণ্ট পলস্ স্কুলে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর অরবিন্দকে ইংলণ্ড যেতে হয়। অরবিন্দ তখন মাত্র সাত বৎসরের বালক। ইউরোপীয় শিক্ষাকেই ডাঃ কৃষ্ণধন ব্যক্তিজীবনের বিকাশের সবচেয়ে বড় পথ বলে মনে করতেন। তাইতো পুত্রদের শিক্ষার জন্য সপরিবারে তিনি ইংলণ্ড যান। তখন ১৮৭৯ সাল। আবার আগষ্ট মাসেই একাকী কর্মক্ষেত্রে এলেন ফিরে। ইংলণ্ডে কিছুদিনের মধ্যেই অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারের হলো জন্ম। অবশেষে ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে স্বর্ণলতা দেবী ও কন্যা সরোজিনী ও নবজাত শিশু বারীন্দ্রকুমার সহ দেশে ফিরলেন। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বারীন্দ্রকুমারের জন্মের পর হতেই অরবিন্দ-জননী পূর্ণ মাত্রায় পাগল হয়ে যান। পরবর্তী জীবনে অরবিন্দ অনেক সময় নিজেকে —'পাগ্‌লী মায়ের পাগল ছেলে' বলে রহস্য করতেন। মায়ের প্রতি ভক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ।

বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও অরবিন্দ ইংলণ্ডে পড়াশুনা করতে লাগলেন।

রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট গ্লেজিয়ার সাহেব কৃষ্ণধনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই গ্লেজিয়ার সাহেবের আত্মীয় পাদ্রী ড্রুইড সাহেবের পরিবারে ম্যাঞ্চেস্টারে অরবিন্দরা তিন ভাই থাকতেন। ড্রুইডদের আত্মীয় অ্যাক্রয়েড পরিবারের সঙ্গে কৃষ্ণধনের ছিল খুবই ঘনিষ্ঠতা। পরবর্তীকালে এই অ্যাক্রয়েড পরিবারের মধ্যেও অরবিন্দরা ছিলেন। আর সেইজন্যই বিলাতে অরবিন্দের নাম হয়েছিল অরবিন্দ অ্যাক্রয়েড ঘোষ। প্রায় চতুর্দশ বৎসরকাল ইংলণ্ডে থেকে শিক্ষালাভ করেন অরবিন্দ। প্রথমে ম্যাঞ্চেস্টারে এক গ্রামার স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরে লণ্ডনের সেণ্টপলস্ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানেও প্রতিভা ও চরিত্রগুণে তিনি সকলেরই প্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তিলাভ করেন এবং কেম্বি্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে

প্রবেশলাভ করলেন। এখানে প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর ছেলে অস্কার ব্রাউনিংয়ের সংগে হলেন পরিচিত। অধ্যাপক অস্কার ব্রাউনিং তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন। অরবিন্দের লেখা প্রবন্ধ 'শেকস্‌পীয়ারের সঙ্গে মিলটনের তুলনা' পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মন্তব্য করলেন, 'আমার দীর্ঘ তের বছরের অধ্যাপনার জীবনে কোনও ছাত্রের এ ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত রচনা পড়বার সৌভাগ্য হয় নি।'

এই কিশোর বয়স থেকেই অরবিন্দের মনে ধীরে ধীরে দেশপ্রেমের বীজ বপন হয়। পিতাই অলক্ষ্যে এই বীজ বপন করেন। তিনিই পুত্রকে ভারতের প্রকৃত চিত্র লিখে পাঠাতেন। ভারতের সংবাদপত্রের অংশ-বিশেষও দাগ দিয়ে প্রেরণ করতেন। ভাবতেন বিদেশী শাসকদের এই অত্যাচার অবিচার এবং নানা বিষয়ে অনাচার সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান থাকলে I. C. S. হয়ে দেশে ফিরে অরবিন্দ এর প্রতিকার করতে পারবে। কিন্তু অরবিন্দের কিশোর চিত্তে এর বিপরীত প্রভাবই হয়েছিল। 'মাতৃভূমি শৃঙ্খলিত। পরাধীন দেশের সন্তান সে।' এই বোধই কিশোর চিত্তে স্বর্ণাক্ষরে যেন লিখিত হয়ে গেল। পিতার আদর্শ অনুসারে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা গ্রাস করবার জন্য বিলেতে গিয়ে কিন্তু অরবিন্দ স্বভাবজ প্রাচ্য ভাবধারার প্রতি বেশী শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ইতিপূর্বে মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। এবারে বাংলা ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন এবং মোটামুটিভাবে আয়ত্তও করে ফেললেন। পড়লেন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। দেশাত্মবোধ আরও দৃঢ় হলো। শুধু দেশকে ভালবাসা নয়, জীবন্ত রক্ত মাংসের 'মা' বলে মনে করা এবং মা'কে শৃঙ্খলমুক্ত করবার সূক্ষ্ম চিন্তা রক্তস্রোতের সংগে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। আনন্দমঠই তাঁর স্বদেশপ্রেমাগ্নিকে প্রজ্বলিত করে তুললো। এই সময়ে ভারতীয় প্রবাসী ছাত্রদের আলোচনা সভা 'মজলিস্'-এও অরবিন্দ যোগদান করতে লাগলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও ঐ আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করতেন। অবশেষে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় রেকর্ড

নম্বর সহ প্রথম স্থান লাভ করলেন। দ্বিতীয় হয়েছিলেন বীচক্রফ্‌ট, পরবর্তী কালে যিনি শ্রীঅরবিন্দের বিচারক হয়েছিলেন আলিপুর বোমার মামলায়। কিন্তু অশ্বারোহণের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় অরবিন্দ শেষ পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারলেন না।

এই প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার 'আমার আত্মকথায়' বলছেন, "সেখানে (লণ্ডনে) প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের আলোচনা সভা ছিল। তার নাম ছিল 'মজলিস্'। সেই সভায় গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ায় শ্রীঅরবিন্দ সেই বয়সেই গভর্ণমেণ্টের সুনজরে পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন সেখানে শ্রীঅরবিন্দের সমসাময়িক। I. C S. পরীক্ষায় বেশ সম্মানের সঙ্গে পাশ করেও, তুচ্ছ ঘোড়ায় চড়ায় যে তাঁকে অকৃতকার্য বিবেচনা করা হোল, তার কারণ খুবই সহজ। গভর্ণমেণ্টের ঐ সুনজর। সেই সময় এই নিয়ে ভারতের সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হয়েছিল।"

* * *

"I. C. S. পরীক্ষায় অরবিন্দ অকৃতকার্য হবার পর বাবা বড় নিরাশ হয়ে পড়েন। তাঁর বড় সাধ ছিল অরবিন্দ I. C. S. হয়ে এসে তাঁর মুখোজ্জ্বল করবেন।"

* * *

পুনরায় অরবিন্দ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের ভাণ্ডারে রত্ন আহরণ করতেই যেন অরবিন্দের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হলো। ক্রমে ক্রমে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করে তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উৎসে হলেন উপনীত। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাসিক্‌স্ ট্রাইপস্ পরীক্ষায় অরবিন্দ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। এবারে বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষার মোহও অরবিন্দের মন থেকে হলো বিদূরিত। ঠিক সেই সময়কার অরবিন্দের মানসিক জগতের চিত্র অঙ্কন করা খুবই দুরূহ। কারণ তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী এবং নির্বিকার। তবে কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মনে যে দেশপ্রেমের ভাব আত্মপ্রকাশ করে, বিলাতের কর্মবহুলতা ও বিলাসের আড়ম্বরের মধ্যেও তাঁর সে ভাব নির্বাপিত হয় নি বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ

তাঁকে বিপর্যস্ত করতে পারে নি। চতুর্দশ বৎসর ইংলণ্ডে প্রবাসেও তিনি পুরাদস্তুর সাহেবে পরিণত হন নি। দিবসের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ অতি ধীরে উঠে নামে। সীমাহীন মহাসমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতন দিন আসে, রাত্রি যায়। সপ্তাহ শেষ হয়। মাসের পর মাস চলে যায়। আবার আসে নূতন বছর। নূতন দিন। এমনই একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে ওঠে অরবিন্দের জীবনে। সুদীর্ঘকাল প্রবাস জীবনের পর অরবিন্দ যাত্রা করলেন ভারত অভিমুখে *বরোদা স্টেটের চাকুরী নিয়ে। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এই বৎসরই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকে সাগর পারে প্রচারের জন্য আমেরিকা ভূখণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আঠারোশো তিরানব্বুই ভারতের কাছে এক ঐতিহাসিক সাল।

ডাঃ কৃষ্ণধন তাঁর জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করে তুলতে চেয়েছিলেন অরবিন্দের মধ্য দিয়ে। পুত্রদের মধ্যে অরবিন্দের উপরই ছিল তাঁর খুবই ভরসা। সেই প্রাণপ্রতিম পুত্র অরবিন্দের দেশে ফিরবার সংবাদে অধীর হলেন পুত্রকে দেখবার আনন্দে। ছুটে গেলেন বোম্বাই শহরে। কিন্তু কোন্ জাহাজে আসছে জানেন না। নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন কর্মক্ষেত্রে। খুলনা শহরে। হঠাৎ পেলেন একটি ভুল টেলিগ্রাম। 'জাহাজডুবিতে মৃত্যু হয়েছে অরবিন্দের।' এ শেলাঘাত সহ্য করতে পারেন না কোমল হৃদয়ের মানুষটি। অকস্মাৎ বেদনা-বিচলিত বক্ষ ওষ্ঠ আর চক্ষু স্তব্ধ হয়ে যায় চিরদিনের মত। পুত্রের সঙ্গে দেখা করবার বাসনাটি অতৃপ্তই রয়ে গেল।

অরবিন্দ দেশে ফিরেই অনুভব করলেন সুগভীর বেদনা। পিতার

*এই চাকুরী গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। পিতার নিকট থেকে নিয়মিত ভাবে টাকা না এসে পৌঁছানোর জন্য ওঁরা তিন ভাই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন বিলেতে। দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছিল। কৃষ্ণধন অর্থ উপার্জন করতেন যেমন প্রচুর অপরদিকে ছিলেন তেমনি বেহিসেবী। বাংলার লাট স্যার হেনরী কটনের ভাই জে. এস্. কটনের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল বিনয়ভূষণের। বরোদার মহারাজা সয়াজি গাইকোয়াড় তখন ছিলেন লণ্ডনে। জে. এস. কটন পরিচয় করিয়ে দিলেন অরবিন্দকে গাইকোয়াড়ের সঙ্গে। তারই ফলশ্রুতি এই চাকুরী।

মৃত্যুর কারণ তিনিই যে স্বয়ং। মন আরও বিষণ্ণ হয়ে যায়। ক্লান্ত। বেদনাদগ্ধ। তবুও বিচলিত হলেন না। জয় করলেন বেদনাকে। বেদনার মধ্যেই—মহাশূন্যের নিঃসীম আঁধারের শুকতারার মত ওঁর অন্তর-আকাশে সহসা দীপ্যমান হয়ে উঠলো আলোর শিখা যে আলোতে তাঁর সমগ্র অনাগত জীবন আলোকিত হয়ে থাকবে।

অরবিন্দের কর্মক্ষেত্র হোল বরোদা। যৌবনের আত্মসাধনার সাধনপীঠ। জ্ঞান ও তপস্যার পীঠস্থান। মহারাজার স্নেহধন্য অরবিন্দ বরোদায় এসে যেন জ্ঞানলাভের কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। দিবারাত্র পড়াশুনার গভীরেই ডুবে যেতে লাগলেন। মহারাজাও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ওঁকে পড়াশুনার গভীরেই থাকতে দিতেন। অবশেষে অরবিন্দেরই অনুরোধে মহারাজা ওঁকে রাজকার্য পরিচালনার পরিবর্তে বরোদা কলেজের অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত করলেন। ধীরে ধীরে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক থেকে ইংরাজীর অধ্যাপক এবং ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল রূপে কর্মভার গ্রহণ করলেন। ছাত্র-সমাজের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। বরোদার ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ অরবিন্দের পাণ্ডিত্য, সরলতা ও দেবপ্রভায় মুগ্ধ হলেন। ভবিষ্যতের এই মহামনীষী বরোদার আপামর জনসাধারণের নিকট তখনও হয়ে রইলেন অপ্রকাশ। শুধুমাত্র অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ ছাড়া কিছুই নয়। গুর্জর ভূমির মরুবক্ষে লুক্কায়িত বাংলার রত্নটিকে কেউই আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন না তখনও পর্যন্ত।

অকস্মাৎ অরবিন্দের অন্তরে মাতৃভাষায় জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠলো। লিখলেন চিঠি মামাদের কাছে একজন সাহায্যকারীর জন্য। মাতুল যোগীন্দ্রনাথ বসু সে-যুগের খ্যাতনামা লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে নির্বাচন করলেন অরবিন্দের জন্য। দীনেন্দ্র রায় বরোদায় এলেন অরবিন্দের বাংলা ভাষার শিক্ষক হয়ে। ঠিক গতানুগতিক শিক্ষকরূপে নয়, অরবিন্দকে বাংলাভাষা পড়তে সহযোগিতা করতে ও সঙ্গ দিতে।

ধীরে ধীরে অরবিন্দ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে ফেললেন মাতৃভাষা—বাংলা ভাষা। সাহিত্যিক দীনেন্দ্র রায়ের সহায়তায় আবার পড়লেন

বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ে আবার পুলক অনুভব করলেন দেহে মনে আত্মায়। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের অপূর্ব যাদু ওঁকে এক অনবহিত আনন্দলোকে নিয়ে গেল। এই তো দেশমাতৃকার প্রকৃত সম্বোধন। দেশকে ভালবাসবার, দেশবাসীকে উদ্দীপিত করবার এই তো মন্ত্র-চৈতন্য! বঙ্কিমচন্দ্র অরবিন্দের মনোজগতে অভূতপূর্ব এক আলোড়নের সৃষ্টি করলেন। নব চৈতন্যের প্রাণশক্তিরূপে মূর্ত হয়ে উঠলেন। সর্বাঙ্গে তাঁর নবজীবনের পরিপূর্ণ শোভা। অন্তরে জাগলো নূতন দিনের নব উন্মাদনা।

আনন্দমঠই তাঁর ধ্যান ধারণা ও বিপ্লবী চিন্তার প্রেরণারূপে মূর্ত হয়ে উঠলো। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অরবিন্দের শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। ইংরাজীতে একটি সনেট* লিখে বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করলেন। ইংরাজীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ লিখলেন বোম্বের 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে।

'Supreme service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of our Mother. The new intellectual idea of the Motherland is not in itself a great driving force; the mere recognition of the desirability of freedom is not an inspiring motive.

* * *

…a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal looked round for the truth and in a fated

---

*'O plains, O hills, O rivers of sweet Bengal,
O land of love and flowers, the spring bird's call
And Southern Wind are sweet among your trees
Your Poet's Words are sweeter far than these."

"হে বঙ্গের জলস্থল, হে চিরসুন্দর সুশোভন,
মধুর তোমরা সবে, মধুময় দক্ষিণ পবন—
বঙ্গের নিকুঞ্জবনে পিককণ্ঠে আছে মধু জানি,
তা হ'তে অধিক মধু মঞ্জুবাক্য বঙ্কিমের বাণী।"

অনুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

moment somebody sang Bande Mataram. The Mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of Patriotism.'

*   *   *

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলি পাঠ করে বললেন, —'স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।' স্বামী বিবেকানন্দও অরবিন্দের অন্তর্জগতের প্রেরণা হয়ে রইলেন।

পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। পড়লেন তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। দীনবন্ধু মিত্রের রচনাবলী। সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাটী ও মারাঠা ভাষাও অরবিন্দ আয়ত্ত করে ফেললেন নিজের চেষ্টায়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে অরবিন্দ ছিলেন যেন ভাষার যাতুকর।

ভবিষ্যতের মহাবিপ্লবী—ঋষি—শ্রীঅরবিন্দকে খুব কাছে থেকেই দেখেছিলেন সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার। কাছের মানুষ অরবিন্দ রূপে। নির্বিকার স্বল্পভাষী তরুণ অধ্যাপক অরবিন্দ রূপে। স্বার্থলেশশূন্য সরল প্রকৃতির একজন মানুষ রূপেই শুধু অরবিন্দকে দেখেছিলেন। অরবিন্দের পাঠানুরাগ সম্বন্ধে দীনেন্দ্রকুমার বলছেন, 'এমন অদ্ভুত পাঠানুরাগ আমি আর কাহারও দেখি নাই। রাত্রি একটা পর্যন্ত দুঃসহ মশক দংশন উপেক্ষা করিয়া টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, 'জুয়েল ল্যাম্পে'র আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় একই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম। যোগনিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য! ঘরে আগুন লাগিলেও বোধ হয় তাঁহার হুঁস হইত না! তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের নানা ভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যাস আলমারীতে, গৃহকোণে, ষ্টীলট্রাঙ্কে পুঞ্জীভূত ছিল

হোমারের ইলিয়াদ, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। রুশীয় ভাষার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন কি চিত্রশিল্পে, কি সাহিত্যে' রুশীয়া একদিন ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।'

* * *

'এই সময়ে তিনি মহাভারতের অনুবাদ করিতেছিলেন। বাঙ্গলা ভাল বুঝিতে না পারিলেও সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত তিনি সুন্দর বুঝিতে পারিতেন। তিনি ধারাবাহিকরূপে অনুবাদ করিতেন না। মহাভারতের এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেন। ইংরাজীর নানা ছন্দে কবিতা লিখিতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁহার ইংরাজী কবিতাগুলি সরল ও মধুর। বর্ণনা অতি পরিস্ফুট ও অতিরঞ্জন-বিরহিত। শব্দচয়নের শক্তিও তাঁহার অসামান্য। তিনি কখনও শব্দের অপপ্রয়োগ করিতেন না। ছোট আকারের 'গ্রে-গ্রানাইট' রঙের চিঠি লেখার কাগজে প্রথমে কবিতাগুলি লিখিতেন। প্রায়ই কাটাকুটি করিতেন না। লিখিবার পূর্বে সিগারেট টানিতে টানিতে খানিকটা ভাবিয়া লইতেন। তাহার পর তাঁহার লেখনীমুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া লেখনীকে বিরাম দিতেন না। সে সময় কেহ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হইতেন। কিন্তু সে বিরক্তি অন্যে বুঝিতে পারিত না। অরবিন্দকে কখনও রাগ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। কোন রিপুকেই তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যাইত না। বিস্তর সাধনা ভিন্ন মানুষ এরূপ আত্মজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। যেদিন তাঁহার কবিতা মনের মত সুন্দর হইত সেদিন তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখিতাম।

ব্যাস অপেক্ষা আদিকবি বাল্মীকির তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। কবিত্বে বাল্মীকির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একবার তিনি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "মহাকবি দান্তের কবিত্বে মুগ্ধ

হইয়াছিলাম, হোমারের ইলিয়াদ পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। ইউরোপের সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। কিন্তু কবিত্বে বাল্মীকি সর্বশ্রেষ্ঠ। রামায়ণের তুল্য মহাকাব্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।" '

* * *

'তোমার এইসব কবিতা দেখিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে আমি কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছি ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে! তোমার এই কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমি আমার লেখা কখনই ছাপাইতাম না। এখন মনে হইতেছে আমি ছেলেখেলা করিয়াছি।' মুগ্ধ চিত্তে বললেন রমেশচন্দ্র দত্ত তরুণ কবি অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষকে। বরোদায়। তাঁর লেখা ইংরাজী কবিতাগুলি পড়ে। তখন ১৮৯৯ সাল। মহারাজের আমন্ত্রণে রমেশচন্দ্র বেড়াতে এসেছেন বরোদাতে। সে যুগে রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ বিলেতে সুপ্রশংসিত। তাঁর প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনায় তরুণ অরবিন্দের ভাবের কোনও পরিবর্তন হলো না। যোগীর মত নির্বিকার রইলেন। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে অরবিন্দ চিরদিনই নির্বিকার ছিলেন।

এই তরুণ কবি-অধ্যাপক অরবিন্দ সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বড়ই বিচিত্র। তিনি 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা মানুষ অরবিন্দের কিছু চিত্র এই ছোট্ট গ্রন্থটির মাধ্যমে পেয়ে থাকি। দীনেন্দ্রকুমারের ভাষায়, 'অরবিন্দকে বাঙ্গলা পড়াইতে হইবে ভাবিয়া প্রথমে আমার বড় ভয় হইয়াছিল। অরবিন্দ প্রগাঢ় পণ্ডিতলোক, সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় তিনি লাটীন ও গ্রীকে এত অধিক নম্বর পাইয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার পূর্বে দেশী বিলাতী কোনও পরীক্ষার্থীই উক্ত দুই ভাষায় তত বেশী নম্বর পান নাই।

অরবিন্দকে দেখিবার পূর্বে তাঁহার যে মূর্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম তাহা হইল, সাহিত্য-সম্পাদক বন্ধুবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ন্যায় প্রকাণ্ড জোয়ান চোখে চশমা অধিকন্তু আপাদমস্তক হ্যাটকোট বুটে মণ্ডিত। মুখে বাঁকা বাঁকা বুলি, চক্ষুতে কটমট চাহনি, মেজাজ ভয়ঙ্কর রুক্ষ। মনে

হইয়াছিল 'পান হইতে চুনটুকু খসিলেই' বুঝি সর্বনাশ! বিলাত দুরের কথা, বোম্বাই পর্যন্ত না গিয়াই অনেকে যখন 'হনুকরণের' মোহে উৎকট 'গোরাত্ব' লাভ করে, তেলাপোকা কাঁচপোকা হইয়া যায়, তখন আঠার বিশ বৎসর বিলাতে বাস করিয়া অরবিন্দ না জানি কি বিকট জানোয়ারত্ব লাভ করিয়াছিলেন ভাবিয়া হৃৎকম্প হইল।

সুতরাং বলা বাহুল্য অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে আহমদাবাদের মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা খাদি, কাছার আধখানি খোলা, গায়ে আঁটো মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরাজী ফরাসী লাটীন হিব্রু গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান্ অরবিন্দ ঘোষ! দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত, 'ঐ হিমালয়', তাহা হইলেও বোধ হয় ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না! যাহাহউক দুই একদিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম, অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁহার হাসি শিশুর হাসির মত সরল তরল ও সুকোমল। হৃদয়ের অটল সঙ্কল্প ওষ্ঠপ্রান্তে আত্মপ্রকাশ করিলেও মানবের দুঃখে আত্মবিসর্জনের দেবদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সে হৃদয়ে পার্থিব উচ্চাভিলাষের বা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। অরবিন্দ তখনও বাঙ্গলা কথা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিবার জন্য তাঁহার কি প্রগাঢ় ব্যাকুলতা! দিবারাত্র একত্র বাস করিয়া ক্রমে যতই অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম অরবিন্দ এ পৃথিবীর মানুষ নহেন। অরবিন্দ শাপভ্রষ্ট দেবতা।

* * *

অরবিন্দ একা মানুষ। বিলাসিতার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। একটি পয়সারও অপব্যয় ছিল না। তথাপি মাসের শেষে তাঁহার হাতে এক পয়সাও থাকিত না। অনেক সময় তাঁহাকে বন্ধুগণের নিকট টাকা ধার করিতে দেখিয়াছি। তিনি বেতন পাইলে সর্বাগ্রে তাঁহার মাতা ও ভগিনীকে

খরচের টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার ভগিনী তখন বাঁকীপুরে 'অঘোর পরিবারে' থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। তাঁহার সহোদরা, তাঁহার মাস্‌তুতো ভগিনী প্রভৃতি সকলকেই তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহাদিগকে পত্রাদি লিখিতেন। টাকা পাঠাইতেন।

অরবিন্দ কখনও সাজ-পোষাকের পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি রাজদরবারে যাইবার সময়েও তাঁহাকে সাধারণ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই। মূল্যবান জুতা জামা টাই কলার ফ্লানেল লিনেন পঞ্চাশ রকম আকারের কোট হ্যাট ক্যাপ—এ সকল তাঁহার কিছুই ছিল না। কোন দিন তাঁহাকে হ্যাট ব্যবহার করিতে দেখি নাই। পাঁচ সাত টাকা মূল্যের একখানি নীল আলোয়ান তাঁহার শীতবস্ত্র ছিল। যতদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য-নিরত পরদুঃখ-কাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না। যেন জ্ঞান সঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্মকোলাহল-মুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন।'

অরবিন্দ অল্পাহারী ছিলেন তবে নিরামিষাশী নন। মাছ মাংস সবই খেতেন। নিয়মিত ইসবগুল খেতেন, সিগারেটও খেতেন। ব্রাহ্মপরিবারের মানুষ হলেও থিয়েটারের প্রতি জাতক্রোধ ছিল না। কলকাতার 'স্টার' থিয়েটারে কয়েকবার অভিনয় দেখেছেন। একবার চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখেছিলেন। বরোদার 'সয়াজি-বিজয়' রঙ্গমঞ্চে 'তারাবাঈ' নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন। কোন বিষয়েই তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না।

অরবিন্দকে বাংলাভাষায় শিক্ষাদান প্রসঙ্গে কৌতুকপূর্ণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন শিক্ষক দীনেন্দ্রকুমার।

'কথোপকথনের ভাষা অরবিন্দ ভাল বুঝতে পারতেন না বলে অনেক অংশ আমাকে ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হোত। কিন্তু আমার পাণ্ডিত্য এত অধিক ছিল না যে, অরবিন্দের মত ছাত্রকে তাঁর সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করি। যেখানে আমার বিদ্যায় কুলাত না সেখানে বিভিন্ন উপায়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম। প্রতিভাবান অরবিন্দ অর্থটা কোন রকমে বুঝে নিয়ে, স্বয়ং ইংরাজীতে তার বিষদ

ব্যাখ্যা করে, সেই ব্যাখ্যা ঠিক হলো কিনা জানতে চাইতেন। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে বুঝতাম তিনি ঠিকই বুঝেছেন। আমার মনে পড়ছে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' পড়াবার সময় একটা ছড়ার ব্যাখ্যা করতে আমাকে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়েছিল।

'মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্ কচ্,
মামীর পিরীতে মামা হ্যাঁকচ্-প্যাঁকচ্।'

এর ঠিক অনুবাদ করা, আমি ত দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দিগ্‌গজেরও অসাধ্য! বিস্তর চেষ্টা করেও হ্যাঁকচ্-প্যাঁকচ্‌টা কি, অরবিন্দকে বুঝাতে পারি নাই। পিরীতের হ্যাঁকচ্-প্যাঁকচ্ অরবিন্দ বোধ হয়তো জীবনে বুঝতে পারবেন না। পারলে তাঁর এ দুর্দশা হবে কেন?'

* * *

অরবিন্দের বাংলা লেখা সম্বন্ধে মধ্যম ভ্রাতা কবি মনোমোহন ঘোষ রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, 'অরবিন্দের কবিতার বই সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয় তা জানবার জন্য সে উৎসুক, কিন্তু আপনি এখন কত ব্যস্ত আছেন তা আমি তাকে বুঝিয়ে বলেছি এবং জানিয়েছি যে তার বইয়ের প্রতি সুবিচার করার জন্য আপনার অবসর মত আপনি তাকে পরে লিখবেন। সে এখন ব্যস্ত বাংলা কবিতা লেখায়। ইংরাজী কবিতা রচনায় সে সুন্দর সুদক্ষ, এখন সে বৃথা সময় নষ্ট করছে বাংলা কবিতা লেখার চেষ্টায়। লিখছে 'উষা হরণ কাব্য', মধুসূদনী ঢং-এ।'

অরবিন্দের প্রথম দিককার বাংলা লেখা অবশ্য তাঁর স্ত্রীর নিকট পত্র লেখার মাধ্যমেই হয়। ১৯০১ সালে বরোদার শিক্ষাব্রতী জীবনেই অরবিন্দ বিবাহ করেন শ্রীভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীকে। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে। কিন্তু এই বিবাহিত জীবন সাধারণ মানুষের মত সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হয় নি। মৃণালিনী দেবীর পক্ষে অরবিন্দ এত বিরাট ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে সমান তালে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। অরবিন্দ স্ত্রীকে জীবনযজ্ঞে আহ্বান করে বললেন,—'তুমি কি পাগলের উপযুক্ত পাগলিনী হবার চেষ্টা করবে..........।' স্বদেশ সম্পর্কে স্ত্রীকে বললেন,—'অন্যলোকে স্বদেশকে একটি জড় পদার্থ বলে মনে করে, কিছু মাঠ নদী ক্ষেত্র পর্বত নিয়ে যার উপস্থিতি, কিন্তু আমি স্বদেশকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করি।'

'তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোকে অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামি বলে, তবে পাগলের কর্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্রলোকের মধ্যে দশ জন অসাধারণ, সেই দশজনের মধ্যে একজন কৃতকার্য হয়। আমার কর্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রী-জাতির সব আশা সাংসারিক সুখ-দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না। দুঃখই দেয়।

হিন্দুধর্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অসামান্য চরিত্র-চেষ্টা-আশাকে বড় ভালোবাসিতেন, পাগল হোক্ বা মহাপুরুষ হোক্ অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন। কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ংকর দুর্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? ঋষিগণ এক উপায় ঠিক করিলেন। তাঁহারা স্ত্রী-জাতিকে বলিলেন, তোমরা অন্য হইতে পতিঃ পরমোগুরুঃ, এই মন্ত্রই স্ত্রী-জাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী, তিনি যে কার্যই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য নির্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।"

* * *

বরোদার চাকুরি জীবনে অরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিতে পারেন নি সত্য। কিন্তু নিজেকে আড়ালে রেখে এবং নিজের নাম গোপন রেখে কাজ করে গেছেন। পশ্চিম ভারতে যে গুপ্ত সমিতি ছিল তার সভ্য হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন এবং বোম্বাইতে তাদের

পরিষদেও যোগদান করেছিলেন, যদিও তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারা সেই পরিষদের নির্দেশের পথে চলেনি। বাংলাদেশে তাঁদের দলের কোনো সভ্য বা সমর্থক না থাকায় অরবিন্দ নিজেই ভার নিলেন সেই উদ্দেশ্যকে বঙ্গভূমিতে প্রচার করতে। গুজরাটে বিপ্লবীদের যে গুপ্ত সমিতি ছিল ঠাকুর সাহেব ছিলেন তার প্রেসিডেণ্ট। তিনি তখন দেশে নেই। জাপানে গেছেন বৈপ্লবিক কাজের সলা-পরামর্শ করতে। তাঁর পদে অরবিন্দ প্রেসিডেণ্ট হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ইংলণ্ডে থাকাকালীনও অরবিন্দ একটি গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠনের সভ্য ছিলেন। তার নাম ছিল 'লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার' (কমল ও কৃপাণ)। কিন্তু সে সমিতি অচিরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল।

রাজনৈতিক চেতনার পূর্ণতা নিয়েই অরবিন্দ ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় 'New Lamps for Old' ('পুরোনোর স্থানে নূতন আলো') প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে। অরবিন্দ তাঁর কেম্বি্জের বন্ধু কে. জি. দেশপাণ্ডের অনুরোধে ওঁর কাগজ 'ইন্দুপ্রকাশে' প্রবন্ধগুলি লেখেন ধারাবাহিক ভাবে ১৮৯৩ সালের আগষ্ট মাসে। 'If the blind lead the blind shall they not both fall into a ditch ?..........that it can truthfully be applied to the National Congress yet that it can be so applied.......... A body like the Congress which represents not the mass of the population, but a single and very limited class could not honestly be called national*.......' মূল বক্তব্য ছিল নির্ভয় আত্ম-প্রচেষ্টার জন্য দেশের নেতাদের সক্রিয় হতে বলা যা তখনকার কংগ্রেস নীতির একেবারেই ছিল বিরোধী। অরবিন্দের এই স্পষ্টোক্তিতে তাঁরা খুবই চটে গেলেন এবং একজন নরমপন্থী নেতা সম্পাদককে শাসিয়ে দিলেন। ফলে এই প্রবন্ধগুলির ধারাবাহিক ভাবধারার সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলিকে থামিয়ে দেওয়া হলো। পরিবর্তে সাধারণভাবে কংগ্রেসের সম্বন্ধে এই বলা হোল যে কেবল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জনসাধারণকেও যেন এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

*'Indu Prakash'—1893, August 7th & 28th

বিলেতি মতে সাজানো কংগ্রেসের কেরামতি তরুণ বিপ্লবী অরবিন্দের চোখে হয়ে উঠেছিল অসহ্য। তাইতো প্রাজ্ঞ পুরুষের মত বললেন, 'আমাদের প্রকৃত শত্রু বাইরের কেউ নয়, সে শত্রু আমাদেরই মনে পোষা স্পষ্ট দুর্বলতা, দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে অর্থহীন ভাবাবেগ...... সুতরাং আমাদের পুরুষকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, সেই সঙ্গে সকলের সহানুভূতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়া.........'।*

পরে অবশ্য এই লেখাই আরও সুষ্ঠু হয়ে 'বন্দেমাতরম্' কাগজের পাতায় পাতায় জ্বেলে দিয়েছিল বিপ্লবী চিন্তার বহ্নি।

মারাঠা সিংহ বালগঙ্গাধর তিলক তখন তেজস্বিতার জন্য সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। আহমদাবাদে অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হলো তিলকের। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হলো সখ্য। নির্জনে উভয়ে উভয়ের কর্মপ্রণালীও ব্যক্ত করলেন যার ফলশ্রুতি স্বরূপ বাংলা মহারাষ্ট্র একত্রে পূর্ণস্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সক্রিয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে।

বরোদার কর্মক্ষেত্র থেকেই অরবিন্দ ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমারকে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য বিপ্লবী কর্মের দীক্ষায় করলেন দীক্ষিত। যুবক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছদ্মনামে বরোদা রাজ্যের সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করতে সাহায্য করলেন। উদ্দেশ্য হাতে কলমে শিক্ষা। পরবর্তীকালে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার অনুশীলন দলের অন্যতম কর্মী ও সংগঠক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কলকাতায় তখন ব্যারিস্টার পি. মিত্র বিপ্লবীদের একটি আখড়া প্রতিষ্ঠা করেছেন। যুবকদের তিনি শরীরচর্চা, লাঠিখেলা ও কুচকাওয়াজে অভ্যস্ত করে তুলতে লাগলেন। এঁরই শিষ্য পুলিন দাস ঢাকায় অনুশীলন দলের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে চন্দননগরে মতিলাল রায় প্রবর্তক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিপ্লবীরা এই কেন্দ্রে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষালাভ করতে লাগলো। এইভাবে একে একে কুমিল্লা ঢাকা ফরিদপুর বরিশাল মেদিনীপুর কলিকাতা ও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা

*New Lamps for Old—2, 'Indu Prakash' of Bombay, 1893, August 21st.

গুপ্ত সমিতি স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে লাগলো। মাঝে মাঝে ছুটির অবকাশে অরবিন্দ কলকাতায় এসে তাঁর উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠু ধারায় প্রবাহিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সে সময়ে অরবিন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিষ্ক্রিয় নীতিবাদীও ছিল না, আবার দুর্বল শান্তিবাদীও নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনকে তখনকার দিনের জাতীয় মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্ক্রিয় বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন ছিল বলেই তা করা হয়েছিল, অহিংসবাদ বা শান্তিবাদের আদর্শ হিসাবে নয়। তাঁর মতলব ছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে দখলের মধ্যে আনা, যাতে তা বিদেশী সরকারের কাছে খোসামুদির কাঁদুনি গাওয়া এবং কেবল বক্তৃতা করা ও প্রস্তাব পাশ করার পরিবর্তে প্রকৃত বিপ্লবধর্মী তৎপরতার কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে ওঠে। আর এই কংগ্রেসকে আয়ত্ত করা যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে এমন এক বিপ্লববাদী কেন্দ্রের সৃষ্টি করা যার দ্বারা আসল কাজগুলি আরম্ভ করা যেতে পারে। তা হবে এই রাজ্যের মধ্যেই একটা আলাদা রাজ্য গড়ে তোলার মত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সরকারের সর্বকাজে অসহযোগ ও নীরব বিরোধিতার দ্বারা বিদেশী সরকারের রাজ্যশাসনকে ক্রমশঃ অসম্ভব করে তোলা, সর্বব্যাপী অশান্তিপূর্ণ আন্দোলন সৃষ্টি করা, প্রয়োজন বোধে দেশব্যাপী প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করা, স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলা যারা হবে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সেনাদল। ১৯০২ সাল থেকেই অরবিন্দ তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালনা করবার কথা চিন্তা করছিলেন।

আর এই ১৯০২ সালেই ঘটে অরবিন্দের জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎলাভ ঘটে বরোদা স্টেশনে। নিবেদিতা বরোদায় এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বড় বড় রাজ-কর্মচারীর সঙ্গে অরবিন্দও এসেছেন। মহারাজ সয়াজি গাইকোয়াড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য রমেশচন্দ্র দত্তও অপেক্ষা করছেন। প্রথম পরিচয়ের পর নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ী বরোদা শহরে প্রবেশ করলো। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর নিবেদিতা উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণে বের হয়েছিলেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান শহর-গুলিতে অনেক দেশবিখ্যাত নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন, অনেক সভা

সমিতিতে উত্তেজনাপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন। পরাধীন জাতির মধ্যে এইভাবে তিনি স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। তিনি বেদান্তের মোক্ষও প্রচার করলেন না, সংসার মায়া ও মিথ্যা একথাও বললেন না। প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করলেন,—'আমার কাজ এই জাতকে জাগ্রত করা।'

অরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন হতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। প্রথমে নিবেদিতাই বললেন,—কলকাতা আপনাকে চায়। আপনার উপযুক্ত স্থান বাংলা দেশ।

—না আমি অন্তরালে, পশ্চাতেই থাকবো। আমার কাজ মানুষ তৈরী করা। বললেন অরবিন্দ। এবারে নিবেদিতা উৎফুল্ল চিত্তে অরবিন্দের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, —আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলে জানবেন।

তারপর গোপনে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হলো। উভয়ের দার্শনিক মতবাদের প্রসঙ্গও উঠলো। একত্রে কাজ করবার জন্য দু'জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হলেন। সে কাজটি হলো ভারতবর্ষকে ইংরাজের অধীনতা হতে মুক্ত করা।

এই প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার বলছেন, *—'বরোদায় অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর হতেই নিবেদিতা আমাদের কলকাতার গুপ্তসমিতির দলে এসে যোগ দিয়েছিলেন।' লণ্ডনে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের কয়েক বৎসর পূর্ব হতেই ক্রপট্‌কিনের সংস্পর্শে এসে তিনি বিপ্লবপন্থী হয়েছিলেন। আইরিশ হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিয়ে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি আন্দোলনের যে কয়টি বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল লণ্ডনে, নিবেদিতা ঐ বিপ্লবের কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ভারও গ্রহণ করেছিলেন।

অরবিন্দ ও নিবেদিতা এই দুই মহাবিপ্লবী যেদিন পরস্পর মিলিত হলেন, বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে সেদিন এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হলো। অরবিন্দ আদর্শে বিপ্লবী (থিওরেটিক্যাল), আর নিবেদিতা হাতে কলমে কাজে বিপ্লবী (প্র্যাক্‌টিক্যাল)।

---

*আত্মকথা—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

'জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা'—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

যতীন্দ্র ব্যানার্জী ও বারীন্দ্রকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ও শেষে পরপর গুপ্তসমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে অরবিন্দই কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। অরবিন্দ নিজেও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসমিতির কাজে দু'বার কলকাতায় এসেছিলেন। মেদিনীপুরেও গেছেন। বিপ্লবীর দীক্ষা দিয়েছেন হেমচন্দ্র কানুনগোকে। 'বন্দেমাতরম্ তাঁতশালা' নামে বিপ্লবীদের এক আখড়া প্রতিষ্ঠার প্রেরণাও দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অরবিন্দের সঙ্গে মিলন হলো স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার—তেজস্বী বিপ্লবী মহীয়সী মহিলা নিবেদিতার। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ আনন্দমঠের অনুকরণে 'ভবানী মন্দিরে'র পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা পুস্তিকাকারে প্রকাশিতও হয়। স্থির হয় যে দেশের দিকে দিকে মায়ের মন্দির স্থাপিত হবে, আর এগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে তরুণ কর্মযোগীদের আশ্রম। এই আশ্রমের কর্মীরা জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং গঠনমূলক কাজে ব্রতী হবে। এই সঙ্গে চলবে তাদের সামরিক সংগঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনকারী যোগাভ্যাস। প্রথমদিকে নর্মদাতীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে, তারপর কলকাতার মুরারিপুকুরের বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সে সময় গঙ্গোনাথ আশ্রমের গুরু ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। উচ্চকোটির যোগী ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল অরবিন্দের উপর। তাঁরই শিষ্য কেশবানন্দজীর সঙ্গেও অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতা হয়। বন্ধু ও সহকর্মী দেশপাণ্ডে ও কেশবানন্দজীর সহযোগিতায় ওঁর ভবানী মন্দির পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হতে থাকে। একদল কিশোর ছাত্রকে গঙ্গোনাথ আশ্রমে রেখে গড়ে পিঠে মানুষ করে তোলার চেষ্টাও করা হয়। দেশোদ্ধারের পরিকল্পনায় আর একজন যোগী মহাপুরুষের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন অরবিন্দ। তিনি ছিলেন নর্মদার অপর পারের রাজপিপ্‌লা রাজ্যের ছারোডী শহরের যোগীবর সাখরিয়া বাবা। তিনিও অরবিন্দকে খুবই স্নেহ করতেন। অবশ্য ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় অরবিন্দ শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেন নি, তবে সাধু মহাত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ওঁর ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক জীবনের সফলতার ক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়তা হয়েছিল। এই সময়েই মহারাষ্ট্রীয় যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগ হয়।

যোগসাধনা সম্পর্কে লেলের কাছ থেকে নানা মূল্যবান নির্দেশ তিনি প্রাপ্ত হন এবং নিয়মিত ভাবে ধ্যান ও যোগসাধনা সুরু করেন। অরবিন্দের বরোদার জীবনে দেখা যায়, একদিকে যেমন স্বদেশসেবার জন্য পুরোপুরি ভাবে প্রস্তুতি পর্ব চলেছে, অপর দিকে তেমনই জ্ঞানতপস্যার মধ্য দিয়ে ভারতের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের মূলে গিয়ে ভারত-আত্মার মর্ম উপলব্ধি করছেন। আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষকে চিন্তা করা সম্ভব নয়, হৃদয়ঙ্গম করলেন অরবিন্দ। ভারতের মাটি জল স্থল আকাশ বাতাসের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে রয়েছে। ধ্যান ও যোগসাধনার মধ্য দিয়ে এই উপলব্ধি আরও দৃঢ় হোল। রাজনীতির সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের মিলন ঘটালেন। তাইতো বিপ্লবীদের দীক্ষার সময় গ্রহণ করতে বললেন এক হাতে গীতা অপর হাতে তলোয়ার।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই নিবেদিতা বেলুড় মঠের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। অরবিন্দের গুপ্তসমিতিকে ওঁর লাইব্রেরীর সমস্ত বই দিয়ে দিলেন এবং সমিতির যুবকদের পরামর্শদাতা রূপে যোগদান করলেন। অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মে অংশ গ্রহণ করলেন সক্রিয়ভাবে।

এই প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার লিখছেন, 'সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব-কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক-দেড়শ' বই দিয়েছিলেন। কথা ছিল রাজনীতির স্কুল করে, ইতিহাস জীবনী অর্থনীতির বই প্রভৃতি পড়িয়ে, এখানে প্রথমে কতকগুলি পলিটিক্যাল মিশনারী গড়া হবে এবং তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোট বড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া হবে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই রাজনৈতিক ক্লাসের। তারপর জুটলো এসে দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্র নন্দী—এই ধরণের অনেক মানুষ। আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর † মশাইকে এই বিপ্লব-কেন্দ্রটির সহিত পরিচয়

† এই সখারাম গণেশ দেউস্কর ভাল বাংলা জানতেন। বাংলা ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। শিবাজীর জীবনী তার মধ্যে অন্যতম। তাতেই 'স্বরাজ' কথাটির প্রথম উল্লেখ করেন। পরে জাতীয়তাবাদী দল স্বাধীনতা অর্থে 'স্বরাজ' কথাটির ব্যবহার করতে থাকেন। —লেখক

করিয়ে দিলুম। দেশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবার এমন একটা দল আছে শুনে এই শিবাজী-ভক্ত মহারাষ্ট্র-সন্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি তখনই এসে যতীনদার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গেলেন এবং স্কুলের অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।'*

এইভাবে অরবিন্দ ও নিবেদিতার প্রেরণা ও সাহচর্যে অনেকটা আয়র্লণ্ডের সিন্‌ফিন্ আন্দোলনের অনুকরণে বাংলার বিপ্লবী সংঘগুলি সক্রিয় হয়ে উঠলো। ১৯০৪ সাল থেকেই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলার আপামর জনসাধারণ মিলিত হয়ে সভা সমিতির মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলো। দাম্ভিক লর্ড কার্জনও দমলেন না। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই গভর্নমেণ্ট বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব মঞ্জুর করে বিস্তৃতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করলেন। বাঙ্গালী জাতি অকস্মাৎ চমকে উঠলো। ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউনহলে বিলাতী দ্রব্য বর্জন করবার জন্য 'বয়কট' সভা আহ্বান করা হলো। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হলো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই বিপুল সাড়া নিয়ে জেগে উঠলো সমগ্র বাংলা, দেশ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। জাতীয় মহাসভার সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। সেই আহ্বানে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সাড়া দিল, অকস্মাৎ দুর্বার হয়ে উঠলো বাংলার যৌবনশক্তি। বন্যার মত এলো ছুটে, অনড় স্থবিরতার বুকে ভূকম্পনের আলোড়ন করল সৃষ্টি।

অরবিন্দ পেছন থেকে গোপনে যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্তন করবার চেষ্টা করছিলেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই স্বাদেশিকতার বহ্নি জ্বলে উঠলো। অরবিন্দ আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রকাশ্যে বাংলার কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—১৯০৬ সালে। কলকাতা ও সমগ্র বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রদেশের অনুশীলন সমিতি ও আত্মোন্নতি সমিতিগুলিকে একত্রে সংহত করে দেশব্যাপী একটি বিপ্লবধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের ভাবটিকে অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাকে জনসাধারণের

*বোমার কাহিনী, স্বদেশ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮।

মধ্যে সঞ্চারিত করতে থাকলেন—অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হলেন না। গুপ্তসমিতিগুলি স্বাধীনভাবেই কাজ করতে লাগলো।

রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন অরবিন্দের বন্ধু ও গুপ্তক্রিয়ার সহকারী। পরে কংগ্রেসের রাজনীতিতেও যোগ দিয়েছিলেন। বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দান করলেন একলক্ষ টাকা। অরবিন্দ ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন মাত্র দেড়শত টাকা বেতনে। বরোদার ৮০০, টাকার চাকরি ছেড়ে স্থায়ীভাবে চলে এলেন কলকাতায়। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বাংলার তরুণদের সুশিক্ষিত করে তোলবার ব্রত গ্রহণ করলেন, স্বাধীনতার মন্ত্রে তাদের দীক্ষিত করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পরিষদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল।

সেই সময় তুচ্ছ রাজনৈতিক কারণে বহু ছাত্র স্কুল কলেজ থেকে অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হচ্ছিল। ছাত্র নিপীড়নের এই হীন প্রবৃত্তিতে সেদিনকার প্রায় সব সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল কলুষিত। অরবিন্দ বিতাড়িত ছাত্রদের অবাধে তাঁর কলেজে ভর্তি করতে লাগলেন। কিন্তু পরিষদ বললেন, তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাপারের সংযোগ থাকবে না। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে তিনি পীড়িত বোধ করলেন। অবশেষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। যেদিন তিনি জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেছিলেন সেদিন বাংলাদেশ তাঁকে তাঁর স্বার্থত্যাগের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে নব জাতীয়তার গুরুরূপে বরণ করেছিল। এক বৎসর পরে যখন তিনি পদত্যাগ করলেন সেদিনও বাংলাদেশ তাঁকে অভিনন্দিত করলো।

১৯০৭ সালের ২২শে আগস্ট বিদায় সম্বর্ধনা সভায় কলেজের ছাত্রদের তিনি বললেন, 'আশা করেছিলাম এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা জাতির একটা শক্তিকেন্দ্র, নবীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখবো, যাতে ভারত দুঃখের নিশার অবসানে নূতন জীবন গড়তে পারে সেই জয়মহিমা-মণ্ডিত দিনের জন্য যখন ভারত জগৎহিতার্থে কার্য করবে।

* * *

'মহান্ হও দেশমাতার জন্য। ভারতকে মহান্ করবার জন্য। যাতে

ভারত পৃথিবীর জাতিবর্গের মধ্যে উন্নতশিরে দাঁড়াতে পারে। যেমন সেই পুরাকালে ছিল। যখন জগৎ তার নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করতো। এমন কি যারা দরিদ্র ও অখ্যাত থাকবে আমি চাই যে তাদের দারিদ্র্য ও যশোহীনতাও মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত হবে।'

* * *

অরবিন্দের বাণী সেদিন ছাত্রসমাজের মধ্যে বজ্রনির্ঘোষের মত প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার কামনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো ছাত্র ও যুবক সমাজের মধ্যে।

সে যুগে পিতামাতা অভিভাবকদের একমাত্র কামনা ছিল, ছেলেদের জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা ও আদর্শ হবে লেখাপড়া শিখে ইংরেজ সরকারের দপ্তরে দাসত্বের অনুশীলন করবে। সেদিন দেশে ইংরাজের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা করা তো দূরের কথা, কে কতখানি দাসত্বের অভিনয়-পটুতা অর্জন করতে পারে এই ছিল কাম্য। সেই অন্ধতার যুগে দুর্বল মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গালী জাতিকে অরবিন্দ শোনালেন দেশাত্মবোধের মন্ত্র। ছাত্রদের দিলেন মন্ত্রচৈতন্য।

এই সময়েই বিপিন পাল 'বন্দেমাতরম্' ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। কারণ তাঁর পুঁজি ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। তিনি তখন অরবিন্দকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে। অরবিন্দও দেখলেন তাঁর বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টার দেশব্যাপী প্রচারের পক্ষে এই হলো এক উপযুক্ত মাধ্যম। মাত্র ৫০৲ টাকা মাসহারায় তিনি বন্দেমাতরম্ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের মধ্যেকার প্রগতিশীল যুবকদের নিয়ে গোপন সভা করে জাতীয় দলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। আর তার মুখপত্র হলো—'বন্দেমাতরম্ পত্রিকা'। রাজা সুবোধ মল্লিক ও নীরদ মল্লিক হলেন প্রধান অর্থসাহায্য-দাতা। বিপিন পালকে পাঠানো হলো বিভিন্ন জেলাতে পরিভ্রমণ করে এই নূতন দলের নীতি ও কর্মপদ্ধতি প্রচার করতে। অরবিন্দ সম্পাদকীয় স্তম্ভ ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বরাজের দাবী যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী একথা দেশবাসীকে জানাতে লাগলেন। অন্তরের তেজ তাঁর লেখনীর মুখে দুর্নিবার

হয়ে উঠলো। তাঁর স্বাধীনতা লাভের দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত হলো, দেশে নবজাগরণের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। কিন্তু বিরোধ বাধলো তখনকার নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে। সব বাধা অতিক্রম করে তাঁর জাতীয় দল অসীম শক্তিশালী স্বাধীনতার যোদ্ধৃদলরূপে গড়ে উঠলো। নরমপন্থীদের প্রতি দেশবাসীর বিশ্বাস তিরোহিত হলো। নরমপন্থীরা এতদিন দেশবাসীর চোখের সামনে যে কুহেলি সৃষ্টি করেছিলেন অরবিন্দ সে কুহেলি দূর করে স্বরাজের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে অরবিন্দের স্বরাজের বাণী বিঘোষিত হলো। নূতন আদর্শবাদীর দল অরবিন্দের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। নির্জন গৃহকোণে বসে যিনি এতদিন ছাত্রদের মানুষ করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি বিশাল ভারতবর্ষের জাতীয় যজ্ঞের পুরোহিত, মুক্তিসাধক ও নির্ভীক সেনাপতিরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা। তিনি জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁরই কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষে সাফল্যলাভ করেছিল। কিন্তু এ হেন সুরেন্দ্রনাথও অরবিন্দের নেতৃত্বে যে জাতীয় দল গড়ে উঠেছিল তাকে সুনজরে দেখলেন না। তার কারণ সুরেন্দ্রনাথ, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার ফিরোজশাহ মেটা প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে শুধু কতকগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতাই আদায় করে নেবেন এই অভিপ্রায়েই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বরাজের আদর্শে সমগ্র ভারতব্যাপী যে গণ-আন্দোলনের উদ্ভব হবে সেই আন্দোলনকে পরিচালিত করবার ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। ভারতবর্ষ গণ-আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীন হবে এসব কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল শক্তিশালী ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রামই চলতে পারে না—শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পেলেই ভারতের দুঃখের অবসান হবে।

অপরদিকে অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকাতে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন প্রতিরোধের উপায় এবং বিপ্লববাদের তত্ত্বাদি সম্বন্ধে। নরমপন্থীদের যে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের প্রতি অন্ধবিশ্বাস তারও জীবন্ত ছবি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন। বিদেশী গভর্নমেণ্ট ভারতের যে কত

উপকার করছে, তাদের আইন আদালত যে কত ন্যায়পরায়ণ, তাদের স্কুল কলেজগুলি যে কত ভাল শিক্ষা দিচ্ছে, যুক্তির মাধ্যমে ওজস্বিনী ভাষায় জনসাধারণকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। এবং পরাধীনতার জন্য দেশের মানুষ যে হীনবীর্য হয়ে পড়ছে তাও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন,—'আমরা স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করতে চাই এই কারণে যে প্রথমতঃ জাতীয় জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দরকার। দ্বিতীয়তঃ, জাতির উন্নতির পক্ষে তার মুক্তি অপরিহার্য। তৃতীয়তঃ, এর পরে মানব জাতির যে মহা উন্নতির যুগ আসছে তা কোনো পার্থিব সমৃদ্ধির ব্যাপার নয়, তা হলো আধ্যাত্মিক নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নতির ব্যাপার, যার পথপ্রদর্শক হবে মুক্ত এশিয়া ও তার মধ্যে বিশেষতঃ মুক্ত ভারত, এবং জগতের সেরূপ মঙ্গলের জন্যই আমাদের মুক্তিপ্রয়াস এত জরুরী। ভারতকে বাঁচতে হলে এবং ভালো ভাবে সুখে বেঁচে থাকতে হলে তার পক্ষে স্বরাজ নিশ্চয়ই চাই। জগতের জন্যই তাকে বাঁচতে হবে—দাসরূপে নয়, স্বাধীন দেশ রূপে। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যই।'

* * *

'হে ভারতবাসিগণ, ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ভারতের সাধনা, তার তপস্যা জ্ঞান শক্তি এর দ্বারাই আমরা মুক্ত ও মহৎ হতে পারি।'

* * *

'মুক্ত ও সাম্মিলিত ভারতের ভাবমূর্তি তার পূর্ণ মহিমাতে জন্মগ্রহণ করেছে ঋষিদের পুণ্যভূমিতে এবং তা এখনই পূর্ণ আকৃতি পেয়েছে। জগতের বিশেষ প্রয়োজনে যে আসন্ন মহাসভ্যতার অধ্যাত্ম তেজ সঞ্চিত হচ্ছে, তা ওরই পশ্চাতে তলে তলে জমে উঠছে।'

* * *

'কোনো জাতির পক্ষেই ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে দরকষাকষি করে যত সস্তায় সম্ভব স্বাধীনতা কিনে নেবার চেষ্টা করতে যাওয়া চলে না। এখন যত শীঘ্র সম্ভব উন্নয়ন শক্তি ও অপরের দমন শক্তির মধ্যে সংগ্রাম শুরু করে দিয়ে ভারতের ভাগ্য- ফিরিয়ে আনা যায় ততই তা ভারতের পক্ষে ও সারা জগতের

পক্ষে মঙ্গলজনক। যত বিলম্ব করা যাবে ততই আমাদের শক্তিক্ষয় হবে এবং শত্রুকে সুযোগ দেওয়া হবে। এখন এমন একদল মানুষ চাই যারা দেশের জন্য সবকিছু ছাড়তে প্রস্তুত, যাদের একমাত্র চিন্তা ও কাজ হবে যখন যেমন সময় ও সুযোগ হবে তাই বুঝে যে কোনো উপায়ে আন্দোলনকে বাড়িয়ে তোলা। এমন একটি দলকে যদি একত্রিত করা যায় তবেই কেবল প্রস্তুতির কাজের পরিবর্তে আসল কাজের কাজ সম্ভব হতে পারে। দেশের মুক্তি আনা কেবল আমাদের অবসর মুহূর্তের উদ্বৃত্ত শক্তিটুকু দিয়ে বা আপন জীবনের স্বার্থকে বজায় রেখে বাকী যেটুকু পড়ে থাকে সেইটুকুর দ্বারা সাধ্য হতে পারে না।••এখন এক অভাবনীয় রকমের বিরাট বিপ্লবের দিন এসে গেছে। তাদের অস্ত্রগুলিও হবে তেমনি বিপুল আস্পৃহাপূর্ণ, তাদের আত্ম-বলিদানও হবে তেমনি হিসাব-বহির্ভূত। দিতে হবে এমন জ্বলন্ত যজ্ঞাহুতি যার তুলনায় আগেকার সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হয়ে যাবে ছায়ার মতো নিষ্প্রভ, আর সে যজ্ঞের হোতা হবো ও আহুতি হবো আমরা নিজেরাই। আমাদের জীবন, আমাদের আশা-ভরসা, আমাদের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যা কিছু ভগবানের জিনিস নয় কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জিনিস, যা কিছুকে আমরা দেশের সেবাতে না লাগিয়ে আমাদের নিজেদের স্বার্থে লাগাই, সমস্তকেই সেই যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে…… ।'

সাংবাদিকতার ইতিহাসের দিক থেকেও বন্দেমাতরম্ পত্রিকার স্থান অনেক উচ্চে। অনেক গৌরবমণ্ডিত। এই প্রসঙ্গে স্টেট্স্ম্যান মন্তব্য করলেন, 'কাগজটির ছত্রে ছত্রে সুস্পষ্ট রাজদ্রোহের ইঙ্গিত ফুটে বেরুচ্ছে, কিন্তু এমন কৌশল সহকারে তা লেখা যে ওর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত অভিযোগ করা যায় না।'

অরবিন্দ ও লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে জাতীয় দল ভারতের যুব সম্প্রদায়ের চিত্ত জয় করে নিল। অরবিন্দের লেখার প্রতিটি অক্ষর তরুণদের অন্তরে জ্বেলে দিল প্রদীপ। কংগ্রেসের নরমপন্থী দল যে নিবেদন আবেদনের নীতি অবলম্বন করেছে, সে নীতি যে জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, সে নীতি যে জাতির মহত্তর কল্যাণ সাধনের পরিপন্থী এই কথা দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন। জাতিকে আত্মশক্তিতে নির্ভর করবার শক্তির পথনির্দেশ

করলেন। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত তাঁর বাণী জাতিকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করলো। বন্দেমাতরমের পূর্বে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। জাতি শুধু জাগলো না, সংগ্রামের জন্যও প্রস্তুত হলো।

ইতিমধ্যে বারীন্দ্রকুমার ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন দত্তের চেষ্টায় 'যুগান্তর' পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে। তাতে প্রকাশ্য ভাবেই ব্রিটিশ শাসনকে অস্বীকার করে বিদ্রোহ প্রচার করা হতে থাকলো। গেরিলা যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধও লেখা হতে লাগলো। প্রথম কয়েকটি সংখ্যাতে অরবিন্দ নিজেই প্রবন্ধ লিখে সাহায্য করতে লাগলেন। সহকারী সম্পাদক ছিলেন ভূপেন দত্ত। পুলিশের তল্লাসীতে তিনি নিজেই সম্পাদক বলে পরিচয় দিয়ে শাসনদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

নরমপন্থীদের বজ্রমুষ্টি থেকে কংগ্রেসকে বাঁচাবার জন্য বাংলার জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন অরবিন্দ স্বয়ং। তিনি এর ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় ও প্রসারিত করলেন। শুরু করলেন স্বরাজ আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন। শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের যথেচ্ছাচারের বিরোধিতা করার জন্য তেজস্বী ভাষায় লিখতে লাগলেন। দেশের মানুষও বিদেশী দ্রব্য বর্জনে বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। স্বদেশীয় মনোভাবটা অতি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলো জনমানসের চিত্তে। আর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্য দিয়ে একটা উদ্দীপনার তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগলো। অরবিন্দের চিন্তা নিয়ে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তখন লিখতেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিজয় চ্যাটার্জি আর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সুরাটে জাতীয় দলের সঙ্গে নরমপন্থীদের সংঘর্ষের পর জাতীয় দলের সভায় সভাপতি হলেন অরবিন্দ স্বয়ং। সুরাট থেকে কলকাতা ফেরবার পথে স্থানে স্থানে ভাষণ দিলেন জ্বালাময়ী ভাষায়। জাতীয় দলের আদর্শই যে দেশের নব-জাগরণের কারণ এই সব বক্তৃতায় তাই প্রতিফলিত হলো। বাংলার আকাশ-বাতাস বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ইংরেজ সরকার অরবিন্দকে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে স্থির করলো এবং 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য ১৯০৭ সালের ২৭শে জুন তাঁকে কারারুদ্ধ

করা হলো। বাংলাদেশের আত্মত্যাগের অধ্যায় এমনি করেই শুরু হোল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' শেষ পর্যন্ত সরকার প্রমাণ করতে পারলেন না অরবিন্দই পত্রিকার সম্পাদক। সুতরাং মুক্তিলাভ করলেন।*

অকস্মাৎ সমগ্র বঙ্গভূমি প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে আগুন ছড়ানোর সন্ধিক্ষণে এসে পড়লো। আর নয়—মিনতির পালা শেষ হয়েছে। সময় দেওয়া হয়েছে অনেক। বোমা আগুন আর বিপ্লবের বহ্নিতে বাংলার নদনদীর বুকে এলো জোয়ার। অরবিন্দ সেই আগুনের কুণ্ডলীর মধ্যে পড়লেন। আর তিনি এই অগ্নিযজ্ঞের হোতা বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন ইংরাজ সরকারের চোখে। অরবিন্দ যদিও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রবক্তা, তিনি সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন জাতির বীর্যকে প্রাণবন্ত করতে। কিন্তু সময় হবার আগেই তরুণরা হঠাৎ তাঁর অজান্তে আত্মপ্রকাশ করল রুদ্ররোষে। দমন নীতির ফলে কোণঠাসা হয়ে হয়তো তারা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েই এই আচম্বিত আত্মপ্রকাশে বাধ্য হয়ে পড়ে। আর গুপ্তসমিতি ও অনুশীলন দলগুলিও স্বস্বপ্রধান থাকায় সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। অপর দিকে অরবিন্দই পুলিসের চোখে গুপ্তসমিতিগুলির একচ্ছত্র নেতা বলে প্রতিভাত হলেন।

এই সময়ে অরবিন্দ 'নবশক্তি' নামে বাংলা দৈনিক পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। স্কট্ লেনের বাসা পরিত্যাগ করে স্ত্রী ও ভগ্নীকে নিয়ে পত্রিকা অফিসের বাড়ীতে গ্রে স্ট্রীটে উঠে এলেন। তখন ১৯০৮ সাল। এখানে এসে কাজ শুরু করার পূর্বেই একদিন ভোরের সময় তিনি যখন নিদ্রিত ছিলেন, একদল পুলিশ রিভলবার হাতে নিয়ে নাটকীয় ভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ তাঁর 'কারাকাহিনী' গ্রন্থে লিখছেন,—১৯০৮ সনের শুক্রবার ১লা মে আমি 'বন্দেমাতরম্' অফিসে বসিয়া ছিলাম, তখন শ্রীযুত

*সে যুগে কাগজে শুধু মুদ্রাকরের নাম ছাপা হোত। সম্পাদকের নাম গোপন রাখা হোত। মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হোল। আর বিপিন পালকেও সাক্ষ্য দেবার জন্য তলব করা হয়েছিল। তিনিও হলপ না করায় আদালতের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ছয় মাস জেল খাটলেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুটি য়ুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিনের 'এম্পায়ার' কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিস কমিশনার বলিয়াছেন, আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে আমি এই সন্দেহের মূল লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রয়াসী যুবক দলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা।

* * *

শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া ছিলাম, ভোরে প্রায় ৫ টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্তি আর কয়েকজন ইন্স্পেক্টর, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল। যেন বন্দুক-কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন,—অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি? আমি বলিলাম, আমিই অরবিন্দ ঘোষ। অমনি একজন পুলিসকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন। ....তাহার পরই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল।...... ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি নাকি বি-এ পাশ করিয়াছেন? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়া ছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে? আমি বলিলাম, আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি। সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন,—তবে কি আপনি ধনীলোক হইবেন বলিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন।

দেশ-হিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্যব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।...... তারপর শুরু হয় খানাতল্লাসী। খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য

ঘটনা ঘটে নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয় এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক, এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়।'

* * *

ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী দুই তরুণ বিপ্লবী মজঃফরপুরে এসেছেন কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে। কিন্তু ভুলক্রমে বোমা নিক্ষেপ করলেন উকিল কেনেডি সাহেবের পত্নী ও কন্যার উপর। দুজনেই নিহত হলেন। প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ে রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। ক্ষুদিরামের বিচারে ফাঁসির হুকুম হোল। কলকাতায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। মুরারিপুকুর বাগানে বোমার কারখানা ধরা পড়লো। সেই সঙ্গে বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, প্রভৃতি ছাব্বিশ জন বিপ্লবী কারারুদ্ধ হলেন। অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ হোল তিনি শুধু জাতীয় দলের নেতৃত্বই করেন না, গোপনে বিপ্লববাদীদেরও সহায়তা করেন। দীর্ঘ একবছর ধরে তাঁর বিচার চললো। ১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি কারাগারে প্রবেশ করেন আর ১৯০৯ সালের মে মাসে মুক্তিলাভ করলেন। অরবিন্দ ও বিপ্লবীদের কারারুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ভারত সাম্রাজ্য কেঁপে উঠলো। ক্ষীণ বাঙ্গালী দেশের জন্য মৃত্যুপণের যে আদর্শ রাখলো তা অনন্য। তার মূলে ছিল আধ্যাত্মিকতা।

সরকার পক্ষ খুব তোড় জোড় করে বিচার শুরু করলো। সরকার পক্ষের কৌঁশুলি হলেন নর্টন সাহেব। আর বিচারক হলেন অরবিন্দের কলেজের বন্ধু বীচক্রফট।

অরবিন্দ-ভগিনী সরোজিনী তাঁর পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর টাকা নিঃশেষ হয়ে গেলো। ঠিক এই দুঃসময়ে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ এগিয়ে এলেন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য। তখনও তিনি দেশবন্ধু হন নি। এক বছর ধরে নিদারুণ পরিশ্রম করে,

পারিশ্রমিক হিসাবে একটি পয়সাও না নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে মামলা পরিচালনা করলেন এবং জয়লাভ করেন। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে আলিপুর বোমার মামলা বিখ্যাত হয়ে রইল। আর চিত্তরঞ্জন এই মহৎ কাজের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতে মহত্তর এক ত্যাগের পরিচয় দিলেন। শুধু ত্যাগ ও মহত্বই তাঁর মধ্যে বিচারকালীন সময়ে ফুটে ওঠে নি, অসাধারণ বাগ্মিতা ও আইনজ্ঞানের গভীরতাও প্রকাশ পেয়েছিল। অরবিন্দ যে নির্দোষ এই তথ্য বোঝাতে তিনি এমন সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা দিলেন যে তার দ্বারা অরবিন্দর ভবিষ্যৎ যেন নির্দিষ্ট হয়ে গেল সকলের মুগ্ধ চোখের সামনে। সুন্দর ইংরাজী ও কবিতার মতো ছন্দোময় ছিল সেই বাণী :

*'Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across the distant seas and lands.'

—'এই বিতর্ক, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হবার বহুকাল পরে, এঁর অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল পরে, মানব সমাজ এঁকে স্বদেশপ্রেমের মহাকবি, জাতীয়তার প্রবর্তক ও মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে। এঁর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এঁর বাণী শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সাগরপারের দূরদূরান্তে ধ্বনিত হতে থাকবে।'

আলিপুরের নির্জন কারাবাসই অরবিন্দের অধ্যাত্মজীবনের রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করে তুললো। জ্ঞাননিষ্ঠ সাধনার জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মাঝে মাঝে যে জ্যোতির ঝলক দেখা দিত এবারে তা জ্যোতির্ময় রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করলো। দিব্য চেতনায় অরবিন্দ হলেন উদ্বুদ্ধ। অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ, সাংবাদিক অরবিন্দ ঘোষ, বাংলার জাতীয়দলের

*শ্রীঅরবিন্দ জীবন ও যোগ : প্রমোদকুমার সেন।

নেতা বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ধীরে ধীরে শ্রীঅরবিন্দে ঋষি অরবিন্দে রূপান্তরিত হতে লাগলেন। আলিপুর জেলের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অরবিন্দ নিজেই বলেছেন। অরবিন্দের ভাষায়,—'আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপূর্ব প্রেম শিক্ষা পাইলাম। এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যেও আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল এবং পশুপক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেম-স্রোত প্রায় বহিত না। মনে আছে রবিবাবুর একটি কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্য বালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা দোষ দেখিয়াছিলাম। এখন পড়িলে তাহা অন্য চক্ষে দেখিতাম। আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্বপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু পাখী পিপীলিকা পর্যন্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে।.........কারাবাসের পূর্বে আমার সকালে এক ঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্রপথধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত ও একলক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনও মতে দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত।

* * *

কথা আছে, যে নির্জনতা সহ্য করিতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু। এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না। এখন বুঝিলাম সত্যসত্যই যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়। ইতালীর রাজা-হত্যাকারী ব্রেশীর ভীষণ পরিণাম মনে পড়িল। তাঁহার নিষ্ঠুর বিচারকগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া সপ্ত-বৎসরের নির্জন কারাবাসে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। এক বৎসর অতিবাহিত না হইতেই ব্রেশী উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবু এতদিন সহ্য করিয়াছিলেন ত। আমার মনের দৃঢ়তা কি এতই কম? তখন বুঝিতে পারি

নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন। ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন।

* * *

এইরূপভাবে মনের নিশ্চেষ্টতায় পীড়িত হইয়া কয়েকদিন কষ্টে কালযাপন করিলাম। একদিন অপরাহ্নে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল। হঠাৎ সেই চিন্তা-সকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পর নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত বা এক মুহূর্তও ভ্রষ্ট হয় নাই। বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তখন আমি উন্মত্ততা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ প্রসন্ন ও পরমসুখী হইল যে পূর্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এক দিনেই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল।

* * *

আমি শক্তি পাইলাম। মানুষের নিষ্ঠুরতায় অত্যাচারপীড়িত ব্যক্তিদের উপর দয়া ও সহানুভূতি বাড়িল এবং প্রার্থনার অসাধারণ শক্তি ও সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। **কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, সেই লোহার গারদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। মনুষ্য গাভী পিপীলিকা বিহঙ্গ চলিতেছে উড়িতেছে গাহিতেছে কথা বলিতেছে অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া; ভিতরে এক মহান নির্মল আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন এবং সেই মাধুর্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির

করিতেছেন। সর্বদা বোধ হইতে লাগিল যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এই ভাব বিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নির্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সর্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে থাকিল। প্রেমের সহিত দয়া করুণা অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃপ্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং নির্মল শান্তিভাব গভীর হইল।'...

ধীরে ধীরে অরবিন্দের অধ্যাত্মসত্তায় আসে এক বিরাট পরিবর্তন। কারাগারের চতুর্দিকের পরিবেশ এবং ভিতরকার সমস্ত কিছু যেন জীবন্ত ও চৈতন্যময় হয়ে ওঠে।

তাইতো দেখা যায় জেল থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ ঘোষ ভিন্ন এক ভাবমূর্তি নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন জনসাধারণের সামনে। প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া-অভিভাষণে তিনি তাঁর কারাকক্ষের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে বললেন,—'...তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয় নি, পরন্তু অনুভূতি ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়ে কী করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাজ করতে যারা আগ্রহী তাদের দিয়ে যা করাতে চান সেই জিনিসকে উপলব্ধি করা। অর্থাৎ আত্মইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে কেবল তাঁর হাতের সম্পূর্ণ বাধ্য যন্ত্র মাত্র হয়ে থাকতে হবে। তখন আমি বুঝলাম হিন্দুধর্মের অর্থ কি। এখানে শুধু বিশ্বাসের কথা নয়, জীবনের মধ্যে খাঁটি উপলব্ধির কথা।'......

...'যখন আমি পাদচারণা করতাম সেই সময় তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করলো। যে জেল আমাকে মানব জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে, সেইদিকে আমি তাকালাম। দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেয়ালগুলির মধ্যে বন্দী নেই, আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব।'.......

মানব সভ্যতার প্রথম উষাগমে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ঋষিরা সগৌরবে উদাত্ত কণ্ঠে একদিন ঘোষণা করেছিলেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্মেদং সর্বম্।

তত্ত্বমসি। অহং ব্রহ্মাস্মি। শ্রীঅরবিন্দ নূতন ভাবে নূতন ভাষায় সেই মহাসত্যটিকে, সেই পূর্ণসত্যটিকেই প্রকাশ করে প্রমাণ করে এক নূতন দিব্য-জীবনের সন্ধান দিলেন।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাংলার মানুষের কাছ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পেলেন প্রবল অভিনন্দন। তখন অবশ্য বাংলার রাজনৈতিক আকাশ ছিল কুয়াশা-লিপ্ত। সরকার দমননীতি দ্বারা যুবশক্তির মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে। তিলক জেলে। বিপিন পাল ও লালা লজপৎ রায় বিদেশে। অন্যান্য নেতারাও কেউ জেলে কেউ বা সরে দাঁড়িয়েছেন সামনে থেকে। বন্দেমাতরম্, যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি কোন কাগজই নেই। কংগ্রেসের স্থান কেন্দ্রীয় নরমপন্থী দল দখল করে নিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ এবারে সমস্ত রকম সংগ্রাম ত্যাগ করে জাতীয় সংগঠনের কাজে প্রেরণা দিতে লাগলেন। ইংরাজীতে প্রকাশ করলেন 'কর্মযোগিন্' আর বাংলায় 'ধর্ম'—সাপ্তাহিক দুই পত্রিকা। 'কর্মযোগিন্'-এ লিখলেন,—'আজ ভারতে জগতের সকলের চোখের সামনে এক নবজাতি গড়ে উঠছে। এত দ্রুত ও সুস্পষ্ট যে সেই গঠন সকলের কাছেই লক্ষণীয়···। সারা জগতেরই পক্ষে এখন দরকার হয়েছে, ভারতের মুক্তিলাভ ও তার মহত্ত্বের ঐক্যের সম্যক বিকাশ। এই বিশ্বাসকে ধরেই এই 'কর্মযোগিন্' তার হাত লাগিয়ে কাজ করে যাবে। যতই কেন কঠিন বাধা ও অলঙ্ঘ্য বিপত্তি এসে উপস্থিত হোক তাতে সে নিরুৎসাহ হবে না। আমরা এটা বিশ্বাস করি ভগবান রয়েছেন আমাদের সহায়। আর সেই বিশ্বাসেই আমরা জয়ী হতে পারবো। আমাদের সেই মানবপ্রেম দেশপ্রেম আমাদের হৃদয়কে নির্মল করে এই সংগ্রামে আমাদের সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে।'

'নবোত্থিত তরুণ যুবকদের আমরা বলি,—ভারতের কাজ করো। জগতের কাজ করো। যদি দেখ বস্তুতন্ত্রের দৃষ্টিতে, তাহলে ঐরূপ আদর্শ তোমরা রক্ষা করতে পারবে না। বাস্তবের দিক থেকে তোমরা কিছুই নও, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে সব কিছু।······আগে তাহলে হয়ে যাও ভারতীয়। পূর্বপুরুষদের সম্পদকে উদ্ধার করো। আর্য চিন্তা, আর্য আচরণ, আর্য চরিত্র, আর্য জীবনকে ফিরিয়ে আনো। বেদান্তকে গীতাকে

যোগকে পুনরুদ্ধার করো কেবল বুদ্ধি বা ভাবের দিক দিয়ে নয়। আপন জীবনের মধ্যে। জীবনের মধ্যে তা গ্রহণ করলে তখন তোমরা হয়ে দাঁড়াবে মহৎ ও তেজস্বী। শক্তিমান ও অজেয়। সর্বভয়মুক্ত। জীবন বা মৃত্যু কোনোটাকেই আর ভয় করবে না।'

* * *

১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বরে শ্রীঅরবিন্দ হুগলীতে রাজনীতি সম্মেলনে যোগদান করলেন। নবমপন্থী নেতারা ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন অরবিন্দ যাতে এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হতে না পারেন। কিন্তু অরবিন্দের দৃঢ়তার কাছে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হলো। জনতা কর্তৃক ধিক্কৃত হলেন কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ। অরবিন্দ নরমপন্থীদের সমস্ত কর্মপ্রণালীর বিরোধিতা করে বয়কট আন্দোলনকে প্রচার করলেন। এই সময় 'ধর্ম' পত্রিকায় লিখলেন,—'এই অবস্থায় যাঁহারা দেশের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা ভয়ের পরিচয় রাখেন না, ভগবান ও বঙ্গজননী ভিন্ন কাহাকেও জানেন না ও মানেন না, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে।'

১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনেও যোগদান করেন। এখানেও নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে কোনো আপোষ হোল না। ইতিমধ্যে আপোষ রফার জন্য এক বৈঠকও বসেছিল। শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে কংগ্রেসের সংবিধান বদলানো হোক, যাতে জাতীয়দল স্বাধীনভাবে নিজেরাই তাদের প্রতিনিধি বেছে সর্বভারতীয় সম্মেলনে পাঠাতে পারে। এতেই বৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ তখন চেষ্টা শুরু করলেন কেমন করে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয়তার আন্দোলন পুনরায় উজ্জীবিত করে তোলা যায়। আনি বেসান্তের 'হোমরুল' আন্দোলনের দিকে ঝুঁকলেন। তীব্রভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার কথাও চিন্তা করছিলেন। তখনকার সরকার যে শাসন-সংস্কার করতে চেয়েছিল তার বিরোধিতা করে তেজস্বী ভাষায় বললেন, 'আপোষ চলবে না।' 'কর্মযোগিন্' পত্রিকাতে দেশের লোকের কাছে খোলা চিঠিতে লিখলেন, 'ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত সহযোগিতা করো না।'

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকারও শ্রীঅরবিন্দকে সরিয়ে দেবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে

উঠলো। কারণ তাদের দমননীতির বিরুদ্ধে তিনিই ছিলেন বাধাস্বরূপ। ভগিনী নিবেদিতা একথা জানতে পারলেন এবং শ্রীঅরবিন্দকে পরামর্শ দিলেন ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে যেতে। এদের এলাকার বাইরে থেকে কাজ করতে। শ্রীঅরবিন্দ তখন নিজের স্বাক্ষর দিয়ে কর্মযোগিন্ পত্রিকাতে দেশের জন্য তাঁর 'শেষ উইল' নামক একটি প্রবন্ধ লিখলেন, যার ফলে অন্তরীণে পাঠাবার কোনো প্রশ্নই আর উঠবে না বলে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনবার জন্য সচেষ্ট রইলো। হঠাৎ একদিন খবর পেলেন কর্মযোগিন্ পত্রিকার অফিস তল্লাসী করা হবে এবং তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হবে। তিনি যখন ভাবছিলেন কি করা যায়, তখন অন্তর থেকেই নির্দেশ পেলেন 'চন্দননগরে যাও'। এর আগেও একবার এই ধরণের আদেশ শুনেছেন কিন্তু গ্রাহ্য করেন নি। এবারের আদেশে তাঁর চিত্ত সাড়া দিয়ে উঠলো। অল্প সময়ের মধ্যেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক সন্ধ্যায় গঙ্গা থেকে একটি নৌকায় করে গোপনে চন্দননগরের পথে যাত্রা করলেন। পথে বাগবাজারে এসে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎও করেছিলেন। এ যেন যোগিবর সমাজ সংসার রাজনৈতিক কর্ম এক নিমেষে সব কিছু পরিত্যাগ করে চির সন্ন্যাসের পথে করলেন যাত্রা। অকস্মাৎ বহির্মুখী কর্ম ত্যাগ করে চিরতরে হলেন অন্তর্মুখী।

*চন্দননগরে এসে আশ্রয় নিলেন বিপ্লবী মতিলাল রায়ের গৃহে। রইলেন দেড়মাস। যোগাসীন থাকতেন সর্বদা।

*শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা ত্যাগের ঘটনা সম্বন্ধে চারিটি বিভিন্ন মত আছে।

১। শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' অফিসের দেওয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়ী দিয়ে বের হয়ে যান। কিন্তু অরবিন্দের সহযাত্রী বলেন তাঁরা সদর দরজা দিয়ে বের হয়েছিলেন। [প্রবাসী, ১৩৫২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ]

২। অরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার নিকটই তাঁর আসন্ন গ্রেপ্তারের কথা প্রথম শুনেছিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বাগবাজারের মঠে গিয়ে পরমহংসদেবের সহধর্মিণী শ্রীমাতা ঠাকুরাণীকে প্রণাম করেন এবং গণেন মহারাজ ও ভগিনী নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে বাগবাজার ঘাটে পৌঁছাইয়া দেন। ডঃ রমেশ মজুমদার এ কাহিনীকে সত্য বলে স্বীকার করেন না।

চন্দননগরে থাকাকালীন আবার অন্তরের আদেশ হলো পণ্ডিচেরী যাওয়ার। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত আদেশকে তিনি ভগবানের আদেশ বলে মেনে নিয়ে যাত্রা করলেন পণ্ডিচেরীর পথে। ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল। চারজন সঙ্গীসহ নিঃস্ব অবস্থায় শ্রীনিবাসচারী নামে এক দেশপ্রেমিকের আশ্রয়ে এসে উঠলেন। এই চারজন সঙ্গী হলেন নলিনী গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, বিজয় নাগ ও সৌরীন্দ্র বসু। রেলপথে না গিয়ে গোপনতার জন্য ফরাসী জাহাজ 'ডুপ্লে'র আশ্রয় নেন। সহকর্মীদের মধ্যে বিজয় নাগ সমুদ্রযাত্রার সাথী হন। সুরেশ চক্রবর্তী আগেই এসেছিলেন থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত করবার জন্য। নলিনী গুপ্ত পরে এসে মিলিত হলেন। কিছুদিন বাদে শ্রীঅরবিন্দের ছায়াতলে সর্বত্যাগী কয়েকজন নবীন যুবক এসেও সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে লাগলেন।

নিবেদিতাই অরবিন্দের ফেলে যাওয়া 'কর্মযোগিন্' পত্রিকা দেখাশুনা করছিলেন। অরবিন্দের বাংলা ছেড়ে যাওয়ার পরই 'কর্মযোগিনে' একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার জন্য, রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও বের হোল। আদালতে অবশ্য এ অভিযোগ টিকলো না। পণ্ডিচেরীতে এসে ফরাসী সরকারের কাছে তিনি স্বীয় পরিচয় ব্যক্ত করলেন। নিবেদিতাও কর্মযোগিন্ মারফৎ দেশবাসীকে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীর ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। আত্মার আদেশে শ্রীঅরবিন্দ ভগবৎ-দত্ত ভার বহনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' কার্যালয় হতে সোজা আহিরীটোলার ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও বীরেন্দ্র ঘোষ।

৩। শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী রামচন্দ্র মজুমদার (যিনি প্রথমে গ্রেফতারের সংবাদ দেন) লিখেছেন যে অরবিন্দ তাঁকে নিবেদিতার কাছে গ্রেপ্তারের সংবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতা শুনে বললেন, 'আপনার মনিবকে আত্ম-গোপন করতে বলুন।' অরবিন্দ বললেন, 'ঠিক আছে, ব্যবস্থা কর।'

৪। শ্রীনলিনী গুপ্ত লিখেছেন যে অরবিন্দ নিজেই বলেছেন যে অফিস থানাতল্লাসী ও তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ শোনামাত্রই তিনি হঠাৎ 'আদেশ' পেলেন 'চন্দননগর চলে যাও'। তিনি কাজও করলেন সেই অনুসারে।

[শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন—ডঃ রমেশ মজুমদার]

রাজনীতি থেকে সরে এলেন একেবারেই নূতন এক জীবনের অধ্যায়ে। যে অধ্যায় দিব্য মানুষের। তারই সূচনা হয়ে গেল। সহযোগীদের নিয়ে নূতন এক পরিমণ্ডল রচনায় ব্রতী হলেন। শ্রীঅরবিন্দ হলেন সকলের গুরু। অধ্যয়ন, লেখা আর যোগসাধনার মধ্যেই ডুবে রইলেন। অনুকূল স্থান পেয়ে নীরব সাধনা স্বতঃস্ফূর্ততায় শুরু হয়ে গেল। যে সাধনা প্রবাহিত জীবন চেতনা থেকে বহু ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতার পরিচয়ে আকীর্ণ। অপরিচিত বান্ধবহীন দেশে দারুণ অভাবেও অবিচল রইলেন সিদ্ধির পথে। পণ্ডিচেরীর সাগরপারে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হলো শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রম। অগ্নিযুগের বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে এসে হলেন যোগসিদ্ধ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। বিপ্লবীর জীবনে হলো এক বিস্ময়কর রূপান্তর।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস থেকেও বারংবার সক্রিয় হয়ে উঠবার জন্য ডাক আসতে লাগলো। বহু মেতা পণ্ডিচেরীতে এলেন তাঁকে তাঁর স্বষ্ট রাজনীতি-জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কংগ্রেস তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের সম্মান দিল। কিন্তু মহিমময় হিমালয়ের মতই মৌন নিয়ে তিনি রইলেন নির্বিকার। বাইরের কোন ঢেউই সেই দেহপ্রান্তের গভীরে আলোড়ন তুলতে সমর্থ হোল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও তাঁকে রাজনীতিক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন।

১৯১৪ সালের ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে প্রকাশিত হলো 'আর্য' পত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিপুল জ্ঞানরাশিকে জগতের মানুষের কাছে উজাড় করে ঢেলে দিলেন। সমগ্র বিশ্বে তখন এক মহাদুর্যোগের ঘনঘটা। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে ঘোরতর রূপ নিয়ে। এই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালে শ্রীঅরবিন্দ মানুষের সামনে ভাবী এক বিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন। মানুষকে পাশবিকতার হাত থেকে মুক্ত হতে হলে দিব্যজীবনের দীক্ষা নিতে হবে। মানব ইতিহাসের বিবর্তনের ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে দিব্যজীবনের আদর্শকে তুলে ধরলেন। ধর্ম দর্শন রাজনীতি সমাজনীতি কাব্য শিল্প সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্র তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে পল্লবিত হয়ে উঠলো। যোগ-সমন্বয়ের নানাবিধ প্রণালী মানুষের ভবিষ্যৎ এবং যে মহা মিলন আসন্ন তার আদর্শ। মানব

সমাজের বিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে সাহিত্য ও দর্শনের উপর নূতন ধারণা। আর্য পত্রিকা যেন শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়ের দৃশ্যপট। শুধু আধ্যাত্মিকতাই নয়, যোগজীবনের প্রচারও নয়, সমগ্র মানুষের ইতিহাসকে উপলব্ধি করবার একখানি দর্পণ। বিচিত্র সব প্রবন্ধের মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অন্তর্জগতের আলোকমালাকে বাইরে এনে যেন দেখতে লাগলেন। একটি নূতন আদর্শের নূতন দর্শনের জন্ম দিয়ে তিনি অনেক দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত উদ্ভাসিত করে তুলতে লাগলেন। কিন্তু তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই পরম বাণী উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আর এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ফরাসী ডিপ্লোম্যাট ও লেখক মঁসিয়ে পল রিসার ও মিসেস মীরা রিসারের পণ্ডিচেরী আশ্রমে আগমন। জ্ঞানী পুরুষ শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে অবস্থানের সংবাদ পেয়ে স্বামী-স্ত্রী শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে এলেন। প্রথম দর্শনেই মীরা রিসার মুগ্ধ, বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। আত্মসমর্পণ করলেন শ্রীঅরবিন্দের চরণে। আর পণ্ডিতপ্রবর পল রিসার অপরিসীম শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করলেন। পরে মন্তব্য করেছিলেন, 'শ্রীঅরবিন্দ এই যুগের পরম পুরুষ। নূতন জগতের বিবর্তন সাধনের জন্যই এ জগতে এসেছেন।'*

'আর্য' পত্রিকার ফরাসী সংস্করণও প্রকাশিত হতে লাগলো স্বামী-স্ত্রীর চেষ্টায়। সে সময় ফরাসী সংস্করণের প্রচ্ছদপটে লেখা থাকতো Editor Aurobindo Ghosh—Paul and Mira Richard. তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক কারণে তাঁদের দেশে ফিরে যেতে হলো। যুদ্ধের সমাপ্তিতে ১৯২০ সালে আবার উভয়েই এলেন পণ্ডিচেরীতে। আশ্রমবাসী হলেন উভয়েই। পরে পল রিসার অবশ্য দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু মীরা রিসার আর প্রত্যাবর্তন করলেন না। আশ্রম-জননীর আসনে অধিষ্ঠাতা হয়ে শ্রীঅরবিন্দের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলেন। মীরা রিসার হলেন শ্রীমা। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে মহাযোগীর পদপ্রান্তে হলেন উপনীত।

---

*শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্ম : অনুবাদ—পশুপতি ভট্টাচার্য।

শ্রীমা আশ্রম পরিচালনার ভার গ্রহণ করার পর থেকে শ্রীঅরবিন্দ বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক দিলেন ছিন্ন করে। বছরে মাত্র তিন দিন বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করা স্থির করলেন।

ধীরে ধীরে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার যশঃসৌরভ ভারতবর্ষ ছাপিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ অরবিন্দ আশ্রমে এসে সমবেত হতে লাগলো শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনমানসে। ছোট্ট আশ্রম বিশাল মহীরুহে পরিণত হলো। শ্রীমা হলেন তার অধিনায়িকা।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূলমন্ত্র হলো, 'জীবনের মধ্যে ভাগবত সত্তাকে নামিয়ে আনা'। তিনি বললেন, আমরা চাইছি এক নূতন গুণ সম্পদ হিসাবে অতিমানসকে এখানে নামিয়ে আনতে। মন বলতে এখন যেমন মানব চেতনার একটা স্থায়ী অবস্থার জিনিস বলে বোঝায়, তেমনি আমরা চাইছি এমন জাতির সৃষ্টি করতে যাদের পক্ষে অতিমানসই ঐ রকম স্থায়ী অবস্থার জিনিস হয়ে দাঁড়াবে।' অতিমানসকে আনতে চেষ্টার কারণ কি? 'আমি চাইছি এক উচ্চতর সত্যকে। তাতে মানুষ এর চেয়েও বড় হতে পারবে কি না সে প্রশ্নই নয়, কিন্তু যাতে তাদের জীবনের মধ্যে আসে শান্তি সত্য ও আলো, তাদের জীবন যাতে এখনকার এই অজ্ঞতা অসত্য জ্বালা-যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে নিত্য সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে থাকার চেয়ে ভালো রকম কিছু হয়ে ওঠে। আমি চাই এই পার্থিব চেতনার মধ্যে কিছু আভ্যন্তরীণ সত্য, আলো ও সঙ্গতি এবং শান্তি এসে পড়ুক। উপরের দিকে তা রয়েছে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। উপর থেকে তার জ্যোতি আমার চেতনার মধ্যে এসে উঁকি মারছে। তাইতো আমি চাইছি যে সেই জ্যোতি সমগ্র সত্তার মধ্যে তার আপন শক্তিতে এসে অবতীর্ণ হোক। মানুষের প্রকৃতি আর যেন এমন আধো-আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে না থাকে। আমি বিশ্বাস করি, পার্থিব বিবর্তনধারার শেষ উদ্দেশ্যই হবে সত্যের আলো নেমে এসে এখানে দিব্য চেতনা বিকশিত হবার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া।'

অতিমানস-চেতনায় সম্ভব সেই রূপান্তরিত সার্থক জীবনে আর তারই জন্য শ্রীঅরবিন্দের সাধনা।

Life Divine গ্রন্থে এই তত্ত্বকে, দর্শনকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

'স্মরণাতীত কাল হতে দেখা গেছে যে যখনই মানুষের চিত্ত জাগরিত হয়েছে তখনই তার চিন্তা-জগতের সর্বোচ্চ স্তরে যা অবস্থিত তাতে পৌঁছিতে চেয়েছে। ভগবানের দিকে যাবার আকুতি, পূর্ণত্ব প্রাপ্তির আবেগ নিখাদ সত্য এবং অবিমিশ্র আনন্দের সন্ধান, অমরত্ব ও অমৃতত্বের একটা বোধ ও তা লাভের ইচ্ছা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে এ সমস্ত তার কাছে অস্পষ্ট এবং সংশয়সঙ্কুল হয়ে উঠলেও, সে অস্পষ্টতা এবং সংশয় চিরস্থায়ী হতে পারে নি। ভগবান আলোক স্বাধীনতা অমৃতত্ব যেমন পুরাকালে তার সর্বশ্রেষ্ঠ আস্পৃহার বস্তু ছিল আজও যেন তাই রয়েছে। মানুষ তার চৈতন্যে বিকশিত হয়ে উঠছে। এই বিকাশ চলতে থাকবে যতদিন না মানুষ নিখুঁত পূর্ণ চৈতন্যে উত্তীর্ণ হয়। চৈতন্যের বিকাশ জীবনেরই গূঢ় তত্ত্ব, পার্থিব বিকাশেরই মূল সূত্র।'

'সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। আর মানুষ বিবর্তনের ধারায় সেই লক্ষ্যে চলেছে। এই বিবর্তন চৈতন্যের। চৈতন্যের ক্রমবিকাশ ছাড়া কিছুই নয়। এই সব কিছুরই শুরু প্রাণহীন জড় পদার্থে। কালক্রমে কোন বিশেষ ক্ষণে প্রাণ প্রসূত হলো জড় পদার্থ থেকে। যা ছিল বা যাকে মনে হোত প্রাণহীন তাই হয়ে উঠলো স-প্রাণ। এই ভাবেই উদ্ভিদ জগৎ জন্মাল, চৈতন্যের সেই প্রথম প্রাগৈতিহাসিক কম্পন। তারপর এলো গর্ভবাস। প্রসবের কাল। যার অন্তে অঙ্কুরিত হলো মন। মনই প্রথম চেতন-চৈতন্য। এই ভাবেই আবির্ভূত হলো প্রাণ, এই স্তরে চেতনা আরও পরিষ্কার হয়েছে, আকার নিচ্ছে। ইন্দ্রিয়জ মানস থেকে জন্ম হলো মনের অর্থাৎ চিন্তার মননের। তারপরই প্রাণীর ধারায় এলো মানুষ। মানুষের চৈতন্য হলো জাগ্রত চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য যে এ নিজের সম্পর্কে চেতন।'···

কিছুই ছিল না আর তা থেকে কিছু একটা সৃষ্টি হয়ে গেল এ হয় না। জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে কারণ জড়েই প্রাণ লুকিয়ে ছিল। প্রাণকে জড় গোপনে প্রচ্ছন্নভাবে লালন করছিল। যা অন্তর্নিহিত ছিল তাই বেরিয়ে আসতে পারে। তেমন করেই প্রাণ থেকে মন বেরিয়ে

এলো, কারণ প্রাণে মন অন্তর্নিহিত ছিল। এবং সেই সূত্রেই দূরস্থ ভাবে জড়েও মন প্রচ্ছন্ন ছিল। তেমনি করে প্রাণজ মন পরিণত হলো বুদ্ধিতে। যথার্থ চেতনায় প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি এবং সেই সূত্রে প্রাণের এমন কি নির্বোধ জড়ের প্রকৃতি। এই ভাবেই এই স্তরবিন্যাস নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত এবং এই নিরবচ্ছিন্ন ধারার যোগসূত্র হোল চৈতন্য, সে চেতনা উদ্ভাসিতই হোক বা প্রচ্ছন্নই থাকুক। অস্তিত্বের মূলেই চৈতন্য। নিখিল বিশ্বের ধারাবাহিকতার লক্ষ্যই হলো এই চেতনাকে প্রকাশ করা।

জড় জীবন আর মন, চৈতন্যের এই তিন প্রধান স্তরকে মানুষ আত্মসাৎ করেছে এবং নিজের চেতনার চেতনবুদ্ধির আলোকে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ-বিভাগ এবং স্থান নির্দেশ করেছে। এই করেই পরে পরে সাজানো হয়েছে বিজ্ঞানের তিন বিভাগকে—পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞান।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, সৃষ্টিতে বিবর্তনের গতি সমে এসে থামে নি। তা চলেছে এবং মনকে অতিক্রম করে চেতনার ঊর্ধ্বতর এক স্তরের লক্ষ্যে এই গতির অভীপ্সা। এরই নাম দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ 'অতিমানস'। চেতনার অগ্রগতির এই অভীপ্সার পরিণামে পৃথিবীতে এক নূতন চেতনার উচ্চতর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উন্মেষ হবে। সেই নব চেতনার নীতিকে নিয়ামক করে এক নূতন জাতির আবির্ভাব হবে মনুষ্যকুলে। পৃথিবীর বুকে প্রস্তর খনিজ পদার্থ থেকে উদ্গত হলো উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীর। নিছক প্রাণী বা জন্তু পরিণত হলো মানুষে। এবং এই মানুষ থেকেই সম্ভূত হবে অতিমানব। শ্রীঅরবিন্দ তাকে বলছেন 'Superman' এবং বলছেন Superman-এর আবির্ভাব কোনও সম্ভাবনার কথা নয়। অবশ্যম্ভাবী। চেতনার অবধারিত পরিণাম। *

বিবর্তনের পরিণামে পরবর্তী কোন কালে মানুষ একদিন আসবে একথা যেমন কপিকুলের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ছিল না তেমনি যুক্তি ও বুদ্ধির মানসিক মাত্রায় সীমিত মানসভূমিতে দাঁড়িয়ে অতিমানস চেতনা বিষয়ে ধারণা করা সহজ নয়।

* Message of Sri Aurobindo—নলিনীকান্ত গুপ্ত।

মানুষের ঠিক আগের স্তর পর্যন্ত বিবর্তন ছিল স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা প্রযত্নহীন অচেতন। মানুষ থেকে শুরু হোল সচেতন, চিন্তাপ্রসূত, ইচ্ছা-প্রণোদিত বিবর্তন। যে বিবর্তন অজ্ঞানে অন্ধকারে আড়ালে ঘটেছিল তাই প্রকাশ্যে সজ্ঞানে অনুষ্ঠিত হতে শুরু হবে মানুষ থেকে। ফলে সময় সংক্ষিপ্ত হবে।

অতিমানস চেতনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগে সংগে অজ্ঞানের আঁধার বলে কিছু থাকবে না। তখন শুধু জ্ঞান। শুধুই আলো। অতিমানস চেতনাসম্পন্ন যে মানুষ সে সদাই পূর্ণ দিব্যলোকে প্রতিষ্ঠিত। চেতনার শীর্ষে তার অধিষ্ঠান। অবারিত অনন্ত জ্ঞান তার আয়ত্তে। অতিমানস চেতনাসম্পন্ন মানুষ জ্ঞান থেকে জ্ঞানে, আলো থেকে আলোয় এগিয়ে চলে। যে আংশিকতা যে দ্বৈত বর্তমান, মানুষের চেতনায় জড়িত অতিমানস চেতনায় সে দ্বন্দ্ব সে বন্ধন নেই। চেতনার স্তরপর্বে মানুষকে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। বর্তমান মানুষ একলাফে অতিমানসে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। শ্রীঅরবিন্দ চেতনার এই স্তরবিন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়েই overmind এবং Mind of light-এর কথা বলেছেন। ওই স্তরও সাধারণ মানসচেতনার গোধূলির ওপারে স্থিত এবং তা অতিমানসের ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধি আলোকের রাজ্য। অতিমানসের জ্ঞান হলো আত্মজ্ঞান। অতিমানসে ইচ্ছাও চেষ্টাকৃত শ্রমসাধ্য নয়। ইচ্ছামাত্রই চেতনার আত্মশক্তির সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। জ্ঞান এবং ইচ্ছা এক হয়ে গেছে। আর প্রতিষ্ঠা মানে পরিপূর্ণ আনন্দে প্রতিষ্ঠা। অতিমানস চেতনায় প্রতিষ্ঠিত মানুষ আবিষ্কার করে যে আনন্দই সকল সৃষ্টির মূলে এবং অস্তিত্বের সত্য ও আনন্দেই বিধৃত। এই অবস্থাকেই বেদান্তের 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'-এর অবস্থা বলা হয়।

মানুষ তার পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে যে অচেতনার, অজ্ঞানের আদি পাপ নিয়ে জন্মেছে তার কোন স্থায়ী এবং আমূল আরোগ্য সম্ভব নয়, যতই কেননা সামাজিক এবং সহজাত প্রবৃত্তির দাস মানুষের আরোগ্যের প্রচেষ্টা করা হোক। সমাজসংস্কারক আদর্শবাদী এমন কি সাধু সন্ত ও পরমজ্ঞানীরা এই পাপকে এই ব্যাধিকে লক্ষ্য করেছেন এবং তার প্রতিকারের চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির এই ব্যাধি এই দীনতা যেমন ছিল তেমনি আছে।

কারণ এই কালব্যাধির মূল মানুষের জড় দেহের অচেতন চেতনার গভীরতম প্রদেশে দৃঢ় প্রোথিত হয়ে আছে। একে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে উচ্চতম চেতনার, সৃষ্টিশীল সত্যচেতনার সাহায্য নিতে হবে। তাই একমাত্র অতিমানস চেতনাই পারে এই রোগকে নির্মূলভাবে আরোগ্য করতে। পৃথিবীতে পার্থিব জীবনকে রূপান্তরিত করতে। সর্বকালে সর্বদেশে উচ্চতম জীবনের জন্য মানুষের যত সাধনা, পূর্বসূরীদের সে সকল প্রযত্নই শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধ অতিমানস চেতনার নান্দীপীঠ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণাঙ্গ মানুষ এবং মনুষ্য সমাজকে এমন কি সমস্ত সৃষ্টজগৎকে অঙ্গীকার করেছেন। তিনি তাঁর সাধনায়, তাঁর ঋষিদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন, পৃথিবীর বুকে সমাজ-বিন্যস্ত মানুষের এক সার্থক সমুচ্চ সম্পূর্ণতম সার্থক জীবন সম্ভাবনা। সম্ভাবনা সার্থকতম জীবনের। মানুষ হবে এক পূর্ণ অখণ্ড নিখুঁত মানুষ। তার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চিন্তায় ভাবনায় চলায় বলায় কাজে কর্মে সে মানুষ প্রকাশ করবে পরম সত্যকে যা 'সৎ-চিৎ-আনন্দে'র শক্তিতে স্পন্দমান। শুধু ব্যক্তি মানুষ নয়, সমষ্টিগত সমাজ জীবন একইভাবে রূপান্তরিত হবে। আর অতিমানস চেতনায় রূপান্তরিত সমাজে মানুষ খুঁজে পাবে এক সুষমামণ্ডিত জীবনের সার্থকতা।

* * *

এইভাবে মহাদার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বের মানুষের ভাবলোকে এক নূতন দর্শনের মহত্তর জীবনাদর্শের পত্তন করলেন। জীবনের সার্বিক উত্তরণ এবং অগ্রগমনের হিরণ্যসঙ্কেত বৈদিক ঋষিদের মতই সোচ্চার করে তুলে ধরলেন অতৃপ্ত বিভ্রান্ত মানুষের কাছে। চরৈবেতির অস্ফুট সুর স্ফুটতর করে তুললেন। এগিয়ে চলো……এগিয়ে চলো……। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণে মহাচেতনার আবির্ভাব কামনায় তিনি নিজেকে করলেন উৎসর্গ। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। 'A spiritual religion of humanity is the hope of future.' আরও বললেন, 'A religion of humanity means the growing realisation that there is a Secret Spirit, a divine Reality in which we are all one, that humanity is its highest

present vehicle on earth, that the human race and the human being are the means by which it will progressively reveal itself here.'

১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এলেন পণ্ডিচেরীতে। দর্শন করতে ঋষি শ্রীঅরবিন্দকে। ১৯০৮ সালে অগ্নিযুগের বিপ্লবীকে দর্শন করে যে প্রশস্তিটি উদগীত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ হতে, সেই প্রশস্তিকেই যেন রূপায়িত হতে দেখলেন অরবিন্দের জীবনে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ দেহে মনে আত্মায়। অনুপম ভাষায় কবিসম্রাট বললেন, 'প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জ্বালাবেন।...আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন : যুক্তাত্মানঃ সর্বেমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার, আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার।

আমি তাঁকে বলে এলুম, 'আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন, এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে : শৃণ্বন্তু বিশ্বে। প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে, প্রাণের চাঞ্চল্যে। আর দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার! আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!'

* * *

শ্রীঅরবিন্দের কাছে চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে হচ্ছে হওয়া, 'To become.' 'The ultimate value of a man is not to be measured by what he says or does, but by what he becomes.'

শ্রীঅরবিন্দের নিজের জীবনই একটি মহাকাব্য। বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যময় উজ্জ্বল মোহে, যৌবন কাটলো বরোদায় বাণীর সাধনায়, অন্তরের ধ্যানের নির্দেশে। যৌবনোত্তর দিনে সেই ধ্যানের ভাষা নিবিড় হয়ে নামলো মনে, হলেন তিনি কর্মযোগী। তারপর নামলো আরো গভীরতর ছায়া। বৃহত্তর পরিণতির জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন গভীরতম অনুভূতির জন্য এবং সেই পর্ব তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস। আত্মবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। আলোর ইতিহাস—আরো আলোর। দিব্য জীবন লাভের, লোকোত্তরে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার, যে প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষকে আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ফিরে আসতে হয় না। মৃত্যুময় পৃথিবীতে আর পুনরাবর্তন করতে হয় না।

সব তখন পরিবর্তিত হবে
যাদুময় শৃঙ্খলা এক আসবে
এই যান্ত্রিক বিশ্বসৃষ্টির উপর ছেয়ে
মর্তের জগতে এসে বাস করবে
অধিকতর শক্তিমান জাতি এক
প্রকৃতির জ্যোতির্ময় চূড়ায় চূড়ায়
অধ্যাত্মের প্রতিষ্ঠায়
অতিমানুষ জীবনের রাজা হয়ে
শাসন করবে
পৃথিবীকে স্বর্গের প্রায় সহরে
সমরূপ করে ধরবে
আর মানুষের অজ্ঞান হৃদয়কে
নিয়ে যাবে স্বর্গের দিকে
সত্যের দিকে।
চিন্ময় পুরুষ মানুষী লীলায়
যোগ দেবে
এই পার্থিব জীবন হয়ে উঠবে
দিব্য জীবন।

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর, বিষাদের করাল ছায়া সকলকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করলো। আশ্রমের মধ্যে শান্তিমগ্ন একটি বৃক্ষের নিচে পরমযোগীর জন্য চিরকালীন শয্যা পাতা হোল ; শ্রীঅরবিন্দ ৭৯ বৎসর বয়সে দেহলীলা সম্বরণ করলেন।

২৪শে নভেম্বর প্রথা মতো তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন সকলের সংগে। সেই দিনই আশ্রমবাসীরা জানতে পারলো শ্রীঅরবিন্দ অসুস্থ। তারপর আরও কয়েকদিন অতিক্রান্ত হলো। ৪ঠা ডিসেম্বরও কেউ ধারণা করতে পারেন নি দিব্য পুরুষের মর্ত্যধামলীলা সাঙ্গ হবে অতিদ্রুত। ৫ই ডিসেম্বর আশ্রমবাসীরা জানতে পারলো, দেখতে পেলো মহাপুরুষ চিরশয্যায় শায়িত। অকস্মাৎ শ্রীমা বলে উঠলেন, 'শ্রীঅরবিন্দের দেহ থেকে এক জ্যোতির্ময় প্রভা বিকিরণ করছে, অতিমানসের স্ফুরণেই এমন হচ্ছে। যতক্ষণ এই জ্যোতিস্তরঙ্গ অম্লান থাকবে ততক্ষণ এদেহ স্পর্শ করা হবে না। এই ভাবেই থাকবে।' সংবাদপত্রের মারফৎ এই অত্যাশ্চর্য খবর ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে নরনারী দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এলো এই জ্যোতিপ্রভা দর্শন মানসে। ভক্তবৃন্দ একটি হিরণ্ময় কান্তি দর্শন করে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে শেষ প্রণাম নিবেদন করলো। ৫ই ডিসেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দর্শন চললো। ৯ই ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সংগে সংগে হিরণ্ময় প্রভাটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হলো। এতদিন ডাক্তারও মৃত্যুর লক্ষণ খুঁজে পান নি। ৯ই ডিসেম্বরের ম্রিয়মাণ সূর্যালোকে ডাক্তারের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মৃত্যুর লক্ষণ। আর সেই দিনই সন্ধ্যায় আশ্রমের মধ্যে সমাধিস্থ করা হলো শ্রীঅরবিন্দের মরদেহ। মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ। তখনও যেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের আকাশে বাতাসে অনুরণিত হতে লাগলো কবি-হৃদয়ের উৎসারিত সেই শ্রদ্ধার্ঘ্য,

—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

ব্রজবিদেহী শ্রীসন্তদাস

মুক্ত আকাশের নীচে রাত্রির শেষ প্রহরে পূর্বাকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে তারার মৃদু আলোকে তারাকিশোর হঠাৎ দেখতে পেলেন জটাজুটধারী তেজঃপুঞ্জ নয়নযুক্ত এক মহাপুরুষ তাঁরই চোখের সম্মুখে দণ্ডায়মান। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। মনের সব দ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্যকে শান্ত ক'রে দিয়ে যোগীবর তাঁর কর্ণকুহরে একটি মন্ত্র উপদেশ করলেন। পরমুহূর্তেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হলেন। অভিভূত তারাকিশোর তখনও অনুভব করতে লাগলেন তাঁর অন্তরের স্তরে স্তরে যেন সেই মন্ত্র অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে—আরও মনে হতে লাগলো জগৎটা যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ ও চৈতন্যময়—সে আনন্দের শেষ নেই—সীমা নেই। অন্তরের গভীরে এতদিন যে এক আকুলতার পদ্মকোরক আলোকের স্পর্শলাভের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল, এই জীবনই যেন আজ অঞ্জলি হয়ে গ্রহণ করলো সেই আলোক।

এই তারাকিশোরই হলেন ভবিষ্যতের মহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী। আর ঐ মন্ত্রদাতা মহাপুরুষ হলেন শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া-বাবাজী, সন্তদাস বাবাজী মহারাজের গুরুদেব।

১৩০০ সন। মাঘমাস। পূর্ণকুম্ভের যোগস্নান। প্রয়াগে। পুণ্যকাম সহস্র সহস্র স্নানার্থীর কোলাহল জাগে প্রতিদিন। 'লক্ষ লক্ষ সাধক ও পুণ্যার্থী এককালে করে স্নান'। ভারতবর্ষের দশনামী সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ও চতুঃসম্প্রদায়ের অগণিত সাধুর পূত পদরজে গঙ্গা-যমুনার সেই সঙ্গমক্ষেত্র যেন জ্যোতিঃস্নাত হয়ে রয়েছে। সেই অগণিত লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে তারাকিশোরের দু'টি আকুল চক্ষু অনুসন্ধান ক'রে ফিরছে সদ্‌গুরুর। কলকাতা থেকে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় এসেছেন গুরুর সন্ধানে। বন্ধুবর শ্রীযুত হরিনারায়ণ রায়ের সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর তাঁবুতে। সেখানে ছিলেন হরিনারায়ণ রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুত অভয়নারায়ণ রায়। তিনি হলেন শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার মন্ত্রশিষ্য এবং গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ভক্ত। তারাকিশোর চৌধুরীও ছাত্রজীবন থেকেই

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বন্ধুত্ব ছিল, শ্রদ্ধাও করতেন। তারাকিশোরকে দেখেই গোস্বামীপ্রভু প্রসন্নচিত্তে অভিবাদন ক'রে বললেন, 'এখানে এসেছেন, বড় ভাল হয়েছে। অনেক মহাত্মা পুরুষের সমাগম হয়েছে। কারো শুভদৃষ্টি পড়লে উদ্ধার হয়ে যাবেন।'

তারপর অভয়বাবুর আগ্রহে উভয়ে চললেন শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবাজীর দর্শন মানসে। বৃহৎ ছাতার নীচে জটাজুটধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর এক প্রাচীন সাধুকে উপবিষ্ট দেখে মুগ্ধ হলেন তারাকিশোর। মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। অভয়বাবু উভয়কেই পরিচয় করিয়ে দিলেন বাবাজী মহারাজের সঙ্গে। বাবাজী মহারাজ তারাকিশোরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ইনকো ত হম্ বৃন্দাবনমে দর্শন কিয়া'। কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী তারাকিশোর চৌধুরী বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন এই মহাপুরুষের সঙ্গে ইতিপূর্বে ত কখনও সাক্ষাৎ হয় নি। তবে কেন এ কথা বললেন ? আরও বিস্মিত হলেন, যখন তাঁরই মনের গভীরে নিহিত একটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন এই সৌম্য শান্ত মহাপুরুষ। তবে কি তাঁর মনের কল্পনায় এতদিন ধরে যে দেবতা আসা-যাওয়া করেছেন একটি মানুষের মূর্তি ধরে, ইনিই সেই দেবতারূপী মানুষ ? অপার বিস্ময়ে আকুল দুই চোখের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন তারাকিশোর রামদাস কাঠিয়াবাবাজীর মুখের দিকে।

পরদিন আবার এলেন। অজানা এক শক্তি তাঁকে যেন আকর্ষণ করছে। অস্পষ্ট হলেও জীবনে এই প্রথম অনুভব করলেন যুক্তিবাদী মনের দুর্বলতা। এই মহাপুরুষের সামনে এসে বসলে তাঁর সব ভাবনাগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। দুর্বলতা ! কিন্তু সে দুর্বলতার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না তারাকিশোর চৌধুরী। কুম্ভমেলায় যে কয়দিন ছিলেন, প্রতিদিনই কাঠিয়াবাবার সমীপে এসে উপস্থিত হতেন। থাকতেন গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে, কিন্তু কাঠিয়াবাবাজীকে দর্শন না করা পর্যন্ত মনে একটা অস্থিরতা অনুভব করতেন। কেন এই অস্থিরতা ? কেন এই মনের চাঞ্চল্য অপরিচিত এই সাধুটির জন্য ? এর উত্তর তিনি সেদিন পান নি।

কুম্ভমেলার লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে কাঠিয়াবাবাজী ধীরে ধীরে

তারাকিশোরের অন্তরের অন্তস্তলে আসন বিস্তার করে বসলেন। তাইতো কাঠিয়াবাবাজীর অমোঘ আকর্ষণ থেকে তারাকিশোর মুক্ত হতে পারলেন না। কিন্তু তারাকিশোর চৌধুরীর যুক্তিবাদী মনের সংশয় ও পরীক্ষা তখনও চলতে লাগলো। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হলো, কাঠিয়াবাবাজীকে তিনি নিজমুখে কোন প্রশ্ন করছেন না, কিন্তু জীবনের প্রশ্নের উত্তরগুলি ঠিকভাবেই মিলে যাচ্ছে। গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে শুনলেন, কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ মোট চারজন শিষ্য করবেন বলে ঠিক ছিল। সে সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে, এখন আর নূতন কোন শিষ্য গ্রহণ করবেন না। বিষণ্ণ হয়ে উঠলো তারাকিশোরের মন। মনের কোণে যে ক্ষীণ আশা জাগরিত হয়েছিল দীক্ষা গ্রহণের, গুরুবরণের, সে আশার আলোটিও যে নির্বাপিত হতে চলেছে।

আবার একদিন। তারাকিশোর বসে আছেন কাঠিয়াবাবার নিকটে। সৎসঙ্গ হচ্ছে। হঠাৎ মৃদু হেসে কাঠিয়াবাবাজী তারাকিশোরকে ইঙ্গিত ক'রে বলে উঠলেন, 'হমারা তো পাঁচ ছে চেলা হ্যাঁয়। সুপাত্র হোনেসে অব্ভী চেলা করতে হেঁ'। উপযুক্ত অধিকারী পেলে কাঠিয়াবাবাজী আরও শিষ্য করতে ইচ্ছুক। তারাকিশোরের বিষণ্ণ মন প্রসন্ন হোল। অনুভব করলেন তাঁর অন্তর্যামিত্ব। মনের সংশয় বিদূরিত হলো। মনে মনে স্থির করলেন, এ কেই গুরুরূপে বরণ করবেন। কাঠিয়াবাবাজীর প্রতি শ্রদ্ধায় ওঁর মন ভরে উঠলো।

কুম্ভমেলা থেকে ফিরবার দিন তারাকিশোর গেলেন কাঠিয়াবাবাজীকে প্রণাম করতে। মহারাজ প্রসন্ন হাসি হেসে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'তুম্ চৈত্ মাহিনেমে বৃন্দাবনমে যায়কর হমকো ফের দর্শন দেনা'। তারাকিশোর যেন চৈত্র মাসে বৃন্দাবন গিয়ে মহারাজকে দর্শন দেন। তারাকিশোর লজ্জানম্র-কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ! আমি ওকালতী কার্য করি, চৈত্রমাসে কোন দীর্ঘ ছুটি নেই, কেমন ক'রে বৃন্দাবন যাবো? তবে আপনি যদি আমাকে টেনে নেন, তবে যেতে পারি'। —'হাঁ তুমকো মহাবীরজী জরুর লে যায়গা', মৃদু হেসে বললেন কাঠিয়াবাবাজী।

সপ্তাহ শেষ হয়। মাসের পর মাস চলে যায়। আবার আসে নূতন দিন, নূতন সপ্তাহ—নূতন মাস। চৈত্র মাস। সত্য সত্যই চৈত্র মাসের এক

শুভদিনে শ্রীযুত অভয়নারায়ণ রায়ের সঙ্গে তারাকিশোর চৌধুরী যাত্রা করলেন বৃন্দাবন ধামের পথে। এই বৃন্দাবন ধামেই ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ রামদাস কাঠিয়াবাবাজীর আশ্রম।

আশ্রম বলতে নানারকম সাপের আবাসভূমি। কয়েকটি পুরোনো ঘর। অন্ধকারময় চোরকুঠরী। হনুমানজীর মূর্তি একটি অতি ছোট কুঠরীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। নানাস্থানে গর্ত। গোখ্‌রো ও রক্তবংশী সাপের বাস। হনুমানজীর কুঠরী ও পার্শ্বস্থ দুইটি চোরকুঠরীর সামনে ছোট্ট একটি বারান্দা। তারই একদিকে একটি তক্তপোষের উপর কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ শয়ন করেন। বিশাল এক রক্তবংশী সাপ মাঝে মাঝে হনুমানজীর আসনের উপর এসে আশ্রয় নেয়। একটি লাঠির মাথায় বলের মত করে নেকৃড়া জড়ানো আছে। সেই লাঠির অগ্রভাগ দিয়ে বাবাজী মহারাজ সর্পটির শরীর ঠেলতে থাকেন আর বলেন, 'আরে হঠ্‌ যা, হঠ্‌ যা'। সর্পটিও তখন অনুগত ভক্তের মত আসন হতে নেমে গর্তের ভিতর প্রবিষ্ট হয়। তখন তিনি হনুমানজীর গায় সিঁদুর লেপে মালা পরিয়ে দেন। এই ভীষণ বিষধর সাপের আবাস-ভূমিরূপ গৃহে বাবাজী মহারাজ একাকী রাত্রি যাপন করেন।

কিন্তু এখানে এসে তারাকিশোর ভাবী গুরুদেবের কার্যকলাপ দর্শন করে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন, অতি সাধারণ শ্রেণীর গৃহস্থের মত কাঠিয়াবাবা জীবন যাপন করছেন। যেন অত্যন্ত বিষয়ী। একবারও ধ্যানস্থ হতে দেখা যায় না। সকালে বিকালে রাস্তার পাশে বসে এক পয়সা আধ পয়সা ক'রে যাত্রীদের নিকট থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। ব্রজবাসীদের সঙ্গে বসে স্থানীয় নানা বিষয়ের গল্প করেন যার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের কোনরূপ সম্পর্কই নেই। নিজে বাজারে যান, অত্যন্ত দর-কষাকষি ক'রে জিনিষপত্র কেনাকাটা করেন। তাঁর ভাঙ-চরসের আড্ডায় চোর ডাকাত ও উচ্ছৃঙ্খল সদস্যের অভাব নেই। তারা পথচারীদের নিকট বাবাজী মহারাজের মহিমা কীর্তন ক'রে যখন দু' চার পয়সা আদায় করতে থাকে তখন স্বয়ং বাবাজী মহারাজ তাদের সম্মুখে বসে তৃপ্তির হাসি হাসতে থাকেন। সামান্য পয়সা কড়ি হাতে থাকলে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের অবধি নেই। কারণ আশ্রমিকদের কাউকেই তিনি বিশ্বাস করেন না।

আশ্রমিকদের সঙ্গেও যে সব কথাবার্তা বাবাজী মহারাজ বলেন, তাতে অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ খুব কমই থাকে।

কুম্ভমেলায় কাঠিয়া বাবাজীকে দর্শন ক'রে তারাকিশোরের মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সে ভাবনা, সে ধারণা একেবারেই তিরোহিত হলো। তিনি তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। অপর দিকে আবার দেখা যায়, বৃন্দাবনের সমস্ত সাধু-সম্প্রদায় ওঁকে খুবই সম্মান প্রদর্শন করছেন। ইনি যে ব্রজের মহন্ত বয়োবৃদ্ধ প্রাচীন সাধু! সব দিক্ চিন্তা ক'রে, বাবাজী মহারাজের আচরণ ক্রিয়াকলাপ তারাকিশোরের নিকট রহস্যপূর্ণ বলেই মনে হতে লাগলো। আবার মনে মনে চিন্তা করলেন, এঁকে নিশ্চিতরূপে না জেনে কি ক'রে গুরুরূপে বরণ করি? কাঠিয়াবাবাজী যদি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই হন, তাহলে তিনি অন্তরের কথা জেনে নিশ্চয়ই কৃপা করবেন, শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন।

এইভাবে তারাকিশোর যখন বৃন্দাবন আশ্রমে কাঠিয়াবাবাজীর সমীপে বসে তাঁরই সম্বন্ধে নানা এলোমেলো চিন্তা করছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন কাঠিয়াবাবাজী কথা প্রসঙ্গে তারাকিশোরকে লক্ষ্য করে বল্লেন, —'ইস্ বক্ত্ তোম্‌কো দীক্ষা নেহি দেয়েঙ্গে। তোমারি স্ত্রী কি সঙ্গ্ শ্রাবণ মাইনামে ফের হিঁয়া আইও, ওস বকত্ তুম্ দোনোকো এক সঙ্গ্ দীক্ষা দেয়েঙ্গে'। স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে শ্রাবণ মাসে আবার বৃন্দাবন আসতে হবে, তখন দু'জনকে একসঙ্গে তিনি দীক্ষা দেবেন।

কাঠিয়াবাবাজীর স্পষ্ট অভিমত শুনে তারাকিশোর কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। কারণ তখনও বাবাজী মহারাজের উপর তাঁর যে পূর্ণ আস্থা জন্মে নি! ইতিমধ্যে তিনি নিজের মনকে প্রস্তুত করতে ও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কিছুটা সময় পাবেন। এই প্রসঙ্গে সন্তদাস বাবাজী বলছেন, "এই কথা শুনিয়া আমার চিন্তা দূর হইল। আমি মনে মনে বলিলাম, আমার তো এই সময়ে দীক্ষা লইতে মতিই হয় নাই, দীক্ষার কথা বারণ করিলেন ইহা, ভালই হইল। ইঁহার প্রতি আমার সন্দেহ দূর হইলে পর যেরূপ হয় দেখা যাইবে।"*

অবশেষে একদিন বৃন্দাবন ধামের লীলা সাঙ্গ ক'রে তারাকিশোর চৌধুরী

* শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজীর জীবনচরিত-লেখক—স্বামী সন্তদাসজী মহারাজ।

ফিরে এলেন তাঁর কর্মক্ষেত্রে—কলকাতায়। কিন্তু তিনি মনের শান্তি হারালেন। দিনের বেলায় আইন-ব্যবসায়ের কর্মে লিপ্ত থাকেন সত্য, কিন্তু সন্ধ্যার পর তৎসংক্রান্ত কোন কর্মই করতে সক্ষম হন না। যে সদ্‌গুরু লাভের জন্য তাঁর এত দৌড়াদৌড়ি, সবই ত বৃথা হলো। ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুলাভের চিন্তায় আকুল হয় তাঁর অন্তর। তারপর অকস্মাৎ একদিন অলৌকিকভাবে রাত্রি শেষ প্রহরে ছাদের উপর দর্শন করলেন রামদাস কাঠিয়াবাবাজীকে এবং মন্ত্রও লাভ করলেন। এবারে কাঠিয়াবাবাজী সম্বন্ধে সকল সংশয় বিদূরিত হলো। তিনি উপলব্ধি করলেন, অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় সর্ববিধ বাহ্য ব্যবহারের অন্তরালে কাঠিয়াবাবাজী মহারাজের চিত্তে অধ্যাত্ম-চেতনা সর্বদাই জাগরিত রয়েছে। তাঁর বাহ্যিক আচরণ ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মানুষের নিকট থেকে আত্মগোপন করবার প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়। ভারতের অনাবিল অমর অন্তশ্চারী অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির প্রাণস্রোতঃ চিরপ্রবহমাণ ছিল তাঁর অন্তর্জগতে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঋষি-ভারতের মৌলিক ধারাকে তিনি বহন ক'রে চলছিলেন।

কাঠিয়াবাবাজীর আহ্বানে আর কোন সমস্যা ছিল না। এতদিনে পাগলের মনডিঙা ঘাট খুঁজে পেল। শ্রাবণ মাসে বৃন্দাবনে গিয়ে তারাকিশোর সস্ত্রীক আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করলেন রামদাস কাঠিয়াবাবাজীর নিকট থেকে। ইংরাজী ১৮৯৪ সনের আগস্ট মাসে। শ্রীগুরুর অভিপ্রায় অনুসারে দীক্ষালাভের পরও তারাকিশোর গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে থাকেন। তাঁর অনুপম জীবনচর্যা ও আচরণে তিনি কর্ম ও সন্ন্যাস এবং সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয় সাধন ক'রে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি মধ্যযুগের উৎকট সাধন-কঠোরতাকে নবযুগের পরিস্থিতিতে নবরূপ দান করলেন।

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার ক্রমে ৫৪তম আচার্য হচ্ছেন শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা। এই সম্প্রদায়েরই ৫০তম আচার্য শ্রীইন্দ্রদাসজী মহারাজ কাষ্ঠ-কৌপীনের প্রবর্তন করেন। সেই থেকে আচার্যগণ 'কাঠিয়াবাবা' নামে অভিহিত হন। শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা তাঁর কঠোর তপস্যা ও পরমা সিদ্ধির স্বীকৃতিতে চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সম্মাননীয় শ্রীমহন্ত পদাধিকার লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞ মহাশক্তিধর কাঠিয়াবাবার রোপিত বীজ

শুধু অঙ্কুরিতই হয় নি, একদিন মহামহীরুহে পরিণত হয়ে তারাকিশোর ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কাঠিয়াবাবার মধ্যযুগীয় সাধন-কঠোরতা বাঙ্গালীর স্বাভাবিক রসনির্ঝরে অভিষিক্ত হয়ে যুগোপযোগী কোমলতা প্রাপ্ত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস লিখছেন, 'বাংলার প্রেম মিলিত হইল পশ্চিম অঞ্চলের কঠোর সাধনার সঙ্গে। এই অপূর্ব মিলনের ফলই সন্তদাস। শিক্ষিত সমাজ পাইলেন শিক্ষিত সচ্চরিত্র ভক্তিমান গুরু—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই জ্ঞানী ভক্তের উপদেশ গ্রহণ করলেন।'

গার্হস্থ্য জীবনেই তারাকিশোর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহের ভাষ্য রচনা ক'রে শিক্ষিত জনসমাজের দৃষ্টি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সাধনধারার প্রতি এবং গুরু কাঠিয়াবাবার প্রতি আকর্ষণ করেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রতি বাঙ্গালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করার যুগপুরুষ ছিলেন তারাকিশোর।

লোকসমাজে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পরিচিতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সুকঠোর ত্যাগ, তীব্র বৈরাগ্য এবং দৃঢ়নিষ্ঠ তপস্যার মূলে এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত বলে, সেই উচ্চ আদর্শের অনুসরণকারীর সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। সত্যযুগে আবির্ভূত শ্রীহংস ভগবান শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদি গুরু। তাঁর শিষ্য ব্রহ্মার মানস-পুত্র চতুঃসন—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। শ্রীসনৎকুমার হতে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। দেবর্ষি নারদের শিষ্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য। মোক্ষ সাধনের মূল ভিত্তি ভগবান বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন। এই বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনা ক'রে আচার্যগণ স্ব স্ব মতবাদ স্থাপন করেছেন। শ্রীনিম্বার্ক-রচিত ভাষ্যের নাম 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ'। এই ভাষ্যে সর্বমতের সমন্বয়-সাধনের কথা আছে। তিনি কোনও ভাষ্য খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন নি। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের দৃঢ়ভিত্তির উপর এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদ্য হলো, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম। অর্থাৎ জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপে সর্বদাই স্থিত আছে, কখনও লুপ্ত হয় না। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে, তাই জীব-জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ। এবং এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ নিত্য। শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্ই নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য। ভগবানের পুরুষ মূর্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তিই যেমন প্রধান, স্ত্রীমূর্তির

মধ্যে তেমনই শ্রীরাধিকা মূর্তি প্রধানা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রধানা শক্তি। সশক্তিক উপাসনার মহৎ ফল হোল,—সাধকের কামবৃত্তির নিবৃত্তি করে। ভগবানের সঙ্গে সংযুক্তভাবে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে স্ত্রীমূর্তির অর্চনা করাতে স্ত্রীমূর্তির প্রতি কামভাব তিরোহিত হয়। সমদর্শিত্ব লাভ হয়। ভজন করতে করতে চিত্ত যখন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের গোলোকাধিপতিরূপ এবং সর্বময় সর্বাতীত ঈশ্বররূপ ও গুণাতীত গুণাশ্রয় অমূর্ত পরব্রহ্মরূপ আপনা হতেই চিত্তে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তখন সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন ঘটে। আবার যাঁরা জ্ঞানযোগাবলম্বনে কেবল নির্গুণ অক্ষয় ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁরাও এই ধ্যানের বলে সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। তারাকিশোরের জীবন ও জগৎ দর্শনের উৎসমূল হচ্ছে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের এই দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত।

রামমোহনের পরবর্তী যুগে ইউরোপের নিছক যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী স্রোতকে প্রতিহত ক'রে ভারতের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহকে প্রবহমাণ করবার জন্য যাঁরা বিপুল ত্যাগ ও তপস্যার অবদান রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ অন্যতম ছিলেন। শাশ্বত সনাতন ভারতের অন্তঃপ্রবাহী অধ্যাত্ম-সংস্কৃতিধারার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রকাশ, যদিও তরুণ বয়সে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর চিন্তাধারায় ভাবজীবনে ভাবান্তরের সৃষ্টি হয়েছিল। তারও অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়। বাংলার সেই রেনেসাঁসের, নব ভাব-প্লাবনের মূল প্রাণ-কেন্দ্র ছিল কলকাতা শহর। ভারতের সনাতন ধর্ম, গুরুবাদ, মন্ত্র, প্রতিমা পূজা, বর্ণাশ্রমী সমাজ, শাস্ত্রশাসন পশ্চিমী সংস্কৃতির সম্মুখীন হয়ে টলটলায়মান। সেই বিপর্যয়কারী আলোড়নের এক চরম মুহূর্তে কিশোর তারাকিশোর এলেন সুদূর শ্রীহট্ট থেকে মহানগরী কলকাতায় কলেজে পড়তে। গ্রাম্য কুলাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কিশোরের চিত্তকে অতি দ্রুত যুগসচেতন ক'রে তুললো।

নিমু খানসামা লেনের শ্রীহট্টবাসীদের মেসেই তাঁর পরিচয় হলো তাঁরই স্বদেশবাসী কলেজের ছাত্র পরবর্তী কালের স্বনামধন্য ডাক্তার সুন্দরীমোহন

দাস ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে। ওঁদের প্রগতিশীল সংসর্গ-প্রভাব ব্রাহ্মণ কিশোরের চিত্তকে প্রভাবিত ক'রে ফেলেছিল। এই সময়ের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস।* "এক ছাত্রাবাসেই ঘনিষ্ঠতা। ১৮৭৫ সালে আসিলেন নিমু খানসামার গলিস্থিত ছাত্রাবাসে ঐ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আহার সম্বন্ধে গোলযোগ, শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করেন না। পাচক যে কোন জাতীয় হউক, উপবীতী রক্ষাকবচধারী। কিন্তু প্রথম দিনের অন্ন-গ্রহণে শূদ্র ছাত্রদের তিনি তখনও মূল্য দেন নাই। কি প্রকারে তিনি শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন হইয়া পড়িলেও, একটা সাময়িক মাঝামাঝি রকম তাঁহার সম্মতি পাওয়া গেল—'প্রবাসে নিয়মং নাস্তি'।

"প্রবাস তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তরুণ-হৃদয়জয়ী সুরেন্দ্রনাথ ঘুচাইয়া দিলেন তাঁহার ব্রাহ্মণ্য। নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ হইলেন সংশয়বাদী। একদিকে সুরেন্দ্রনাথের ধর্মভক্তিহীন রাজনীতি, অপরদিকে শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মমূলক রাজনীতি, এই উভয় শক্তির আকর্ষণে পড়িয়া তারাকিশোর শিবনাথ শাস্ত্রীরই জয় ঘোষণা করিলেন। তরুণ হৃদয়ের উৎসাহাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা তাহাতে যে ইন্ধন যোগাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিপিনচন্দ্র, তারাকিশোর এবং আমি হইলাম ধর্ম, সমাজনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে শিবনাথের মন্ত্রশিষ্য। প্রতিজ্ঞা—সমুদয় কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। প্রথম আঘাত হইবে জাতিভেদের চিহ্ন উপবীতের উপরে।"

"পিতা যখন খড়্গাঘাত উদ্যমে ব্যর্থ হইলেন, ভাতে-মারা নীতি অবলম্বন করিয়া মনে করিলেন মানুষ না খাইয়া থাকিবে কত দিন? কিন্তু ভগবৎপ্রেম যাহাকে অন্ন যোগায়, তাহাকে ভাতে মারে কে? ছাত্র হইলেন শিক্ষক। শিক্ষার বিষয় কেবল স্কট, মিল্টনই ছিল না, থিয়োডর-পার্কারের চতুর্বিধ সামঞ্জস্যই ছিল উপদেশের বিশেষ লক্ষ্য। বহু দুর্নীতিপরায়ণ ছাত্রদের জীবন পরিবর্তিত হইল এই তেজস্বী প্রকৃত ব্রাহ্মণের সংসর্গে।

"আবাল্য তারাকিশোরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ। তিনি যাহা ভাবিতেন তাহাকেই রূপায়িত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। মুখে

* প্রবর্তক পত্রিকা, বাংলা ১৩৪২ সন, পৌষ।

এক, মনে আর—তাঁহার সামঞ্জস্যহীন স্বভাবে সহিত না। ব্রাহ্ম ধর্মকে যখন বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন, তখন কেহ তাঁহাকে তর্কে হটাইতে পারিত না। কি রাজনৈতিক রাজ্যে, কি ধর্মনৈতিক রাজ্যে, তিনি সর্বত্র চাহিতেন গণতন্ত্রতা। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ যখন তিনি একমাত্র কেশবচন্দ্রের শাসনাধীন মনে করিলেন, তারাকিশোর কুচবিহার—বিবাহ-প্রতিবাদসভায় ঐ সমাজের একতন্ত্রতার বিরুদ্ধে আলবার্ট হলে প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তরুণদের মধ্যে তিনিই প্রথম বোধ হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।”

* * *

উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে ইংরাজী ১৮৫৯ সনের ১০ই জুন, বাংলা ১২৬৬ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার মধ্যরাত্রে পুণ্য দশহরার পর্বদিনে আবির্ভূত হইলেন দেবশিশু তারাকিশোর। আসামের শ্রীহট্টজেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বামৈ গ্রামে এক অভিজাত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার পুণ্য-আবির্ভাব। পিতা হরকিশোর চৌধুরী ছিলেন গ্রামের জমিদার। শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব ও তেজস্বী পুরুষসিংহ বলে তাঁর খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তারাকিশোরের মাতা গিরিজাসুন্দরী ছিলেন ভক্তিমতী রমণী।

চৌধুরী পরিবারে প্রথম পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর কলমুখরিত উচ্ছল প্রস্রবিণীর মত এক আনন্দ-সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত হয়ে চললো গৃহাভ্যন্তরে। কি প্রাচুর্য, কি শক্তি, কি আনন্দ সেই ক্ষুদ্র শিশুর দেহে! প্রতি মুহূর্তে সে যেন নিজের মধ্যে নিজেই পরিপূর্ণ। প্রাণ-শক্তির কি উচ্ছল অতিরিক্ততা! নিবিড়ভাবে সে আঁকড়ে ধরে তার জননীকে। কতখানি যে সে ভালবাসে তার জননীকে কেমন ক'রে সে জানাবে? এমনি নিবিড়ভাবে সেই ছোট্ট শিশু ভালবাসে সবাইকে, সবকিছুকে। কি আনন্দ! আনন্দের জন্যই যেন সে এসেছে। তার সত্তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা সে আনন্দকে অস্বীকার করতে পারে!

জীবন কিন্তু তা সহ্য করবে না, তার নিষ্ঠুর বাস্তবতা দিয়ে একদিন তাকে বেঁধে ফেলবেই। কিন্তু সেই কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে কঠোর সংগ্রাম ক'রে এই শিশুরূপী ভবিষ্যতের মহাপুরুষ জয়ী হয়েছিলেন।

জননী আদর ক'রে পুত্রের নাম রাখলেন 'রণা'। ধরিত্রীর সঙ্গে রণ করে যেন শিশু ধরায় এলেন! শুক্রবার মধ্যরাত্রে প্রবল ভূমিকম্পের সময়ই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। অন্নপ্রাশনের সময় নাম রাখা হলো তারাকিশোর। এই নামেই তিনি কর্মজীবনে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

তারাকিশোরের পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুলই কুলধর্মানুসারে ছিলেন শাক্ত মতাবলম্বী। পিতৃবংশে কয়েকজন শক্তিমান সাধক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তৈলঙ্গস্বামীর সময়ে কাশীতে 'ভবানী দেব্যা' নামে একজন যোগসিদ্ধা বিধবা বাস করতেন। তিনিও ছিলেন চৌধুরীবংশীয়া। মাতামহ বানিয়াচঙ্গ গ্রামের বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ও আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ। গৃহে নিত্য রামায়ণ, মহাভারত পাঠ ও নানাশাস্ত্রের আলোচনা হয়। বালক তারাকিশোর শোনে নিবিষ্ট মনে। বালকের কোমল চিত্তে রেখাপাত করে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী। চৌধুরী বংশের ধর্মপ্রাণতা তারাকিশোরের অন্তরে অন্তরে রক্তধারায় সঞ্চারিত হয়েছিল।

শৈশবকাল থেকেই তারাকিশোরের অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। ছ' বছর বয়সে হাতেখড়ি হয়। এই সময় থেকেই তিনি সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি অভ্যাস করেন। লেখাপড়ায় মেধা ছিল, কিন্তু শান্ত প্রকৃতির ছিলেন না। অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলছেন, 'বাল্যকালে আমার স্বভাব অতিশয় চঞ্চল ছিল। একস্থানে দীর্ঘকাল আমি বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। পিতাকে অতিশয় ভয় করিতাম। তিনি আমাকে দেখিলেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া শাসন করিতেন। এজন্য পারতপক্ষে তাঁর কাছে যাইতাম না। স্থির হইয়া বসিয়া থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। হয়তো অল্পকাল পরেই পা নাচাইতে আরম্ভ করিলাম। তিনিও অমনি তাড়া করিলেন।'

একদিকে লেখাপড়া, অপরদিকে খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি, লাফঝাঁপ, সাঁতার-কাটা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তারাকিশোরের শৈশব ও বাল্য অতিক্রান্ত হতে থাকে। আট বছর বয়সে জাজিউতা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে তারাকিশোর লস্করপুর স্কুলে ভর্তি হলেন। এইখানেই সহপাঠী ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ।

বাল্যকালেই দশ বছর বয়সে তারাকিশোর মাতৃহারা হলেন। আবার তিনি চলে এলেন শ্রীহট্টে। ভর্তি হলেন মিশন স্কুলে। মিশন স্কুল থেকে চলে যান জেলা স্কুলে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলা স্কুল থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করলেন। আসাম প্রদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তারাকিশোর বৃত্তিলাভও করলেন।

এই কিশোর বয়সেই, পনেরো বছর বয়সে তারাকিশোরের বিবাহ-কার্যও সুসম্পন্ন হলো। পত্নী হলেন দশম বর্ষীয়া কন্যা অন্নদাসুন্দরী, বেজুরা গ্রামের হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা। ভট্টাচার্য বংশ বিশারদ বংশ বলে প্রসিদ্ধ। পূর্বপুরুষ রমানাথ বিশারদ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এঁরা শ্রীহট্টের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলগুরু ছিলেন।* পিতৃকুলের ধর্মনিষ্ঠা ও বহুতর সদ্‌গুণ এই নিষ্ঠাবতী রমণীর মধ্যে বর্তমান ছিল। অসীম ধৈর্য ও সহ্যগুণের অধিকারিণী ছিলেন অন্নদাসুন্দরী। তাইতো দেখা যায়, উত্তরকালে সন্তদাস বাবাজী মহারাজের সহধর্মিণীরূপে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছিলেন।

তখন ১৮৭৫ সাল। তারাকিশোর কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ্. এ. পড়তে আরম্ভ করলেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে, হিন্দুর আচার-আচরণ পরিত্যাগ করলেন। তিনি অবশ্য নিরামিষাশীই ছিলেন। পিতার নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন। বাধ্য হয়ে তারাকিশোর ব্যয়বহুল প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিত্যাগ ক'রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানে অধ্যাপক-রূপে পেলেন স্বনামধন্য স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সুরেন্দ্রনাথের ধর্মভক্তিহীন রাজনীতির প্রভাব তাঁকে ধীরে ধীরে অজ্ঞেয়বাদী ক'রে তুলেছিল। তারাকিশোর জন্মগ্রহণ করেছিলেন অসাধারণ মেধা নিয়ে। ত ইতো দেখা যায়, একদিকে মানসিক অশান্তি, অপরদিকে অর্থকষ্ট ও স্ত্রী সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা। কারণ বালিকাবধূর নির্যাতন বিমাতার হাতে বেড়েই চলছিল। এই অবস্থার মধ্যেও এফ্. এ পরীক্ষায় স্কলারশিপ নিয়ে উত্তীর্ণ হলেন। পরীক্ষার ফল ভাল

* 'শ্রীমদাচার্য সন্তদাস'- লেখক বিরজাকান্ত ঘোষ।

হওয়ায় পিতার ক্রোধের উপশম ঘটলো। আবার টাকা পাঠানো শুরু করলেন। আবার তারাকিশোর প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র পাল, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস ও স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রভাবে তিনি অজ্ঞেয়বাদী থাকতে পারলেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীমতেই ঈশ্বরোপাসনা করতে লাগলেন! অজ্ঞেয়বাদ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মসমাজের কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা, পত্রিকা পরিচালনা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি কর্মে জড়িত হয়ে, ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠলেন। পিতা হরকিশোর চৌধুরীও নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন পুত্রকে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য। সে সময় তারাকিশোর পটলডাঙ্গার একটি মেসে থেকে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছিলেন। হঠাৎ একদিন তাঁর পিতৃদেব এসে কলকাতায় উপস্থিত হলেন। তিনি রইলেন বাগবাজারে। পুত্রের সঙ্গে তাঁর অনেক কথা অনেক আলোচনা ও তর্ক হল। কিন্তু কিছুতেই যখন পুত্রকে নিজ মতে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না, তখন একদিন ক্রুদ্ধ চিত্তে 'দা' দিয়ে পুত্রকে কাটতে উদ্যত হলেন। তারাকিশোরও কিছুমাত্র ভীত না হয়ে দৃঢ় ও প্রশান্ত কণ্ঠে ক্রুদ্ধ পিতাকে বললেন, 'আমার শরীর আপনা হতে উৎপন্ন হয়েছে সত্য, কিন্তু আমার আত্মা আপনা হতে উৎপন্ন হয় নি। শরীরকে আপনি অনায়াসে বিনষ্ট করুন, কিন্তু যে পথে আত্মার কল্যাণ দেখছি সে পথ আমি পরিত্যাগ করতে পারবো না।'* পুত্রের দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পেয়ে পিতৃদেব সাময়িকভাবে শান্ত হলেন।

এইরূপ অন্তর-বাহির বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বি. এ. পাশ করবার পর ১৮৭৯ খ্রীঃ তারাকিশোর ব্রাহ্মনেতা আনন্দমোহন বসুর স্থাপিত সিটি স্কুলে শিক্ষকতার কার্যে ব্রতী হলেন। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে সহায়তা করা। অবশেষে এক ব্রাহ্মবন্ধুর অনুরোধে জয়নগর-মজিলপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু এ জীবনধারাও তাঁর মনঃপূত হলো না। অকস্মাৎ একদিন সেই স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দর্শন-

* যুগ-ভূমিকায় স্বামী সন্তদাস—লেখক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ; শ্রীমদাচার্য সন্তদাস—লেখক বিরজাকান্ত ঘোষ।

শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। এবং বিস্ময়কর মনন-শক্তির বলেই তিনি অল্পসময়ের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন ইংরাজী ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। আবার তিনি সিটি স্কুলে শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করলেন। তারপর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যখন সিটি কলেজ শুরু হোল, তারাকিশোর তখন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তিনি ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি প্রভৃতি সংস্কারমূলক কার্যে লিপ্ত ছিলেন। 'ভারতসভা' কর্তৃক মদ তৈরি করবার সরকারী খোলা ভাঁটি তুলে দেবার জন্য দেশে বিপুল আন্দোলন আরম্ভ হলো। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা হলেন নবীন যুবক তারাকিশোর চৌধুরী। এ সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িক সহকর্মী শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র বলেন, 'তারাকিশোরবাবু নানা গ্রামে গমন করিয়া জনসাধারণকে মদ্যপানের অনিষ্ট-কারিতা এবং ইহার বিরুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ বিরাট আন্দোলনের প্রয়োজন, তাহা বুঝাইয়া দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে খোলা ভাঁটি উঠিয়া গিয়াছিল।'

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যখন সিটি কলেজে আইন বিভাগ খোলা হোল, তখন অধ্যাপনা-কার্যের অন্তে তারাকিশোর আইন অধ্যয়ন শুরু করলেন। উকিল হয়ে ওকালতি ব্যবসায় করবেন, এরূপ কোন ইচ্ছা ছিল না। শুধুমাত্র পিতার অনুরোধ-রক্ষার্থে পড়া। ধর্ম বিষয়ে পিতার সঙ্গে মতভেদ থাকলেও পিতার প্রতি কখনও ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেন নি। ব্রাহ্মসমাজ যাকে কুসংস্কার বলে তা তিনি বর্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু স্বভাবসুলভ উদারতা ও বিনয় তিনি কোনদিনই বিসর্জন দেন নি।

হরকিশোর চৌধুরী এখন কাশীতে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পুত্র সংবাদ পেয়ে ছুটলেন কাশীতে। পিতার শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হলেন। পিতাও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস সঞ্চারিত হয় হৃদয়ের গভীরে। মনে মনে ভাবেন, এই পুণ্যতীর্থে কি পুত্রের মতিগতির পরিবর্তন করানো যায় না! অবশেষে এক কৌশল অবলম্বন করলেন। ডাক্তার বন্ধুবরের সঙ্গে পুত্রকে মঠ, মন্দির ও সাধু-সন্ন্যাসী দর্শনে পাঠাতে লাগলেন। মূর্তিপূজা-বিরোধী ব্রাহ্ম হলেও পিতার আদেশে দেবদেবীর মন্দিরে বিগ্রহ

দর্শন করতে আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। তিনি ত আর পূজা-অর্চনা করতে যাচ্ছেন না! দর্শন করলেন তৈলঙ্গ স্বামীকে, ভাস্করানন্দ স্বামীজীকে। ভাস্করানন্দ স্বামীজীর উপস্থিতিতে একদিন তাঁরই আশ্রমে, বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এক বিশিষ্ট হিন্দু পণ্ডিতপ্রবরের সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা ও শাস্ত্রবিচার এবং তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হলো। এই আলোচনা-সভার আয়োজন পুত্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য পিতারই এক কৌশল। পণ্ডিতজীর বিচার শুনে ভাস্করানন্দ স্বামীজী বললেন, 'বাঃ, আচ্ছা পণ্ডিত হ্যায়।' আবার তারাকিশোরের বক্তব্য শুনে বলে উঠলেন, 'ওয়হ্ অচ্ছী বাত কহতা হ্যায়।' উভয়কেই প্রশংসা করলেন। আর স্মিত হয়ে উঠলো মহাপুরুষের ওষ্ঠ। মুগ্ধ হন তারাকিশোর। অপরদিকে তৈলঙ্গ স্বামীজীও তারাকিশোরের মনের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন না। তবে ভাস্করানন্দ স্বামীজীর হাসিমাখা জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল তাঁর মনকে অনেকখানি দুর্বল ক'রে তুলেছিল। সিদ্ধযোগী পুরুষের ব্রহ্মানন্দময় জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি তাঁর জীবনস্মৃতিতে বহুদিন পর্যন্ত জাগরূক ছিল।

ইতিমধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনের অলৌকিক ঘটনার কথা শুনলেন। গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে ব্রাহ্মনেতা বিজয়কৃষ্ণ অলৌকিক-ভাবে দীক্ষাগ্রহণ করেন মানস সরোবরের এক সিদ্ধপুরুষের নিকট এবং তাঁর ভাবান্তরের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ ক'রে হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সাধনভজনে মনোনিবেশ করলেন গোস্বামী প্রভু। সেই ভাবান্তরের ঢেউ এসে লাগলো তারাকিশোরের মনোজগতে। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে ভাবতে লাগলেন, কোন্ সাধনার বলে এই মহাপুরুষরা এমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন? ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়ে তবে কি আমি ভুল করলাম? তারাকিশোরের অন্তর্জগতের আলোড়নের খবর পিতা হরকিশোর জানতে পারলেন না। তিনি দুঃসহ বেদনা নিয়ে আবার ফিরে চললেন গ্রামে। পুত্র তারাকিশোর কলকাতায় এসে আত্মনিয়োগ করলেন কর্মজীবনে।

তারাকিশোরের ব্রাহ্মবন্ধু মজিলপুর গ্রামের কালীনাথ দত্ত এক যোগী সম্প্রদায়ে গিয়ে গোপনে সাধনা করতেন। তিনি গুরুর শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হওয়া সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশকে সত্য বলে মানতেন। শুধু মানা নয়,

ব্যক্তিগত জীবনে গুরুলাভ ক'রে অনুভবও করেছেন। কৌতূহলী হলেন তরুণ ব্রাহ্মনেতা তারাকিশোর চৌধুরী। গোপনে কথা হলো তারাকিশোরের সঙ্গে কালীনাথ দত্তের। তারপর এক শুভদিনে কালীনাথ দত্ত তারাকিশোর চৌধুরীকে নিয়ে এলেন ভবানীপুরে যোগী শ্রীযুত জগৎচন্দ্র সেনের নিকটে। জগৎচন্দ্র সেন গৃহস্থ লোক, কর্মজীবনে ছিলেন অফিসের কেরানী। তারাকিশোর থাকতেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলেন তারাকিশোর। সেই সৌম্যমূর্তির পায়ের কাছে জীবনের সব অশান্তি নিবেদন ক'রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। গুরুরূপে বরণ করলেন যোগীপুরুষ শ্রীযুত জগৎ সেনকে। তারাকিশোর উচ্চাঙ্গের প্রাণায়াম ও ভজন করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাধনশক্তি ফুটে উঠলো তাঁর দেহে-মনে-আত্মায়। ষট্‌চক্রের রাস্তা খুলে গেল। আবার একদিন গুরুশিষ্যে বসলেন। তারাকিশোরের মূলাধার হতে দ্বিদল পর্যন্ত ছয়টি চক্রই ভেদ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তারাকিশোর আত্মনিয়োগ করলেন সাধন-ভজনে। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধুরাও এসে যোগ দিলেন এই যোগী সম্প্রদায়ে। এলেন নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও 'নাম' নিলেন শ্রীযুত জগৎ সেনের নিকটে। যোগীগুরু জগৎচন্দ্র সেন সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র দাস বলছেন, 'সেন মহাশয়ের চেহারা এত স্নিগ্ধ ও মধুর ছিল যে, ক্রুদ্ধ সর্পও তাঁর কাছে নত হয়ে পড়তো'।

এই যোগীসম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে সে সময় ধারণা প্রচলিত ছিল যে, একজন ফকির এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। আর মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই পুরীতে অন্তর্হিত হয়ে ফকিরবেশে বাংলায় এসে এই ধর্মসাধন গুপ্তভাবে প্রবর্তন করেছেন। ফকির প্রথমে শ্রীযুত রামকানাই ঘোষ নামে এক গৃহস্থকে শিষ্য করেন। এবং পরম্পরাসূত্রে শ্রীযুত জগৎ সেনের মাধ্যমে এই ধর্মসাধন গৃহস্থ-সমাজে প্রচলিত হয়। সুতরাং তারাকিশোর চৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাসম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থগুলিই পড়ে ফেললেন, এবং ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষি ও তাঁদের ধ্যান-ধারণা এবং বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি। ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি সুদৃঢ় না

হওয়ায় তা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর অন্তরের ধর্মপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করতে সমর্থ হলো না। তাইতো দেখা যায়, ইংরাজী শিক্ষিত তরুণ সত্যানুরাগীরা দলে দলে আসতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিভিন্ন হিন্দু যোগীগুরুর সন্নিধানে। তারাকিশোরও ছিলেন প্রকৃত সত্যানুসন্ধানী। তাই ব্রাহ্মধর্ম তাঁর মনের গভীরের দ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্যের নিরসন করতে সমর্থ হলো না। সকল তত্ত্বকঠিন ভাবনার পিপাসাকে মেটাতে পারলো না। নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা থেকে চলে এলেন সাকারে। নিরাকারে ছিল সমচেতনা। এবারকার সাকারে সমদৃষ্টি। সর্বত্রই সমদৃষ্টি। দেখলেন, সমস্ত জীবে ব্রহ্মের প্রতিভাস। অনুভব করলেন, ভগবানের বিচিত্র লীলা বিশ্বময়। অনন্তকে উপলব্ধি করবার জন্য মূর্তির প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করলেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করবার মানসে, সিটি কলেজে অধ্যাপকের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ব্রাহ্মধর্মের অপূর্ণতা ও শান্তিলাভের অযোগ্যতা প্রদর্শন ক'রে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় ১৮০৪ শকের ১লা আশ্বিন সংখ্যায় একখানি সুদীর্ঘ পত্রও প্রকাশ করলেন। এই পত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে ব্রাহ্ম সমাজে খুবই আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অধ্যক্ষ উমেশবাবু এজন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন।

চাকরি ত্যাগ করার পর সংসারের ব্যয়ভার-বহনের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার 'নোট' লেখা ও গৃহ-শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করলেন। তারপর একদিন আইন পরীক্ষা দিয়ে সস্ত্রীক ফিরে গেলেন গ্রামে। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি বিশেষ জটিল মামলা গ্রহণের অনুরোধ এলো পিতার নিকট থেকে। পিতার একান্ত অনুরোধে হাইকোর্ট থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে এই মামলা গ্রহণ করলেন। হবিগঞ্জ আদালতে মামলা সম্পন্ন হলো এবং কৃতিত্বের সঙ্গে জয়লাভ ক'রে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। শুরু হোল ওকালতি জীবন। পিতার আগ্রহাতিশয্যে তারাকিশোর এবারে এলেন শ্রীহট্ট শহরে। ওকালতি ব্যবসায় হলো জীবনের বৃত্তি। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শ্রীহট্টের উকীলদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করলেন। প্রচুর অর্থাগম হতে থাকলেও, যোগী সম্প্রদায়ের সাধনের প্রতি তাঁর অবিচলিত অনুরাগ ছিল বলে নিয়ম করলেন সন্ধ্যার পর আর মামলা সংক্রান্ত কোন কাজ করবেন না। সভা ক'রে ভগবদ্গীতা ও

চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। শহরের অনেকেই আকৃষ্ট হলেন। ক্রমে ক্রমে বহু লোকসমাগম হতে লাগলো। ধর্মপিপাসুদের জীবনে নূতন ক'রে প্রাণের সঞ্চার হলো। অবশেষে শ্রীহট্টের বৈষ্ণব সমাজও ধর্মসভায় যোগদান করলেন। সঙ্কীর্তন ও পদাবলী গানের ব্যবস্থা করলেন। সঙ্কীর্তনে তারাকিশোরও মেতে উঠলেন। তারাকিশোরের প্রেরণায় সরকারী কর্মচারী, উকীল, মোক্তার, দোকানদার, ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকলেই এই কীর্তনে যোগ দিলেন। নেচে উঠলো, মেতে উঠলো শ্রীহট্ট শহর। হরিনাম গানে আর ভক্তিসুধাদ্রাবিত মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মুখরিত ক'রে তুললেন তারাকিশোর শ্রীহট্ট শহরকে। এইভাবে চার বৎসর শ্রীহট্টে লীলা ক'রে তারাকিশোর চলে এলেন কলকাতা শহরে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। আইন ব্যবসায় শুরু করলেন কলকাতা হাইকোর্টে। এই শ্রীহট্ট শহরে থাকাকালীনই তাঁর একটা কন্যা সন্তান মৃত অবস্থায় প্রসূত হয়েছিল। স্ত্রী অন্নদাদেবীও নানা অসুখে ভুগছিলেন। এর পূর্বে বা পরে তাঁর আর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। হাইকোর্টের উকীল হয়েও তিনি শ্রীহট্টের মতই দিনের বেলায় বৈষয়িক কর্ম সম্পন্ন ক'রে, সন্ধ্যার পর হতে ভজনে মগ্ন হতে লাগলেন। যোগীসম্প্রদায়ের এই সাধন তারাকিশোরকে যথেষ্ট আনন্দ ও শক্তি দিয়েছিল সত্য, কিন্তু এতে তাঁর তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নি। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, ব্রহ্মানন্দ-লাভ এখনও যে তাঁর হলো না! আর এই পথে যে চরম অভীষ্টলাভ হবে, গভীর অনুভূতিসম্পন্ন তাঁর মন স্বীকার ক'রে নিতে পারলো না। তাইতো তাঁর অন্তর সদ্‌গুরুলাভের তৃষ্ণায় আকুল হয়ে থাকতো। এই সময়কার মানসিক অবস্থার কথা তিনি নিজেই বলছেন, 'আমার অবলম্বিত এই সাধনে শক্তি প্রকাশিত হয়, এটা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। তাছাড়া, এর দ্বারা একপ্রকার ভাবাবেশ হয়ে থাকে তা বড়ই মধুর, এটাও আমি বহুবার দেখেছি। এই অর্জিত শক্তি দিয়ে আমি শুধু মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে নিজে রোগীকে রোগমুক্ত করেছি। আমার দর্শনমাত্র হিষ্টিরিয়া রোগীর মূর্ছারোগ দূর হয়েছে, এমনও কখন কখন ঘটেছে। আমাকে স্পর্শ ক'রে অনেকে ভাবাবিষ্ট হয়েছে, মূর্ছিত পর্যন্ত হয়ে পড়েছে, এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এ সকল শক্তি আমার আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মদর্শনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত

করেনি। অতএব এই সাধন অবলম্বনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না, এটা আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করলাম। এজন্য আমাকে অন্য উপযুক্ত গুরু গ্রহণ করতে হবে, তা নিশ্চিতরূপে বুঝলাম। সুতরাং যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন এবং যাঁর কৃপায় আমি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারি, এমন সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাওয়া আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাই সদ্‌গুরুলাভের চিন্তায় বড় ব্যাকুল হলাম।'

অসীমের পিপাসায় মনপ্রাণ যখন ব্যাকুল, তখন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। গ্রীষ্মকালে এক ছুটির দিনে রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে ঘর থেকে বের হয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে চললেন তারাকিশোর কিসের যেন এক প্রেরণায়। গঙ্গাতটের এক নিরালায় এসে বসলেন। প্রবল আর্তি ও ক্রন্দনে সমস্ত অন্তর তাঁর মথিত হয়ে উঠলো। গঙ্গার দিকে চেয়ে মনের গভীরের বেদনার কথা কাতর কণ্ঠে নিবেদন করলেন। —'মাগো! ত্রিতাপনাশিনী কলুষহারিণী বলে তোমার প্রসিদ্ধি। কিন্তু মা, আমার পাপ কি এতই বেশী যে তোমার ত্রিলোকপাবনী ধারা তা শুদ্ধ করতে পারবে না!' অসাধারণ ব্যাকুলতা ও আর্তি সহকারে আত্মনিবেদনের ফলস্বরূপ তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো স্বয়ং গঙ্গাদেবী ও মহেশ্বর। তারাকিশোরের ভাষায়,* 'আমার চক্ষুর সম্মুখে হিমালয়ের যে স্থান হইতে গঙ্গা উদ্ভূত হইয়াছেন, সেই মূল গঙ্গোত্রী গোমুখী স্থান হঠাৎ প্রকাশিত হইল এবং সেইস্থানে বিরাজমান উমা মহেশ্বর দেবও আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি বিস্মিত হইয়া ঐ স্থান ও তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম। অতঃপর মহেশ্বর একাক্ষরী বীজমন্ত্র আমাকে উপদেশ করিলেন এবং এইরূপ জ্ঞাপন করিলেন যে, মন্ত্রজপের দ্বারা আমি যথার্থ সদ্‌গুরু লাভ করিব। পরমুহূর্তেই হরগৌরী এবং সেই গঙ্গোত্রীর স্থানের দৃশ্য আমার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। আমি যে স্থানে বসিয়া ছিলাম, সেই স্থানেই গঙ্গাজীকে সম্মুখে দেখিলাম। তখন আমার অন্তঃকরণে অতিশয় আনন্দের ধারা বহিতে লাগিল। নৈরাশ্যের ভাব দূর হইল। সদ্‌গুরুলাভ বিষয়ে আশান্বিত হইলাম।'

* শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবনচরিত—লেখক শ্রীমৎস্বামী ধনঞ্জয় দাসজী মহারাজ

স্বয়ং মহেশ্বরের নিকট হতে মন্ত্রলাভ ক'রে তারাকিশোরের মনের আকুলতা সাময়িকভাবে শান্ত হলো। তীর্থ পর্যটনের সংকল্পও পরিত্যাগ করলেন। আদর্শ গৃহীরূপে ওকালতি ব্যবসায়ে লিপ্ত রইলেন। বিকাশোন্মুখ একটি হৃদয়ের সুন্দর ক্রমবিন্যাস রক্ষা ক'রে এক অদৃশ্য শক্তির্ণ যেন তাঁকে পূ পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছেন। সবকিছুর মূলেই সেই আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ। যে শাস্ত্রকে একদিন যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় বলে অস্বীকার করেছিলেন, সেই শাস্ত্রকে আবার যথার্থ যুক্তিপূর্ণ বলে স্বীকার ক'রে নিতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হোল না। তর্কসভা ও আলোচনার মাধ্যমে নয়, শুধুমাত্র হৃদয়ের উপলব্ধির মধ্য দিয়েই সবকিছু স্বীকার ক'রে নিলেন। এখানে তো কোনও প্রতিপক্ষ নেই। এই প্রসঙ্গে সন্তদাস বাবাজীর জীবনীকার শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী বলছেন, 'অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় সর্ববিধ বাহ্য ব্যবহারের অন্তরালে শ্রীযুত বাবাজী মহারাজের চিত্তে সাধারণতঃ বহিঃপ্রকাশহীন ঊর্ধ্বমুখী এক চিন্তাস্রোত সর্বদা বহমান ছিল। ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাই অতীতে দেবদ্বিজে ভক্তিমান পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তানকে আচারভ্রষ্ট একেশ্বরবাদী এমন কি নিরীশ্বরবাদী করিয়াছিল। নিরীশ্বরবাদী শুষ্ক তার্কিককে ভজনশীল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মকে যোগী করিয়াছিল। ইহাই আবার আজ তাহাকে এক নূতন পরিবর্তনের দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। বাস্তবিক এই আভ্যন্তরিক জীবনস্রোতের ক্রমিক পরিণতির ইতিহাসই তাঁহার প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত।' এই ঘটনার তিন বৎসরের মধ্যেই সদ্‌গুরু তাঁর জীবনে আবির্ভূত হলেন। ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা হলেন তাঁর দীক্ষাগুরু, পারমার্থিক আশ্রয়দাতা। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে এ ঘটনা অভূতপূর্ব। শুধু বিস্ময়কর নয়, অলৌকিক। যুক্তিবাদী ইংরাজী-শিক্ষিত অ্যাডভোকেট তারাকিশোর চৌধুরীর নবজন্ম লাভ হলো। ধীরে ধীরে তিনি ভক্তিমার্গাবলম্বী বৈষ্ণব সাধকে রূপান্তরিত হলেন। তাঁর জীবনে এই গুরুকৃপার রহস্য অতি গভীর, সাধারণ বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।

দীক্ষা গ্রহণের পরও প্রায় বিশ বছর তিনি সাফল্যের সঙ্গে হাইকোর্টে ওকালতি করেন। তারাকিশোরের এই সময়কার জীবনচর্যা সম্বন্ধে তাঁর

সমসাময়িক ও সহকারী হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শরৎচন্দ্র খাঁ বলছেন, 'শেষ রাত্রে উঠিয়া প্রায় সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি সাধনভজন করেন। যারা কেবল সংসারের কাজ করে, তারা প্রাতঃকালে যে সময়ে সংসারের কাজ আরম্ভ করে, তিনিও সেই সময়ে ওকালতি আদির কাজ আরম্ভ করিয়া সমস্তদিন সম্পূর্ণ সাংসারিকের ন্যায় সংসারের কাজ করিতেন। প্রথম রাত্রেও যে সাধনভজন করিতেন, তাহাতে সংসারের কাজের কোন ক্ষতি হইত না। যাহারা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিত না, তাহাদের জানিবার উপায় ছিল না যে, তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দীর্ঘ সময় সাধনভজন করেন। তাঁহার চেয়ে যাঁহারা অনেক অল্পসময় সাধন ভজন করেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট সূর্যোদয়ের আধঘণ্টা এক ঘণ্টা পরও কেহ কাজের জন্য যাইলে শুনিতে পায় যে,—'বাবু আহ্নিক করছেন, একটু বসুন।' কিন্তু তাঁহার নিকট খুব প্রত্যূষে কেহ কোন কাজের জন্য যাইলেও দেখিতেন যে, তিনি ওকালতির আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার এই চরিত্র আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, সংসারী লোক ইচ্ছা করিলে সমস্ত দিন সংসারের কাজ করিয়াও সাধনভজনের জন্য যথেষ্ট সময় পাইতে পারে।···· তাঁহার অতিপ্রাকৃত জীবনের বিশেষত্ব ছিল এই যে, সাংসারিক কাজকে ভগবৎসেবা মনে করিয়া তিনি প্রীতির সহিত ঐ সকল কাজ করিতেন। সাংসারিক কাজে এই ভগবৎসেবার ভাব মনে রাখিবার চেষ্টা করিতে তিনি আমাদের উপদেশ সর্বদাই দিতেন।'

ওকালতি ব্যবসায়ে নাম যশ অর্থ উপার্জন করতে হলে যেরূপ প্রতিভা ও কর্তব্যনিষ্ঠা থাকা উচিত, সে সমস্ত গুণেরই অধিকারী ছিলেন তারা-কিশোর। নাম-যশও হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরূপে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছিলেন। কিন্তু অর্থচিন্তা তাঁর বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে ধর্মচিন্তাকে ব্যাহত করতে পারেনি। সংসারলীলায় সহধর্মিণী অন্নদাসুন্দরী দেবীও পরমার্থলাভে বাধা না হয়ে বরং প্রেরণাই জুগিয়েছেন। তাঁর অর্থ-উপার্জনও শুধুমাত্র নিজের ও স্ত্রীর জন্য ছিল না। ছিল রবাহূত অনাহূত সকলের জন্য। বিমাতা, বৈমাত্রেয় ভাই থেকে আরম্ভ ক'রে কত যে আত্মীয়-অনাত্মীয়-পরিজন নিয়ে এক বিরাট সংসারের অন্নদাতা, শিক্ষাদাতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের কর্তা হয়েছিলেন! আর সকলের ভরণ-

পোষণের জন্যই ছিল তাঁর অর্থ উপার্জন। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব গণিতের প্রধান অধ্যাপক রায়বাহাদুর সারদাপ্রসন্ন দাস বলছেন,* 'শ্রীমৎ সন্তদাসজী তাঁহার গৃহস্থ জীবনে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার পর্যালোচনা করিলে শিক্ষিত ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেই পরম উপকৃত হইবেন। তাঁহার দার্শনিকতা এবং শেষজীবনের বৈরাগ্য ও তীব্র সাধনভজন অতি অল্প লোকেই অনুসরণ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া ইহকাল পরকালে কল্যাণ লাভ করিতে পারেন। তাঁহার বাড়ীটি ছিল যেন ঠাকুরবাড়ী এবং নিত্যনৈমিত্তিক ও বৈষয়িক সকল কর্মই তিনি ভগবৎসেবার অঙ্গীভূতরূপে সম্পন্ন করিতেন।··· তিনি বহুলোকের অন্নদাতা ছিলেন। কিন্তু আমি অন্নদান করিতেছি, এরূপ অভিমান ছিল না।'

বরিশালের শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মহিন্তা বলছেন, 'তারাকিশোরবাবুর বাড়ী গিয়া অনেক সময়ই আমার মনে হইত কোন মঠ বা আশ্রমের ভিতর আছি। ঠাকুর ঘরে শ্রীশ্রীশালগ্রামদেব ও শ্রীশ্রীকাঠিয়াবাবাজী মহারাজের চিত্রপট ছিল। ঠাকুরের দৈনিক সেবাপূজা হইত।'

প্রথম প্রথম অবশ্য ঠাকুরসেবা নিয়মিতভাবে হোত না। বাসার চাকর ছিল তুলারাম। লোকটি ছিল সরল প্রকৃতির। রোজ সন্ধ্যেবেলা তুলসীতলায় ধূপ দিত। একদিন সন্ধ্যেবেলা তুলসীতলায় ধূপবাতি দেবার সময় ভয় পেয়ে ছুটে এলো অন্নদাদেবীর কাছে। তারপর বললো সবকিছু। কাঠিয়াবাবার চিত্রপটের চেহারা-বিশিষ্ট এক সাধু রাগান্বিত হয়ে তার হাত থেকে ধূপদানী কেড়ে নিয়ে বললেন,—'সন্ধ্যার সময় নিয়মিত আরতি কর না কেন?'

অন্নদাদেবী সবকিছু শুনে বিস্মিত ও অভিভূত হলেন, মুখে প্রকাশ করলেন না, তবে নিয়মিতভাবে ঠাকুরের সেবা পূজা ও আরতির ব্যবস্থা করলেন।

তারাকিশোরের আইনজ্ঞান ও ওকালতি প্রতিভা সম্বন্ধে বলছেন বিপিনচন্দ্র পাল, 'সমসাময়িক আইনজীবীদের কারো কারো মত অত বেশী উপার্জন তাঁর না থাকলেও, শ্রেষ্ঠ আইনজীবীদের অন্যতম বলে তিনি গণ্য হতেন। তাঁহার সহকর্মীদের অনেকের মতে উকিল হিসাবে স্যার

* 'শ্রীসুদর্শন পত্রিকা'—১৩৪৬ সালের কার্তিক সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাসবিহারী ঘোষের পরেই ছিল তাঁহার স্থান। কিন্তু উপার্জন বিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য আইনজীবীদের মত সাফল্যলাভে সক্ষম হন নি, তার কারণ ওকালতি কাজের জন্য তিনি কখনই নিজের নিয়মিত সাধনভজনের ব্যাঘাত হতে দিতেন না।'

একটি জটিল মামলা প্রসঙ্গে বলছেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ, 'এই কঠিন মোকদ্দমায় তারাকিশোর আপীলাণ্ট পক্ষে যেরূপ সুন্দর সওয়াল জবাব করিয়াছেন, এ কাজে আমাকে নিযুক্ত করিলে আমিও সেরূপ করিতে পারিতাম না।'

আইনজীবী ব্রজলাল শাস্ত্রী বলছেন, 'তিনি উদাসীন প্রকৃতির হলেও ওকালতি কার্যে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ও পারদর্শিতা ছিল।'

তারাকিশোর প্রতিভাবান আইনজীবী, এই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন চরিত্রবান আদর্শনিষ্ঠ আইনজীবী—এই ছিল তাঁর সত্যকার পরিচয়।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন, বাংলা ১৩০৪ সালের ৩০শে তারাকিশোর বৃন্দাবনে কাঠিয়াবাবার আশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে শ্রীশ্রীরাধা-বিহারী জীউর যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

আবার সেই রাত্রি প্রভাত! নব-ঊষা!

চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে যেন বয়ে চলে মধুর তরঙ্গ। অকস্মাৎ বলে ওঠেন শিষ্য তারাকিশোরকে রামদাস কাঠিয়াবাবা, 'বাবুজী, একটি কথা শোনো। তুমি যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছো, তিনি অতি জাগ্রত। তুমি তাঁর কাছে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করো।'

মৃদু হেসে বললেন, তারাকিশোর,—'আপনি প্রসন্ন থাকলে আমার আর কোনো বরের প্রয়োজন নেই।'

'তুমি ঠিকই বলছো, কিন্তু তোমার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরজীকে একবার পরীক্ষা করে দেখবে না? যাও এই সময় গিয়ে বর চেয়ে নাও।'

গুরুর আদেশকে উপেক্ষা করতে পারেন না তারাকিশোর। মুহূর্তের ভাবনায় বিহ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মন। ধীরে ধীরে এগিয়ে যান বিগ্রহের

* 'Memories of My Life and Times' by Bepin Chandra Pal.

সম্মুখে। দুই চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। কি চাইবেন ঠাকুরজীর কাছে? মনে মনে ভাবেন। বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকেন বিচিত্র এক প্রভায় যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছে ঠাকুরটির মুখমণ্ডল। থর থর করে কেঁপে ওঠে তারাকিশোরের দেহ-মন-আত্মা। অন্তর হতে নিঃসৃত হয় গীতার শ্লোক।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমং সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ *

তারাকিশোরের কণ্ঠনিঃসৃত সেই মধুর আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হলেন কাঠিয়াবাবা। মৃদু হেসে বললেন, 'বাবা, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ঋদ্ধি সিদ্ধি সব্ মিলবে, মহন্তপদও মিলবে। ভগবদ্দর্শনও হবে।'

অভিভূত তারাকিশোর মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন গুরু শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবাজীর চরণে। যেন নবজন্ম লাভ করলেন। এইভাবে তারাকিশোরের জীবনে অধ্যাত্ম-অনুভূতির দরজা একে একে খুলে যেতে লাগলো। মনে মনে স্থির করলেন, এবার তিনি সংসার ছেড়ে গুরু মহারাজের চরণেই আশ্রয় নেবেন। এই ঘটনার পর থেকে আদালত ছুটি হলেই বৃন্দাবনে এসে অতিবাহিত করেন তারাকিশোর। এই প্রসঙ্গে গুরু কাঠিয়াবাবা শিষ্য তারাকিশোরকে একদিন বললেন, 'বাবা, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ক'রে উপযুক্ত সাধনাদি করলে নানাবিধ অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়। আর গৃহস্থাশ্রমে সেই সমস্ত শক্তি সচরাচর লাভ করা যায় না, এই তফাৎ। কেবল গুরুকৃপাতেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়, এই বিষয়ে উভয় আশ্রমই তুল্য।'

* * *

আর একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠলো তারাকিশোরের জীবনে। হৃদয়তন্ত্রীতে অপূর্ব রাগিণী যেন বেজে উঠলো! এক তন্ময়ভাবে মগ্ন হলেন।

---

* অনুবাদ। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক বা অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। আমি যাহা এবং যেরূপ তাহা সেই পরাভক্তি প্রভাবে সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারেন। আমি কে, আমার সমগ্র স্বরূপ কি এবং এইরূপ জানিয়া আমাতেই প্রবেশ করে।

ধীরে ধীরে চক্ষুও মুদ্রিত হয়ে এলো। অন্তরে এক উদ্দীপ্ত তেজ অনুভব করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন এক অভূতপূর্ব মহানন্দরসে মগ্ন হয়ে পড়লেন। এবং ভিতর-বাইরে সর্বত্রই এক আনন্দ-রাজ্যের অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগলেন। আরও অনুভব করলেন, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্যলাভ ক'রে চক্রগুলি পরিভ্রমণ করতে করতে ঊর্ধ্ব গমন ক'রে সহস্রারে পরম শিবের সঙ্গে মিলনের পথে কোথায় যেন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সে বাধাকে অতিক্রম করতে কিছুতেই সক্ষম হচ্ছে না। আকুল প্রাণে নিবেদন করলেন, গুরু মহারাজ মহাত্মা কাঠিয়াবাবার নিকট। তারাকিশোরের ভাষায়, "আমার হৃদয় প্রদেশে কুণ্ডলী শক্তি পঁহুছিয়া তথায় আঘাতপ্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া আমি শ্রীযুত বাবাজী মহারাজকে বলিলাম, 'মহারাজ আমার বুকের ভিতরে শক্তি বাধিয়া যাইতেছে।' তিনি বলিলেন, 'হাঁ, হুঁয়া কমল হ্যায়, ওয়ে রোক্ দেতা হ্যায়।' আমি বলিলাম, 'মহারাজ! এই বাধা আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছাড়াইয়া দিন্।' তাহাতে তিনি আমাকে খুব ধমকাইয়া বলিলেন, 'আমি ছাড়াইয়া দিব না।' তাঁহার এইরূপ উত্তরের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আপনা হইতে বলিলেন, 'এক্ষণে যদি তোমার হৃদয়ের এই গ্রন্থি আমি ছাড়াইয়া দেই, তবে তোমার দ্বারা আর কোন কার্যই হইবে না। তোমার সংসারে অনেক কার্য করিতে হইবে। সময়ানুসারে ইহা ছাড়াইয়া দিব।' *"

সত্যসত্যই তিনি সংসারাশ্রম থাকাকালীন কর্মযোগী রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। গুরু মহারাজের প্রেরণাতেই তিনি দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—(১) ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা, (২) দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা, প্রথম খণ্ড, (৩) দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা, ২য় খণ্ড (সভাষ্য পাতঞ্জল দর্শন), (৪) দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা, তৃতীয় খণ্ড (শ্রীনিম্বার্কাচার্যকৃত ভাষ্যসহ বেদান্তদর্শন)। এই গ্রন্থসকল রচনা করবার সময়ই তিনি কাঠিয়াবাবার আশ্রমের সন্নিকটে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। প্রায় সাত বছর ধরে ধীরে

* শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজীর জীবনচরিত, (৭ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৭)—লেখক স্বামী সন্তদাসজী মহারাজ ব্রজবিদেহী।

ধীরে কাজে অগ্রসর হয়ে ১৩২২ সালে ইহা সম্পন্ন হয়। এই নূতন আশ্রমই পরবর্তী কালে 'নির্বাক-আশ্রম' নামে লোকসমাজে পরিচিত হয়। পুরোনো আশ্রম হতে শ্রীশ্রীরাধাবিহারী জিউকে নূতন আশ্রমে এনে মহসেমারোহে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পূর্বেই ১৩১৬ সালে শ্রীশ্রীকাঠিয়াবাবা দেহলীলা সংবরণ করেছিলেন। নূতন আশ্রমে গুরুদেবকে এনে বসাবার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তারাকিশোরের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।

এই আশ্রমটির জন্য তিনি ত্রিশ হাজার টাকার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে কখনও কখনও এমন হতো যে ঘরে এক মুষ্টি চালও নেই, অথচ বেলা দশটার মধ্যে অনেকগুলি লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে—চল্লিশ-পঞ্চাশজন দরিদ্র ছাত্র ও বহু আত্মীয়স্বজন যে দু'বেলা আহার করেন। এমনই এক দুরবস্থার দিনে নিরুপায় অন্নদাসুন্দরী জিজ্ঞেস করলেন স্বামীকে। তারকিশোর মৃদু হেসে বললেন, "কাঠ ত আছে, উনুন জ্বেলে ডালভাতের জল চড়াও! তোমার কর্তব্য তুমি কর। যদি ঠাকুর দেন ভাল। আর যদি না দেন, হাত জোড় করে সকলকে বলে দেবে, 'ঠাকুর কিছু দিলেন না'।"

অভাবনীয় ঘটনা, কিছুসময়ের মধ্যেই এক মক্কেল এলেন অর্থ নিয়ে। বেলা দশটার মধ্যে রান্নাও প্রস্তুত হলো। সকলেই তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। এমন একদিন নয়, অন্নদাসুন্দরীর সংসারে বহুদিন ঘটেছে এমন ঘটনা। আজীবন সঙ্গিনী অন্নদাসুন্দরী দেবী ছিলেন স্বামীর অধ্যাত্মজীবন-লাভের প্রেরণা। ইষ্ট-নিবেদিত অন্নদাসুন্দরী ও তারাকিশোরের মধুর দাম্পত্য সম্বন্ধ পরস্পর অনুকূল জীবনসাধনার কষ্টিতে আরও উন্নতোজ্জ্বল রসপর্যায়েই উন্নীত হয়েছিল।

তারাকিশোর নিজের সংসারকে বলতেন. 'ঠাকুরের সংসার'। 'যত্র আয়, তত্র ব্যয়'। এই ছিল ঠাকুরের সংসারের রীতি। কিন্তু গৃহকর্ত্রী অন্নদাদেবীরও ঝামেলা কম ছিল না। নিত্যবিগ্রহের সেবা, সাধু-সন্ন্যাসীদের অভ্যর্থনা, অতিথি-ভোজন ও পরিবারের সকলের আহারের ব্যবস্থা। বিগ্রহসেবা ও গৃহের পোষ্যদের দায়িত্বের কথা ভেবে একবার অন্নদাসুন্দরী কিছু অর্থ সঞ্চয় ক'রে রাখেন। ফল হোল বিপরীত। সংসারের অর্থকষ্ট যেন বেড়েই চলতে লাগলো। যখন সংসারের নিম্নগামী গতি চরম সঙ্কটের মুহূর্তে এসে উপস্থিত

হলো, তখন চিন্তিত হলেন তারাকিশোর। ঠাকুরের সংসারে ত বিঘ্ন ঘটবার কথা নয়। তবে কেন এমন হচ্ছে? মনে মনে ভাবেন, আর কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেন। অবশেষে জানতে পারলেন, গৃহিণী অন্নদাসুন্দরী পুঁটুলীতে একশত টাকা জমিয়ে রেখেছেন। তারাকিশোর তিরস্কার ক'রে গৃহিণীকে বল্লেন, 'দেখ, এই জন্যই ঠাকুর আমায় টাকাকড়ি দিচ্ছেন না। একটা কথা সর্বদাই মনে রেখো—ফকিরীতেই ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়, ফিকিরীতে নয়।'

দিন সপ্তাহ মাসের পর মাস চলে যায়। ক্রমশঃ প্রতি দিবসের শৃঙ্খলও যেন আলগা হয়ে আসে তারাকিশোরের জীবনে। গৃহত্যাগের জন্য স্থির সঙ্কল্প করলেন। সবকিছু ব্যবস্থাদির পর নিশ্চিন্ত হয়েছেন তারাকিশোর। কিন্তু রাত্রিতে শয়নঘরে প্রবেশ ক'রে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে দেখলেন অখিল-রসানন্দ লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে। ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে তারাকিশোরের অন্তর যে মুগ্ধ হয়ে উঠছে, আর অন্তরের সেই মুগ্ধতাকে প্রতিরোধ করবার শক্তিও যে তিনি হারিয়ে ফেলছেন। এক অনির্বচনীয় আনন্দসাগরে তিনি যেন অবগাহন করতে লাগলেন!

এই অতীন্দ্রিয় দর্শন প্রসঙ্গে তারাকিশোর বলছেন, 'তখন আমার হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল, সমস্ত জগৎকে আনন্দময় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। অবশভাবে অশ্রুপূর্ণনেত্রে শ্রীভগবানকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, তিনি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। আমার অন্তরে আনন্দস্রোত তখনও বহিতে লাগিল। কয়েকদিনই সেই স্রোত চলিয়াছিল। সংসার দুঃখময়, অতএব পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হওয়াতে আমার যে তীব্র বৈরাগ্য আসিয়াছিল, সমস্ত সংসারকে আনন্দময়রূপে দর্শন করিয়া আমার সেই ভাব আর রহিল না। বরঞ্চ আমার শয়নকক্ষেই যে তিনি দর্শন দিয়াছেন, ইহাতে আপাততঃ আমার সংসারে অবস্থানই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইবার ইচ্ছাও ইহার ফলে তিরোহিত হইয়া গেল, এবং পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।' আবার একদিন তারাকিশোর এলেন বৃন্দাবনে। শয়নঘরে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ইতিবৃত্ত বললেন গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীকাঠিয়াবাবাকে।

কাঠিয়াবাবা সবকিছু শুনে বললেন, 'ইয়ে দর্শন বহুৎ ভাগ.সে মিলতা হ্যায়। লেকিন্ ইয়ে দর্শন ছায়া দর্শন হ্যায়, ইস্‌কে পিছে ঔরভী দর্শন হ্যায়।'—এই প্রকার দর্শন পরম সৌভাগ্যের ফলেই সম্ভব হয়। কিন্তু এটা ছায়াদর্শন মাত্র। এর পরেও বহুতর দর্শন রয়েছে।

ব্রজমণ্ডল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোক্ত আদর্শ জীবন অনুসরণ ক'রে তারাকিশোর ব্রজপ্রবেশের ব্রজপরিক্রমার অধিকারী হলেন। ব্রজবাসের যোগ্যতা নিয়েই যেন তিনি ব্রজে প্রবেশ করলেন। ব্রজবিদেহী মহন্ত গুরু মহারাজ কাঠিয়াবাবার নেতৃত্বে ও অন্যান্য বৈরাগী সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গে সস্ত্রীক তারাকিশোর চৌরাশীক্রোশ বন-পরিক্রমায় বহির্গত হলেন। শ্রীবৃন্দাবন থেকে যাত্রা ক'রে মথুরায় উপস্থিত হয়ে শ্বেতমূর্তি ভূতেশ্বর মহাদেব দর্শন ক'রে বনযাত্রা আরম্ভ হলো। পথে চারিদিকেই ব্রজসুলভ গাছ লতাপাতা। কানে ভেসে আসে ময়ূরের ডাক। কণ্টকাকীর্ণ পথ, কিন্তু আনন্দপূর্ণ। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল এই ব্রজভূমি যে তাঁদেরই স্মৃতিবিজড়িত। কোথাও শ্রীকৃষ্ণজীর চূড়া পড়েছিল, আবার কোথাও রাধারাণীর নূপুরের চিহ্ন বর্তমান। কোথাও আবার বলদেব মধু পান করেছিলেন। সমস্ত লীলাস্থানই আনন্দাশ্রুর উৎসস্বরূপ। এই বিষয়ের জগতের ঊর্ধ্বে যে এক আনন্দলোক আছে, এ যেন তারই ইঙ্গিত! সাধারণ গৃহী মানুষ, সাধু সন্ন্যাসী সকলেই সেই পরমানন্দের আভাস পেয়ে আনন্দাশ্রু মোচন করেন। গৃহী বৈরাগী তারাকিশোরের দুই গণ্ড বেয়েও অশ্রু নির্গত হতে লাগলো। রাধাকৃষ্ণ-ভাবানামৃত তারাকিশোরের মনের মাটিকে সিক্ত করে তুললো, জীবনের সকল তত্ত্বকঠিন ভাবনার পিপাসাকে দিল মিটিয়ে। এক অপূর্ব মাধুর্যরসে আপ্লুত হয়ে উঠলো দেহ-মন-আত্মা। 'রসো বৈ সঃ'—এ যে সেই রসরাজেরই অপ্রাকৃতলীলা দর্শন।

এইভাবে বিচিত্র সব লীলাস্থান দর্শন করতে করতে মধুবন, বহুলাবন, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড নন্দগ্রাম গিরিগোবর্ধন কামবন কোশী আনন্দীবন্দী দাউজী গোপালঘাট—অতিক্রম ক'রে চলতে লাগলেন—

—বসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হয়ে এই ঘাটেই এসে গোকুলে গিয়েছিলেন।

গ্রামের পথে চলতে চলতে হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো অনেকগুলি গ্রাম্য বালক। ঘিরে ধরলো তারাকিশোরকে। জিলাপী খাওয়াতেই হবে। তারাকিশোরও আনন্দিত চিত্তে নিকটবর্তী দোকানীকে গরম গরম জিলাপী ভাজতে আদেশ করলেন। বালকদের এক মেলা বসে গেল। সাধু, সন্ন্যাসী ও অন্যান্য গৃহী ভক্তদের ছেড়ে তারাকিশোরকেই ওরা যেন পেয়ে বসলো। হঠাৎ কোথা থেকে দুজন অপূর্বদর্শন বালক ছুটে এসে বললো, 'বাবুজী, এরা সব দুষ্ট বালকের দল, তুমি জিলাপী আমাদের দুজনকে দাও, আমরা সকলকে ভাগ ক'রে দেবো।' আর সত্য সত্যই ঐ দিব্যদর্শন বালকদ্বয় চঞ্চল বালকদের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে জিলাপীগুলি ভাগ ক'রে দিলো। ঐ বালকদ্বয়ের ব্যবহারে ও রূপদর্শনে মুগ্ধ হলেন তারাকিশোর, মনে মনে ভাবেন—কি অপরূপ! এতো সাধারণ মানুষের রূপ নয়। এমন রূপ ত বালগোপালেরই ছিল। নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ছদ্মবেশে এসেছেন। অলৌকিক ঘটনা—পরমুহূর্তেই বালকদ্বয় কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আর দেখা গেল না ওদের ঐ দুষ্ট বালকদের দলের মধ্যে। ব্যাকুল হোল তারাকিশোরের মন। কাঠিয়াবাবাজী সবকিছুই লক্ষ্য করছিলেন। তারাকিশোরের মানসিক অবস্থা দেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তখন তারাকিশোর তাঁর নিজের অন্তরের প্রতিটি স্পন্দনে অনুভব করতে লাগলেন এ সব শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের লীলা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রেমাশ্রু নির্গত হতে লাগলো। অনির্বচনীয় আনন্দসাগরে অবগাহন করতে লাগলেন।

আবার যাত্রা হোল শুরু। যাত্রীদের জিনিসপত্র নিয়ে বয়েল গাড়ী চলতে লাগলো। কেউ কেউ ডুলি পাল্কি ও অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন। আবার অসংখ্য যাত্রী বৈরাগী সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তের দল কম্বল বিছানা কাঁধে ক'রে হাতে লাঠি নিয়ে চলছেন পদব্রজে। মহন্ত মহারাজ কাঠিয়াবাবাজী দলের নেতা, চলেছেন একখানি পাল্কি ক'রে। তার পিছু পিছু চলেছেন অন্যান্য যাত্রীর দল। দলনেতা ব্রজবিদেহী মহন্ত সম্পত্তিশালী ব্যক্তি নন। তিনিও বৈরাগী সাধু। বনযাত্রার পথে মমতাসহ বসতির বাইরে বৃক্ষাদি বা আকাশের নীচে বিশ্রামস্থল স্থির করে, কোথাও এক রাত্রি, আবার কোথাও একাধিক রাত্রি বাস ক'রে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলগুলি দেখতে দেখতে গোকুল সড়ক ধরে আবার চলে এলেন মথুরায়। ভূতেশ্বর মহাদেব দর্শন ক'রে যাত্রা সমাপন করলেন যাত্রীরা। ৮৪ ক্রোশ বন-পরিক্রমা ক'রে ফিরে এলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে, কেমারবন আশ্রমে। ১৩১৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু ক'রে অক্টোবর মাসের আট তারিখ, বাংলা ২১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার যাত্রা সমাপ্ত হলো।*

* * *

আবার একদিন কৃষ্ণের বাঁশীর মর্মান্তিক সুরের দোলায় দুলে উঠলো তারাকিশোরের মন। সে সুরধ্বনি তাঁর সমস্ত চেতনাকে ক'রে ফেললো আচ্ছন্ন। অপরূপ এক তরল সঙ্গীতের আবরণে যেন তাঁর দেহ-মন-আত্মাকে আবৃত ক'রে ফেললো। অনির্বচনীয় আনন্দে অন্তর ভরে উঠলো। কৃষ্ণের বাঁশীর শুধু সুরধ্বনি নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের হাতছানি তাঁকে যেন পাগল ক'রে তুললো। এ যে কুল ভাঙ্গার, ঘর ভাঙ্গার ডাক। এ ডাকে সাড়া না দিয়ে যে উপায় নেই! অকস্মাৎ একদিন সত্য সত্যই সবকিছু পরিত্যাগ ক'রে বিষয়ের সংসারকে ভেঙ্গে দিয়ে যাত্রা করলেন বৃন্দাবনের পথে। ১৩২২ সনের ৩০শে কার্তিক, ইংরাজী ১৯১৫ সালের আগস্ট মাস।

সেদিনটি কলকাতা হাইকোর্টের ইতিহাসে আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসের সেই অপরাহ্ণ বেলা, আইনজীবী তারাকিশোর তাঁর হাতের শেষ মোকদ্দমাটি সমাপ্ত ক'রে এসে বসলেন বার লাইব্রেরীতে। তাঁর চিরতরে বৃন্দাবন-যাত্রার কথা সকলেই শুনেছেন। বন্ধুবান্ধব সহকর্মী জজ সাহেবদেরও হৃদয় ভারাক্রান্ত। কারণ তিনি আপন আচরণে সকলেরই

* 'ব্রজে চৌরাশী ক্রোশ বনপরিক্রমা'—লেখক শ্রীমোহিনীমোহন চক্রবর্তী।

ব্রজধামে চৌরঙ্গী ক্রোশ বনযাত্রার কিম্বদন্তী হ'ল—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরাপুরীতে অবতীর্ণ হলে দেবতা গন্ধর্ব ও ঋষিগণ মহোৎসাহে ব্রজধামে ৮৪ ক্রোশ বনপরিক্রমা ক'রে কৃতার্থ হয়েছিলেন। তদবধি সাধু ভক্ত বৈষ্ণব ও ব্রজবাসিগণ তাঁদের পন্থানুসরণ ক'রে জন্মাষ্টমীর অব্যবহিত পরে বর্ষে বর্ষে মথুরায় ভূতেশ্বর মহাদেব মূর্তি দর্শন ক'রে বনযাত্রা আরম্ভ ও সমাপন করেন। দেবতাগণ আজও প্রচ্ছন্নভাবে এই বন-পরিক্রমায় যোগদান ক'রে থাকেন। যাত্রিগণ যাত্রা সম্পূর্ণ করলে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ হতে মুক্তিলাভ করেন।

হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছিলেন। বিদায় নেবার জন্য বার লাইব্রেরীর একটি চেয়ারে বসে আছেন। সহকর্মী আইনজীবীরা ঘিরে আছেন। সেই ভিড় ঠেলে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। মাথা নিচু করে যেই প্রণাম করতে যাবেন বাধা দিয়ে তারাকিশোর বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, একি করছেন? প্রণাম ক'রে আমায় দোষের ভাগী করবেন না। আপনি যে বয়োজ্যেষ্ঠ'। 'না—না তারাকিশোর, আজ আর বাধা দিয়ো না। আমি বয়োবৃদ্ধ হলেও তুমি যে জ্ঞানবৃদ্ধ। চুল পাকিয়ে ফেললাম, কিন্তু সত্যকে ত আজও জানতে পারলাম না। আর সাংসারিক জীবনের এত বড় সম্ভাবনাকে হেলায় তুচ্ছ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া কি সহজ কথা। আর কয়েক বছর অপেক্ষা করলে তুমি বছরে লক্ষ টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হতে।' অবশেষে পদধূলি গ্রহণ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ তারাকিশোরের। তুজনেই তুজনকে জড়িয়ে ধরে ভাববিহ্বল হলেন। সে এক অভাবনীয় প্রাণপূর্ণ দৃশ্য! সে দৃশ্য দেখে সকলেরই তুচোখ জলে ভরে উঠলো।

বিচারপতি স্যার জন উড্রফ্ সাহেব, শীঘ্রই জজ হওয়ার সম্ভাবনা জানিয়ে তারাকিশোরকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন। প্রত্যুত্তরে তারাকিশোর স্মিত হেসে বললেন, বড়লাট হলেও নয়। এক বন্ধু উপদেশ দিলেন, 'আরও তু'একবছর ওকালতি ক'রে প্রচুর অর্থ নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়াই ভাল'। তার উত্তরে তারাকিশোর বললেন, 'তোমরা কি মনে কর, আমি আমার ঠাকুরকে খাওয়াব? না ঠাকুর আমাকে খাওয়াবেন? আমি না খাওয়ালে আমার ঠাকুর যদি উপবাসী থাকেন, তবে আমি কার আশ্রয় নেব?'

এই ভাবে হাইকোর্টের লীলা সমাপন ক'রে তারাকিশোর সস্ত্রীক গেলেন নিজগ্রাম জন্মভূমি বামৈ-তে। সেখানেও সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে একরকম প্রায় কপর্দকহীন অবস্থাতেই সস্ত্রীক যাত্রা করলেন শ্রীধামবৃন্দাবনের পথে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন এক তুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা-ব্যাকুলতা, 'যিনি বিত্ত হতেও প্রিয়তর' তাঁকে লাভ করবার আকুলতা। "পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয় সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে, আত্মার অন্তরতর।"

তখন শ্রীশ্রীকাঠিয়াবাবা দেহরক্ষা করেছেন। শ্রীকিশোর দাসজীর পর তরুণ শিষ্য শ্রীযুত বিষ্ণুদাসজী মহন্তপদে অভিষিক্ত হয়েছেন। বৃন্দাবন আশ্রমে এসেই তারাকিশোর সেবার বহু কাজ স্বহস্তে ক'রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আশ্রম ঝাড়ু দেওয়া থেকে রন্ধন, শ্রীশ্রীঠাকুরজীর পূজা, আরতি, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা সবকিছুই একক হস্তে করতে লাগলেন। সমস্ত রাত্রি ধরে ভজন করেন। নিদ্রা প্রায়ই যান না। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দুরূহ তপশ্চর্যায় ব্রতী হলেন। ধীরে ধীরে তাঁর দৈহিক আকৃতির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা গেল। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী তারাকিশোরের দেহ নয়, এ যেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের গভীর তপশ্চর্যালব্ধ এক জ্যোতির্ময় মূর্তি। তাঁর সেই দিব্য শান্ত সৌম্য মূর্তি দর্শন ক'রে সকলেই আকৃষ্ট হতে লাগলেন। এই সময়কার সাধন-জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী এক মহাত্মা বলছেন, 'মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার পর আমি তাঁহাকে দিন রাত্রি কোনো সময়ে শয়ন করিতে দেখি নাই। প্রায় সমস্ত সময়ই ধ্যান লাগাইয়া থাকিতেন। এক বৎসর পর্যন্ত তিনি ছটাক যবের রুটি একবার মাত্র আহার করিতেন। ডাল তরকারি, এমন কি, একটু লবণ পর্যন্ত ইহার সহিত গ্রহণ করিতেন না। এই সময় তিনি মৌনী ছিলেন। আহারের এই নিয়ম ছাড়িবার পরেও তিনি অতি সামান্যই আহার করিতেন'।

সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে গভীর রাত্রে তিনি অল্প সময়ের জন্য নিদ্রা যেতেন। কিন্তু একদিন সেই সময়টুকুর মধ্যেই বিগ্রহের অলংকার চুরি হ'ল। তারাকিশোর তখন মনে মনে ভাবলেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায় ঐ সময়টুকুও নিদ্রা না যাওয়া। মনকে দৃঢ় করলেন এবং সেইদিন থেকেই সমস্ত দিনরাত্রি অতন্দ্রভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর চরণে দেহ-মন নিবেদিত করলেন।

দিন—সপ্তাহ—মাস—বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়। আবার আসে নূতন দিন! নূতন বছর। ১৩২৫ সন। ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রি। জ্যোৎস্না-স্নাত সমস্ত আশ্রমমন্দির-প্রাঙ্গণ। কি সুন্দর! কি অপরূপ! মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসে কীর্তনানন্দের ধ্বনি। চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে যেন সে শব্দের মধুর তরঙ্গ বয়ে চলেছে। উপরে আকাশ, নীচে যমুনা নদী প্রবাহিতা। শ্রীরাধারাণীর অন্তরের বেদনার সঙ্গে এক হয়ে মিশে

বালুশয্যার উপর দিয়ে করুণ কলোচ্ছ্বাসে সে নিত্যপ্রবহমাণা……। এমনই এক পরিবেশে তারাকিশোর ধ্যানমগ্ন। অকস্মাৎ চমকিত হয়ে দেখলেন, গুরুমহারাজ কাঠিয়াবাবার জ্যোতির্ময় মূর্তি। সস্নেহে বললেন, 'বেটা, যা কিছু করবে তা তুমি নিজে করছো, এমন ভেবো না। তোমার সকল কাজের ভারই আমার উপর জেনো।' এই প্রেরণাটুকু দিয়েই সে মূর্তি অদৃশ্য হলো। তারাকিশোর সবকিছু বুঝে মনকে দৃঢ় করলেন।

পরদিন সাধু-সন্ন্যাসী-বৈরাগীদের পঙ্গত অনুষ্ঠানের কথা। আর সেইখানেই ঠিক হবে ব্রজবিদেহী মোহন্তের পদ স্থায়ীভাবে কার উপর অর্পিত হবে। কারণ তরুণ শিষ্য বিষ্ণুদাসজী এ গুরুদায়িত্ব আর নিজের উপর রাখতে রাজী নন। বৃন্দাবনের ব্রজবিদেহী মোহন্তের পদমর্যাদাও যেমন অসামান্য, তেমনি এর গুরু দায়িত্বও কম নয়। ব্রজধামের বৈষ্ণবমণ্ডলীর চতুঃসম্প্রদায়ের ইনিই একচ্ছত্র নেতা। এঁর নির্দেশ সকলকেই মেনে চলতে হয়। সম্প্রদায়গুরুরূপে এঁর পদাধিকার যেমন সর্বত্র স্বীকৃত, তেমনি কর্তব্যও কম নয়। ব্রজপরিক্রমার সময় নানাস্থান থেকে আগত বৈষ্ণব সাধু জমায়েতের পরিচালনা, তাঁদের দ্বন্দ্ব-মতবিরোধের মীমাংসা—অনেক কিছুর ভারই এঁর উপর। তারাকিশোরও এ দায়িত্বভার থেকে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। তাইতো গুরুমহারাজ কাঠিয়াবাবার আবির্ভাব ও প্রেরণা দান। কারণ তিনিই ত একদিন তারাকিশোরকে বলেছিলেন—'তুম্‌হে মোহন্তীভী মিলেগী'।

পরদিন সাধু-সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট বৈষ্ণব মোহন্তরা উপস্থিত হলেন। তারাকিশোর বিনীতভাবে সকলকেই সম্বর্ধনা জানালেন। তাঁর সৌম্য মূর্তি দর্শন ক'রে এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধু বলে উঠলেন, 'এঁর রূপ ত বড়ই চিত্তাকর্ষক'। ইনিই দেখছি মোহন্তপদ-লাভের যোগ্যতম ব্যক্তি'। অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীদেরও বিশেষ দৃষ্টি পতিত হলো তারাকিশোরের সেই অপূর্ব লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত সৌম্য মূর্তির প্রতি। এবং সকলেই একমত হয়ে তাঁকেই ব্রজবিদেহী মোহন্তপদে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সে ইচ্ছায় বাধা প্রদান করতে সক্ষম হলেন না তারাকিশোর। সকল মোহন্ত একত্র হয়ে বৈরাগ্য-আশ্রম প্রদান করলেন, বৈষ্ণব প্রথানুযায়ী তাঁকে

মালা-চন্দন-তিলক ও নূতন চাদর পরিয়ে অভিষিক্ত করলেন। তারাকিশোর হলেন সন্তদাস, ব্রজবিদেহী মোহন্ত সন্তদাস। শিষ্য ভক্তদের নিকট হলেন—ব্রজবিদেহী মোহন্ত সন্তদাস বাবাজী মহারাজ।

বৈরাগ্য-আশ্রমে প্রবেশ করবার পর সহধর্মিণী অন্নদাদেবীকে কাশীতে রাখবার ব্যবস্থা করলেন। অন্নদাদেবী অবশ্য স্বামীর অধ্যাত্মজীবন-লাভের পথে কোনদিনই বাধাস্বরূপ হয়ে ওঠেননি। কাশীধামেই তিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অতিবাহিত করেছিলেন।

মোহন্তপদ-লাভের পর সন্তদাসের জীবনে নূতনতর কর্মের ভার অর্পিত হোল, এবং সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে তিনি এই গুরু-দায়িত্ব পালন করেছিলেন—আশ্রমে আগত সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবা, ব্রজপরিক্রমার নেতৃত্ব ও কুম্ভমেলায় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতৃত্ব করবার দায়িত্বভার গ্রহণ—সবই নিষ্ঠার সঙ্গে সুচারুরূপে পালন করেছিলেন। আরও দুটি বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন—একটি হচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ নিরাকরণ ও অপরটি হলো প্রবৃত্তিমার্গী সাংসারিক জীবকে উদ্ধার। তিনি মনে করতেন, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে যে বিভেদ, তা কেবলমাত্র ব্যাখ্যার বিভিন্নতা নিয়ে। আর এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবই ব্রহ্মলাভের পথে অন্তরায়। সুতরাং এই মনোভাব পরিত্যাগ ক'রে শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সমদৃষ্টিলাভের পথ সুগম হবে। সবই অবশ্য গুরুকৃপার উপর নির্ভর করছে। বেদান্তদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কজালের মধ্যে সাধারণ মানুষ পথ পেতে পারে না। সত্যকে জানতে হলে যে হিরণ্ময় পাত্রে তাকে রাখা হয়েছে, তার আবরণ ভেদ করতে হবে। একমাত্র সদ্‌গুরুই সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে চেনাতে পারেন। তাঁতে আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য পথ নেই। এই প্রসঙ্গে সন্তদাস বাবাজী গুরুকে উদ্দেশ ক'রে, তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, 'হে মহারাজ! তুমি সহায় হও, নতুবা নিজের একেবারে কোনপ্রকার সামর্থ্য দেখিতেছি না, হৃদয়গ্রন্থি সময়মত ছিন্ন করিবে বলিয়াছিলে, এখনও কি তাহার সময় হয় নাই? আশাতেই এই পর্যন্ত রহিয়াছি।' গুরু শ্রীশ্রীকাঠিয়াবাবাও বলতেন, 'কেবল সদ্‌গুরুর কৃপাতেই জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না'।

হিন্দুধর্মে সম্প্রদায়-ভেদ প্রসঙ্গে সন্তদাস বললেন,—'অপ্রকাশ নিরাকার পরব্রহ্মোপাসনা সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, সাধারণ জীবের বুদ্ধি নির্মল নয়। সাধারণতঃ, সূক্ষ্ম পরমাণু অথবা বিস্তৃত আকাশ অতিক্রম ক'রে, তদ্অতীত পরব্রহ্ম জীবের ধ্যানের বিষয় হতে পারে না। কোন প্রকার চিন্তা করতে গেলেই, চিন্তা কোন-না-কোন প্রকার আকার ধারণ করে। কেবল সমাধি-প্রজ্ঞা-যুক্ত ব্যক্তিই নিরাকার-ধ্যানে সমর্থ হতে পারেন। পরমাত্মা অথবা আত্মা (পুরুষ) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁরাও ধ্যানগম্য হন না। কেবল যা-কিছু বুদ্ধিগম্য, তৎসমস্ত হতেই আত্মা অতীত জেনে জ্ঞানমার্গাবলম্বী যোগীরা বুদ্ধিগম্য বস্তুজ্ঞান লয় ক'রে আত্মস্বরূপ অবগত হবার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। এইভাবে সর্বপ্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হলে, তখন আত্মা প্রকাশিত হন। সুতরাং সাধারণ মানুষ বিষ্ণু-শিব-রাম-কৃষ্ণ-কালী-দুর্গা ইত্যাদি কোন-না-কোন প্রকাশ-রূপের ভজনেরই অধিকারী হয়। অতএব ভগবানের যে যে প্রকাশমূর্তিতে উপাস্যরূপে ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁকেই পূর্ণ ব্রহ্ম বলে ঋষিরা উপাসনার জন্য উপদেশ করেছেন এবং অপর সকলকে তার তুলনায় অল্পশক্তিধারী বলে বর্ণনা করেছেন। এসব শুধুমাত্র সাধকের উপাস্য বিষয়ে নিষ্ঠা বর্ধন করবার জন্য। এই উপাসনা করতে করতে যখন চিত্ত নির্মল হয় এবং দ্বৈতবুদ্ধি দূর হয়, তখন স্বভাবতঃই সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা দূর হয়ে যায় এবং ঋষিদের কার্যের যথার্থ মর্ম বোধগম্য হয়। মূল কথা, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপাস্য আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন হলেও মূলতঃ তাতে কোন বিরোধ নেই।'

সন্তদাস বাবাজীর অধ্যাত্ম-সাধনায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় হয়েছিল। তাঁর সাধনায় তাঁর গুরুদেবের সাধনপ্রণালীর নানাবিধ কঠোরতা ছিল না সত্য, কিন্তু তীব্র একাগ্রতা ছিল। তিনি আর্য ঋষিদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেছিলেন। গার্হস্থ্য জীবন থেকেই তিনি জ্ঞানী ভক্তরূপে ভগবানের ভজন করতেন। এবং ধীরে ধীরে সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেন। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তিনি বলে যান নি। তবে তাঁর জীবনের কার্যাবলী হতে দেখা যায় যে, তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল এক বিরাট সাধনা। সন্তদাসের বাল্যবন্ধু শ্রীমদনচন্দ্র রায় একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

'কেহ কেহ বিষ্ণুর, কেহ কেহ কালীর, কেহ কেহ আবার শিবের উপাসনা করেন, কিন্তু তুমি যে কার উপাসনা কর, বুঝতে পারি না'। প্রত্যুত্তরে সন্তদাস বলেছিলেন, 'সকলে যে সব দেবদেবীর উপাসনা করেন, সেই সমস্ত দেবদেবী যাঁর উপাসনা ক'রে থাকেন, আমি তাঁরই উপাসনা করি'।

সন্তদাস তাঁর রোজনামচায় লিখছেন, 'সর্বত্র সমদর্শনই প্রধান ধ্যানাঙ্গ'। আবার লিখছেন, 'জীবিত থাকিতেই ব্রহ্মলাভ হয় ও অমৃতত্ব লাভ করা যায়'। ব্রহ্মলাভ ও অমৃতত্ব লাভের উপায় সম্বন্ধে বলছেন, 'সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধীন ক'রে দেওয়া এবং কিছুমাত্র বিচার না ক'রে সদ্‌গুরুর আদেশমাত্র প্রতিপালন করা সাধকের একমাত্র কর্তব্য। এইরূপ যিনি করতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে মোক্ষপ্রাপ্ত হতে পারেন। আপনাতে কর্তৃত্ববুদ্ধি যাঁর আছে, তিনি নিজে সাধন ক'রে পারগামী হবেন বলে যদি মনে করেন এবং গুরু-উপদেশ গ্রহণ ক'রে নিজেই সাধনভজন ক'রে সিদ্ধিলাভ করবার চেষ্টা করেন, তাহলে বিফল হবেন। তিনি অদূরদর্শী প্রাকৃত শিষ্য। তাঁর কৃতকৃত্যতা লাভ করা অতি কঠিন। গুরুতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য পথ নেই'।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মভাবনায় তাঁর সবচেয়ে বড় দান, আর্যশাস্ত্রের আপাতবিরোধী নানা ভাবধারার মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপন এবং এই শাস্ত্রসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণের অভ্রান্তত্ব প্রতিপাদন। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে যে বিরোধ, তাকে ভ্রান্তিপ্রসূত বলে তিনি প্রমাণিত করেছেন।

অপরদিকে, ভক্তিমার্গের সাধনা বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, তিনি ঠিক তা স্বীকার করেন নি। তিনি বলছেন, 'ভক্তিমার্গের উপাসনাকে কেবল সগুণ উপাসনা বলে ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়। ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ উভয়ই। ভক্তিযোগের লক্ষ্য পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি হয়, তাহলে ভক্তের কাছে ব্রহ্ম একাধারে মূর্ত ও অমূর্ত। সর্বময় অথচ সর্বাতীত, ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান্ আবার নির্গুণ নির্বিশেষ নিরবচ্ছিন্ন অক্ষর।' ভক্তিমার্গাবলম্বী বৈষ্ণব সাধক সন্তদাস পাতঞ্জলদর্শন সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন, 'ব্যাসভাষ্যসমেত এই পাতঞ্জলদর্শন সম্যক্ আয়ত্ত করতে না পারলে ভারতবর্ষের

অধ্যাত্মসাধনা বোঝাই যাবে না। পাতঞ্জলদর্শন সম্যক্ আয়ত্ত হলে ভারতীয় সর্বপ্রকার ধর্মশাস্ত্রে ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের উপদিষ্ট সাধন-প্রণালী বিষয়ে চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হয়'। আর ব্যাসভাষ্য সম্বন্ধে বলছেন, 'এই ভাষ্য স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত হওয়াতে, ইহা মূল গ্রন্থের ন্যায় আদরণীয়। ইহা সম্যক্ আয়ত্ত করতে পারলে অধিকাংশ হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্মসকল সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়'।

নিজের অবলম্বনীয় পথ বলে তিনি যে সাধন-ক্রমের উল্লেখ করেছেন, তা হলো, শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা-অসম্প্রজ্ঞাত-পরমাত্মসাক্ষাৎকার। এই ক্রমটি যোগসূত্রের একটি বিখ্যাত সূত্র। এর থেকে বোঝা যায়, সীমাহীন অপার অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রের তুল্য দুরবগাহ এই মহাপুরুষকে শুধুমাত্র বৈষ্ণব সাধকরূপে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। তাঁর অধ্যাত্মভাবনা ও সাধনার ধারা ছিল অতি গভীর ও ব্যাপক। বিশেষ কোন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ক'রে তাঁকে ও তাঁর সাধনাকে বুঝতে যাওয়া মূঢ়তারই পরিচয় হবে।

১৩২৭ সালে শ্রাবণ মাসে (ইংরাজী ১৯২০ খৃষ্টাব্দে) গোদাবরী তীরে যে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়, চতঃসম্প্রদায়ের নেতা ব্রজবিদেহী মোহন্তরূপে সন্তদাসজী সেখানে গমন করেন এবং সাধুগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেন। এই কুম্ভমেলাতেই সর্বপ্রথম তিনি দীক্ষাদান আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম সাধু চেলা হলেন শ্রীমৎ অনন্তদাসজী মহারাজ। কুম্ভমেলা থেকে বৃন্দাবনে ফিরে ব্রজপরিক্রমায় বহির্গত হলেন। আবার সেই দিনগুলিরও অবসান হলো। আবার এলো নূতন দিন-সপ্তাহ-মাস—বছরও ঘুরে এলো। সন্তদাসজী মহারাজ সশিষ্য যাত্রা করলেন তীর্থপর্যটনে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন ক'রে আবার ফিরে এলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। ক্রমে ক্রমে তাঁর শিষ্যভক্তসংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো। সন্তদাসজীর সাধনার যশঃসৌরভ তখন শ্রীধাম বৃন্দাবন অতিক্রম ক'রে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ও সমগ্র বঙ্গভূমিতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

এই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তশিষ্যা শ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবী বলছেন, 'আমরা তাঁহার শরীরে কোন অবস্থাতেই কখনও আলস্য দেখি নাই। কাজ ফেলিয়া

রাখিয়া আরাম করা তিনি কখনও পছন্দ করিতেন না। উপস্থিত কাজ অতি যত্ন ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। সেবাকার্যে তাঁহার কখনও ঘৃণা বা অপমান বোধ ছিল না'।

'সন্ন্যাসই কি মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়?' একজন শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন সন্তদাসজী, 'আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মে কর্মার্পণ এবং সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি সাধন করলে গৃহস্থাশ্রমবাসীও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করতে যোগ্য হতে পারেন। গৃহস্থাশ্রম কষ্টকর বিবেচনায় তা ছেড়ে কেবল সন্ন্যাস নিলেই যে মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয়, তা নয়। গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করবার উপযুক্ত মানসিক অবস্থা না হলে, যদি কেউ সংসার পরিত্যাগ করে, সে সন্ন্যাসীর কার্য করতে পারে না। আর গৃহস্থাশ্রমবিহিত কার্য সে ত পরিত্যাগই করেছে। অতএব উভয় হতে ভ্রষ্ট হয়ে তার উন্নতি আরও দূরবর্তী হয়।

'ধর্মজীবন লাভ করতে হলে যে গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করতে হবে, এই ব্যবস্থা বেদেও দেখতে পাওয়া যায় না। বেদ গার্হস্থ্যকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন। ঋগ্বেদে আছে, পূর্বে যে ঋষিরা ছিলেন, যাঁরা দেবতাদের সঙ্গে সত্যবিষয়ে আলাপ করতেন, তাঁরা অপত্যের জনক হয়েছিলেন এবং সে ব্রতচ্যুত হন নি।'

সন্তদাস বাবাজীর জীবনেও দেখা যায় তাঁর পত্নীর একপ্রাণতা তাঁর সাধনজীবনকে জয়যুক্ত করেছিল।

তাঁর জীবনের শেষ বিশ বৎসর কাল তিনি স্বীয় গুরুদেব কাঠিয়াবাবা ও ভারতের প্রাচীন ঋষিদের বাণী প্রচার করেছেন। বহু আর্ত পিপাসু তাঁর উপদেশামৃত পান ক'রে ধন্য হয়েছেন। ১৩৩৯ সালে তিনি হাওড়া-শিবপুর নিম্বার্ক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি চারিটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবন, হাওড়া শিবপুর, শ্রীহট্ট ও বামৈ গ্রাম। এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শ্রীনিম্বার্ক ঋষির প্রচারিত সার্বজনীন ধর্ম এই আশ্রম হতে প্রচারিত হয়ে এদেশের মানুষের ধর্মপিপাসার যাতে নিবৃত্তি হয় এবং সকলে পরম শান্তিলাভ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই আশ্রম-মন্দির স্থাপন'।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্তদাসজীর দু'খানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একখানি

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সংস্করণ উপক্রমণিকা অনুবাদ ও টীকা সহ। 'দ্বিতীয় গ্রন্থ-ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ।' ইতিপূর্বে রচিত আরও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত এবং বহুল প্রচারিত গ্রন্থ হলো—শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবনচরিত।' বাংলা সাহিত্যে সাধক জীবনী হিসাবে এটি একটি মহামূল্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য হলো পাণ্ডিত্যভারাক্রান্ত তত্ত্বালোচনা এর মধ্যে কোথাও নেই। কেবল ঘটনার সংযত নিরুচ্ছ্বাস যথাযথ বিবৃতির মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এক লোকোত্তর পুরুষের অপরূপ মহিমা। সন্তদাসজী চেয়েছিলেন, মানুষের দুঃখ ও অশান্তির মূল উচ্ছেদ করতে। আর সেইজন্যই তিনি অসুস্থ দেহ ও ক্লান্ত মন নিয়েও ভক্তের আকুল ডাকে বৃন্দাবন থেকে বাংলা আসাম প্রভৃতি স্থানে ছুটে যেতেন। বিভূতি ও অলৌকিক নানা ঐশ্বর্যের কথা বলে মানুষের মনকে ক্ষণিকের জন্য উদ্বুদ্ধ করা তাঁর নিকট অসহ্য ছিল। তাঁর প্রশান্ত মূর্তি ও অমায়িক সাহচর্যই ছিল আকর্ষণের কেন্দ্র। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের চেয়েও ছিল মধুর। অতি প্রাচুর্যের মধ্যেও তাঁর ছিল একটা অনাসক্ত উদাসীন ভাব।

সে যুগের স্বনামধন্য শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত স্বামী সন্তদাস বাবাজীকে দর্শন ক'রে মন্তব্য করেছিলেন, 'এমন ধীর সৌম্য নিরভিমান আত্মসমাহিত মানুষের কাছে কথাও ফুরিয়ে আসে, তর্কেরও স্পৃহা জাগে না'। প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরীকে শ্রীযুত দত্ত বলেছিলেন হাইলাকান্দিতে শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজীকে দর্শন করবার পর—'....সন্তদাস বাবাজী বেশী কথা বলেন নি। চক্ষু মুদ্রিত ক'রে খানিকটা সময় চুপ ক'রে রইলেন। তারপর দু'চারটি কথায় বললেন, ঋষি ও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস চাই। যুক্তিতর্কে মতবাদের প্রতিষ্ঠা হতে পারে, কিন্তু ভগবান্‌কে বোঝা যায় না। বোঝানোও যায় না'। বাবাজী মহারাজের বিশ্বাসের বীর্য ও কথার অগ্নিস্পর্শ অন্তর আলোড়িত করে। সত্যিকার খাঁটি সাধু স্বামীসন্তদাসজী'।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী শিবপুর নিম্বার্ক আশ্রমে প্রথম সন্তদাস বাবাজীকে দর্শন ক'রে বলছেন, 'দূর হইতে বাবাজী মহারাজকে দেখিলাম। দেখিয়াই মুগ্ধ হইলাম। শান্ত-সৌম্য-সুন্দর, অনতিদীর্ঘ দীপ্ত প্রতিভার শ্রীমূর্তি। দীর্ঘ

জটাজূট-আবক্ষ শ্মশ্রু। আজানুলম্বিত বাহু। নগ্নদেহে কাঞ্চন-আভা। হস্তে দণ্ড, পদে কাষ্ঠ পাদুকা, ধীর মন্থর মরাল গতি। অনাড়ম্বর জীবন। অতি প্রাচুর্যের মাঝেও অনাসক্ত ঔদাসীন্য—যেন এ জগতের কেহ নন তিনি। দেখিলাম, স্নান-সমাপনান্তে খানিকটা তিলক মাটি মুখমণ্ডলে ও গাত্রে লেপন করিলেন। তারপর আশ্রমের পূর্বদক্ষিণ কোণার ঘরটিতে একখানি অনুচ্চ চৌকিতে উপবিষ্ট হইলেন। তখন ওষ্ঠপুটে তাঁর মৃদুমধুর হাসি। নিমীলিত-প্রায় নয়নে সুস্নিগ্ধ স্নেহদৃষ্টি। অতি অল্পসময় হইলেও তাঁহার স্নিগ্ধ সান্নিধ্য ও পরিবেশে একটা চিরন্তন কারুণ্যামৃতের অনুভূতি পাইলাম। অপ্রাকৃত এ অনুভব আজও চির অম্লান হইয়াই বিদ্যমান!'

তখন বাংলা ১৩৪২ সাল।

সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-লীলার শেষ অধ্যায়টি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। অসুস্থ শরীরে হাওড়া শিবপুর আশ্রমে রয়েছেন। মাঝে মাঝেই ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গান ধরেন,—

তোরা কে যাবিরে আয়রে ভাই,
সবে মিলে প্রেমধামে যাই ॥
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ এস দেখে প্রাণ জুড়াই,
পাপের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে সবাই,
কতকাল আর থাকবো বল ভুলিয়ে হেথায়—
এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে সবে তাঁর পায়ে লুটাই ॥

পাপ তাপ সমুদায় কিছু নাহিক তথায়,
নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে সেথায় ॥
ঐ শোন প্রেমময় ডাকিতেছেন,
এস আনন্দেতে ধাই সবাই—
এস প্রেমানন্দে নেচে যাই—
তোরা আয় ॥

যে অজানা রহস্যলোকে গিয়ে তিনি নিঃশেষে ডুবে ভক্তদের নিকট থেকে হারিয়ে যাবেন, সেই রহস্যলোকের আহ্বান, হাতছানি তাঁকে যেন আকুল ক'রে তুললো। দূরাগত মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মত বাতাস বয়ে নিয়ে আসে অপূর্ব সুমধুর এক ধ্বনি, সে ধ্বনি মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি নয়, কৃষ্ণের বাঁশীর করুণা-মিশ্রিত এক স্বরধ্বনি যেন! সে আহ্বানে—সে ডাকে—সাড়া না দিয়ে পারলেন না সন্তদাসজী। ধীরে ধীরে তিনি আরও অন্তর্মুখীণ হয়ে উঠলেন। প্রত্যক্ষ করলেন মধুময় আনন্দময় সত্তাকে। নিত্যমুক্ত নিরবচ্ছিন্ন সেই আনন্দময় সত্তার সঙ্গে মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে গেলেন।

ইংরাজী ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শিলংএ কিছুকাল অবস্থান ক'রে সন্তদাসজী ১৫ই আষাঢ় শ্রীহট্ট আশ্রমে এলেন। সেখান থেকে শিবপুর আশ্রমে আসেন। তখন তিনি অসুস্থ। জ্বর ও আমাশয় রোগে ভুগছেন। অবশেষে ভাদ্র মাসের শেষভাগে গেলেন ভুবনেশ্বরে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। এই সময়েই তিনি ভুবনেশ্বরে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। আশ্বিন মাসে খুবই অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ভুবনেশ্বর থেকে শিবপুর আশ্রমে আনা হোল। এই অসুস্থ অবস্থাতেও তাঁকে আনন্দময় দেখা যেত। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'কোন কষ্ট নেই'। কিন্তু বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠতেন। একদিন বন্ধুবর অ্যাডভোকেট শ্রীযুত ব্রজলাল শাস্ত্রীকে অনুরোধ ক'রে বললেন, 'ব্রজলাল, আমি যেদিন সংসার ছেড়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করি, সেদিন যেমন তোমরা আমার সহায় হয়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছিলে, এখনও সেইরূপ সহায় হয়ে আমাকে শ্রীবৃন্দাবনের গাড়ীতে তুলে দাও। আমার শরীর আর থাকবে না। শ্রীগুরুদেবের সেই আশ্রমের প্রতি বড় আকর্ষণ বোধ করছি। শরীরটা যাতে আশ্রমে গিয়ে পৌঁছয়, তার ব্যবস্থা ক'রে এখনও সেইরকম প্রকৃত বন্ধুর কাজ কর।'

সন্তদাসজীর করুণ আবেদনে ব্রজলাল বাবুর দু' চোখ জলে ভরে উঠলো। তিনি বন্ধুবরের অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

অবশেষে ২২শে কার্তিক শত শত ভক্ত শিষ্যের অবরুদ্ধ কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে তুফানমেলে যাত্রা করলেন সন্তদাস বাবাজী শ্রীধামবৃন্দাবনের

পথে। সঙ্গে রইলেন সাধু-শিষ্য যশোদানন্দ দাস, কানাইয়া দাস ও ডাক্তার-শিষ্য অমূল্যরতন বসু।

হু হু শব্দে গাড়ী ছুটে চললো। আসানসোল, ধানবাদ, হাজারিবাগ, গয়া, মোগলসরাই, এলাহাবাদ ছাড়িয়ে গাড়ী চললো হাতরাসের দিকে। পা টিপছেন ভক্তশিষ্য কানাইয়া দাস। তখন সন্ধ্যা সাতটা শ্রীশ্রীঠাকুরজীর আরতি হোল। স্তবপাঠ শুরু হোল। আরতির দীপ নিয়ে এলে সন্তদাসজী পঞ্চ-প্রদীপের তাপ নিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে শঙ্খের জল ছিটিয়ে দেওয়া হোল। জল খেতে চাইলেন। গঙ্গাজল দিলেন যশোদানন্দজী। ডাক্তার বসু ভাল ক'রে আর একবার পরীক্ষা করলেন। পরমুহূর্তেই চিন্তিত হলেন। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে কানাইয়া দাস ও যশোদানন্দজী উদ্বিগ্ন হলেন। বাবাজী মহারাজ সবকিছু লক্ষ্য করে ধীর অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'কুছ চিন্তা মাৎ করো'। তুফানমেল তখনও তীব্র বেগে ছুটে চলেছে হাতরাসের দিকে। সহসা বাবাজী মহারাজের জপরত হস্ত স্থির হয়ে গেল। ঘাড় ঝুলে পড়লো। নেত্রতারকা ঊর্ধ্বে উঠে ভ্রূমধ্যে স্থির হলো। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চিরতরে বন্ধ হোল। ওষ্ঠপুটে তখনও মৃদুমধুর হাসির রেখা ফুটে রয়েছে।

হাতরাস জংশন থেকে মোটরে ক'রে সন্তদাসজীকে শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ে আসা হোল। শিষ্যপ্রবর অনন্তদাসজী, দিবোদাসজী স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের মরদেহটি শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো আশ্রমগৃহ-প্রাঙ্গণ। তাঁকে শেষবারের মত দেখবার জন্য প্রবল উন্মাদনা দেখা গেল ভক্তশিষ্য ও বৃন্দাবনবাসীদের মধ্যে। তিনি যে ছিলেন ব্রজবাসীদের প্রাণস্বরূপ।

অবশেষে মহাসমারোহে সন্তদাস বাবাজীর পার্থিব দেহ যমুনা-পুলিনে যুগলঘাটে অগ্নিসংস্কার করা হোল। তখন যমুনার কলস্বর কলক্রন্দনের মতই শোনাচ্ছিল।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!